Robiul - https://t.me/BoierSomahar



আজাদির সন্তান

সাব্বির জাদিদ



Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আজাদির সন্তান

কাশ্মীরের মুক্তি-সংগ্রামের মর্মন্তুদ উপাখ্যান

সাব্বির জাদিদ

ঐতিহ্য

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আজাদির সন্তান
সাব্বির জাদিদ

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪৩০
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

AZADIR SANTAN by Sabbir Jadid
Published by Oitijjhya
Date of Publication : Feburary2024
E-mail: oitijjhya@gmail.com

Copyright©2024 Sabbir Jadid
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form.

ISBN 978-984-776-269-2

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কথাসাহিত্যিক

সমর ইসলাম

একদা কাশ্মীরের প্রতি আমার কিশোর
হৃদয়ে বেদনা জাগিয়েছিলেন যিনি।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কাশ্মীরে আজাদির লড়াই : একটি ঐতিহাসিক দলিল।
লেখক : প্রবীর ঘোষ।

কাশ্মীর : মুক্তিসংগ্রাম ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, একটি সমকালীন ইতিহাস।
লেখক : সিদ্ধার্থ গুহ রায়।

এই উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে ইতিহাসের যে নির্মম সত্যটুকু গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তার উৎস উপর্যুক্ত দুটো বই।
লেখকদ্বয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

জানুয়ারির বিকেল বলেই যে তাকে এত দ্রুত ফুরিয়ে যেতে হবে, ভাবতে পারেনি আদনান ফাইয়াজ। খানিক আগে পাহাড়ের বাঁ পাশে এখনো হলুদ না হয়ে ওঠা সূর্যের বিকিরণ দেখে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। ভেবেছিল, রাত গভীর হওয়ার আগেই সে ঘরে ফিরতে পারবে। কিন্তু উলের মোটা টুপিটা কান পর্যন্ত নামিয়ে ও যখন আবার চোখ রাখল জানালায়, ততক্ষণে বরফঢাকা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে সূর্যটা। শুভ্র চূড়ার ওপাশের আকাশটা রক্তিম। বারমুলা থেকে ছেড়ে আসা শ্রীনগরগামী এই শেষ বাসের একটি সিটও খালি নেই আর। ড্রাইভারের দুসারি পেছনে বসা আদনান সামনের গ্লাস দিয়ে মাইলফলকের ওপর চোখ রাখল— শ্রীনগর তিন কিলোমিটার। খুব ভালো হতো, যদি বারমুলা থেকে সরাসরি পেহেলগামের বাস পাওয়া যেত। শ্রীনগর পৌঁছে এই বাস ছেড়ে দিয়ে উঠতে হবে পেহেলগামের বাসে। পেহেলগাম এবং অনন্তনাগের মাঝামাঝি সবুজের ওড়না বিছানো গ্রাম গুরিহাকায় ওদের বাড়ি। পথিমধ্যে তুষার এবং চেকপোস্ট যদি বৈরিতা না করে, পূর্বাভিজ্ঞতা বলছে, শ্রীনগর থেকে পেহেলগামের শেষ বাসটা ধরা অসম্ভব হবে না। জানুয়ারির মাইনাস ডিগ্রি সেলসিয়াসের শীতে কাশ্মীরের বাস জার্নির প্রধান বিড়ম্বনার নাম তুষারপাত। ইদানীং এর সাথে যুক্ত হয়েছে মিলিটারি, প্যারামিলিটারি ও পুলিশের উৎপাত।

আদনানের মতো মারিয়ামের মাথায়ও তখন তুষারপাত এবং চেকপোস্টের দুশ্চিন্তা। লাল হিজাবের ওপর উলের মাফলারে কান পেঁচিয়ে ও বিড়বিড় করে, আল্লাহ, তুমি সর্বশক্তিমান।

প্রতিবছর এই দিনটার সূর্য ওঠে বিষণ্নতার বার্তা নিয়ে। সাত বছর আগের এই দিনে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন মারিয়ামের বাবা-মা। শ্রীনগর হজরতবাল মসজিদে মানত দিয়ে তারা বাড়ি ফিরছিলেন। মারিয়ামের বয়স তখন বারো। আগে-পরে কোনো ভাইবোন নেই। সেদিন একটি ছেলের আশায় স্বামীর সাথে হজরতবাল মসজিদে মানত নিয়ে গিয়েছিলেন আরজুমান্দ। শ্রীনগর থেকে ঘরে ফেরা হয়নি তাদের।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

খোশরাগপোরার বরফঢাকা পিচ্ছিল রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের বাস খাদে পড়ে যায়, দুই হাজার ফুট নিচে। একটি বাস সুতোছেঁড়া ঘুড়ির মতো গোঁত্তা খেয়ে খেয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে পড়ছে, আর সেই বাসের ভেতর বাঁচার আকুতি নিয়ে হাউমাউ করে কাঁদছে বাবা-মা, একটু বড় হয়ে দৃশ্যকল্পটি যখনই ভেবেছে মারিয়াম, বেদনায় নীল হয়ে গেছে মুখ। একটি প্রাণ সৃষ্টির আগেই আল্লাহ তার মৃত্যু নির্ধারণ করে রাখেন। মেয়েকে একলা রেখে বাবা-মার দ্রুত বিদায়ে চাপা কষ্ট আছে, কিন্তু আল্লাহর এই সিদ্ধান্তে আক্ষেপ নেই মারিয়ামের। তার আক্ষেপ ভিন্ন জায়গায়। বাবা-মার দেহ কবরের মাটি পায়নি। লাশ উদ্ধারে বারমুলা পুলিশ প্রশাসনের প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিল না যদিও। কিন্তু বরফ কেটে রাস্তা থেকে দুই হাজার ফুট নিচে নামতে বড্ড দেরি হয়ে যায় তাদের। ততক্ষণে কাশ্মীরের ভুবনবিখ্যাত তুষারপাত গিলে ফেলেছে আস্ত একটি বাস এবং তার যাত্রীদের। বাবা-মাকে হারানোর পর এই সাত বছরে অসংখ্য পর্যটক দেখেছে মারিয়াম। সারা দুনিয়া থেকে তারা পৃথিবীর স্বর্গ দেখতে ছুটে আসে কাশ্মীরে। কত বিচিত্র সেসব মানুষ! কত বিচিত্র তাদের ভাষা! যারা শীতে আসে, তাদের প্রধান আকর্ষণ থাকে বরফে। পেহেলগামের বরফের রাজ্যে অসংখ্য বৃদ্ধকে সে শিশু হয়ে উঠতে দেখেছে। পর্যটকদের উল্লাস কেবল বেদনাই বাড়িয়েছে মারিয়ামের। গোপনে চোখ মুছে সে ফিসফিস করেছে— কাঠগোলাপের যে শুভ্রতায় তোমরা বিনোদন খুঁজে পাও, আমার কাছে তা প্রিয়জনের কাফন।

আরজুমান্দ বলতেন, সৌভাগ্যবান সেই সব বাবা-মা, মৃত্যুর পর সন্তানেরা যাদের কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়; সুরা ফাতেহা, ইয়াসিন পড়ে। শেষের দিকে একটি ছেলের জন্য তিনি যে পাগলপারা হয়ে মসজিদে-মাজারে মানত নিয়ে ছুটছিলেন, কবরে শুয়ে নিয়মিত জিয়ারত পাওয়ার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল তার অন্যতম কারণ। তিনি মারিয়ামকে বলতেন, তুই তো মেয়ে, বিয়ে হয়ে কোথায় না কোথায় থাকবি। একটি ছেলে থাকলে বাবা-মার কবর সে দেখেশুনে রাখতে পারবে। সেই ছেলে পাওয়ার প্রচেষ্টার ভেতরেই মারা গেলেন তিনি। এমন অভাগা মরণ, কাফনের কাপড় জুটল না, কবরের চিহ্ন পর্যন্ত রইল না। এ-ই কি তবে জগতের নিয়ম— অতি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু মানুষের হাত ফসকে যায়?

মারিয়াম ছেলে নয়। বাবা-মার লাশের সৎকার সে করতে পারেনি। তবু প্রতিবছর এই দিনটা এলে আদনানের সাথে সে ছুটে যায় শ্রীনগর-বারমুলা রোডের সেই জায়গায়, যেখান থেকে বাসটা ছিটকে পড়েছিল। গভীর খাদের দিকে তাকিয়ে সে সুরা ফাতিহা পড়ে। তখন তার বাদামি চোখে টলমল করে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কান্না। আর আদনান আলতো করে ওর কাঁধ ছুঁয়ে সান্ত্বনার বাণী আওড়ায়। একটি মেয়ের এতিম হওয়ার দুঃখ আদনানকেও বিমর্ষ করে।

শৈশবে বাবা-মার সাথে দুবার হজরতবাল মসজিদে গিয়েছিল আদনান। মারিয়ামের বাবা-মার মতো সেটাও হয়তো কোনো এক মানতের সফর ছিল। কিসের মানত, আজ আর তা মনে নেই আদনানের। ডাললেকের পশ্চিম তীরে অবস্থিত কাশ্মীরের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী মসজিদ হজরতবালে কত রকম মানত নিয়ে যে যায় লোকজন! যাবেই না বা কেন, যে মসজিদের সাথে জড়িয়ে আছে স্বয়ং নবীজির দৈহিক স্মৃতি, নবীপ্রেমিকদের কাছে সেই মসজিদ পুণ্যস্থান হতে দ্বিতীয় কোনো কারণ লাগে না। দাদাজানের মুখে শুনেছে আদনান, প্রায় তিন শ বছর আগে নবী বংশের এক পুণ্যবান লোক ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে হেজাজ থেকে এসেছিলেন এই ভারতবর্ষে, বসবাস শুরু করেছিলেন দাক্ষিণাত্যের বিজাপুরে। মদিনা থেকে তিনি একাই আসেননি, সঙ্গে এনেছিলেন নবীজির দুগাছি পবিত্র চুল। নবীজির পুণ্যস্মৃতি তিনি আমৃত্যু আগলে রেখেছিলেন নিজের কাছে। এই পুণ্যবান মানুষটার মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারসূত্রে নবীজির পবিত্র চুলের জিম্মাদার হন তার পুত্র সাইয়্যেদ হামিদ। ১৬৯২ সালে সাইয়্যেদ হামিদ দিল্লি গমন করেন এবং নূরুদ্দিন নামক এক কাশ্মীরি ব্যবসায়ীর সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। জীবনসায়াহ্নে সাইয়্যেদ হামিদ নবীজির পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন বন্ধুকে দিয়ে যান। তত দিনে বন্ধু নূরুদ্দিনেরও ডাক পড়ে কবরের দেশে। ইন্তেকালের আগে এই পবিত্র আমানত তিনি সোপর্দ করে যান লাহোরের বিখ্যাত সুফি-সাধক খাজা মাদানিশের হাতে। পরবর্তীকালে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে খাজা মাদানিশ কাশ্মীর হিজরত করেন এবং ডাললেকের পাশে স্থাপন করেন এক খানকা। এই খানকাতেই তিনি নবীজির অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ করেন। কিছুদিনের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে নবীজির পবিত্র চুলের খবর। সারা ভারত থেকে হাজার হাজার নবীপ্রেমিক, হোক তারা মুসলমান অথবা হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ অথবা শিখ, ছুটে আসে এই খানকায়, স্বচক্ষে নবীজির দৈহিক চিহ্ন দেখবার ব্যাকুলতায়। এরপরও জায়গাটি তীর্থস্থানে পরিণত না হলে তা হবে ঘোরতর অন্যায়। সেই অন্যায় ঘোচাতে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন মোগল সম্রাট শাহজাহান। জায়গাটির আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি তাজমহলের আদলে খানকার পাশে নির্মাণ করেন এক মসজিদ। নবীজির মূল্যবান চুলের স্মরণে মসজিদটির নাম হয়ে যায় মসজিদে হজরতবাল।

বাবা-মার সাথে দ্বিতীয়বার হজরতবাল মসজিদে যাওয়ার স্মৃতি স্পষ্ট মনে আছে আদনানের। আগরবাতি, লোবানকাঠি ও আতরের মাথা ঝিমঝিম করা

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

গন্ধ এখনো ঘোরাঘুরি করে ওর নাকের আশপাশে। ও দেখেছিল শ্রদ্ধায় অবনত অসংখ্য নারী-পুরুষকে, যারা মসজিদের ফটকের গায়ে পরম ভক্তিতে চুম্বন করছে, মাথা ছোঁয়াচ্ছে, হাত বোলাচ্ছে। মসজিদের শ্বেতপাথরের সাদা দেয়াল নবীপ্রেমিকদের ঠোঁট ও হাতের স্পর্শে হয়ে গেছে কালো। মিম্বরের সামনে সাদা পাথরের মোজাইক করা চারটি থাম, সেই থামের গায়েও নবীজির ভালোবাসার স্মারক রচিত হতে দেখেছিল ও। নারী-পুরুষেরা একে একে যাচ্ছিল ওই থামের কাছে এবং সন্তান যেভাবে জড়িয়ে ধরে মায়ের গলা, সেভাবে তারা জড়িয়ে ধরছিল শীতল থামকে। চুমু খাচ্ছিল, হাত বোলাচ্ছিল, কেউ কেউ থামের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে বিড়বিড় করছিল। মিম্বরের দুপাশে তালাবদ্ধ দুটি লোহার দরজা। দরজার ওপাশেই সংরক্ষিত আছে মহানবীর মহামূল্যবান শারীরিক নিদর্শন। এই স্মৃতিচিহ্ন দেখার সুযোগ সব সময় মেলে না। যারা দেখতে পায়, তারা নিজেদের জগতের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মনে করে।

মারিয়ামের বাবা-মা সেদিন মানত করতে না গেলে কি আজ তারা বেঁচে থাকতেন? আদনান বিড়বিড় করে— নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিটি সিদ্ধান্তের মাঝেই রয়েছে কল্যাণ। আমাদের উচিত তার দাসত্ব করে যাওয়া।

উপত্যকার বাসগুলো সব সময় চায়ের দোকানের মতো আড্ডামুখর থাকে। চাকরি অথবা ব্যবসার নিয়মিত যাতায়াতের সুবাদে এরা খুব সহজেই একে অন্যের পরিচিত হয়ে ওঠে। আর জানা কথা, পরিচয় মানুষকে সর্বদা গল্পের দিকে আকর্ষণ করে। ফলে কাশ্মীরের একেকটি বাস হয়ে ওঠে একেকটি আড্ডাখানা। কিন্তু আজ বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকেই আদনান ব্যতিক্রম দৃশ্য দেখছে। শীতের পাতাঝরা গাছের মতো সবকিছু থমথমে। খুব দরকার না পড়লে কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। যেন একান্ত ঠেকায় পড়ে তারা রাস্তায় বেরিয়েছে এবং যতক্ষণ না ঘরে ফিরছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই। ১৯৮৭ সালের প্রহসনের নির্বাচনের পর থেকেই উত্তাল কাশ্মীর। নির্বাচনকে ঘিরে নতুন করে আশায় বুক বেঁধেছিল কাশ্মীরিরা। মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্টের পক্ষে তারা রাতদিন কাজ করেছিল। আদনানের দাদাজি আবদুল লতিফ নির্বাচনী প্রচারণায় পুরো পেহেলগাম একাকার করে ফেলেছিলেন। না কোনো পদের লোভ, না কোনো অর্থের লালসা— কেবল স্বাধিকারের চেতনা থেকেই তিনি অহোরাত্র ঘামঝরানো পরিশ্রমের এই পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং তার মতো আরো অনেকেই। সেই দিনগুলোতে জনতার যে জোয়ার আবদুল লতিফ দেখেছিলেন, ভেবেছিলেন, মুসলিম

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ইউনাইটেড ফ্রন্টের বিজয় সময়ের ব্যাপারমাত্র। এই আত্মবিশ্বাস তার একার নয়, কাশ্মীরের প্রতিটি জনগণের ছিল। কিন্তু পেশিশক্তি আর কূটচালের কাছে হেরে যায় দেশপ্রেমিক কাশ্মীরিরা। মিলিটারি, প্যারামিলিটারি, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের নির্লজ্জ সহযোগিতায় নজিরবিহীন কারচুপির ঘটনা ঘটে নির্বাচনে। মুসলিম ফ্রন্টের প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার করা হয়। সমর্থকদের ওপর চালানো হয় সন্ত্রাসী হামলা। বিপুল জনসমর্থন পাওয়ার পরও ইয়াসিন মালিককে মারধর করে সরকারদলীয় পোলিং এজেন্ট। নির্বাচনে জয়ী দেখানো হয় কংগ্রেস-কনফারেন্স জোটকে। নিজেদের মতো করে মাতৃভূমি সাজানোর আরো একটি স্বপ্ন নিমেষেই ধূলিসাৎ হয়ে যায় কাশ্মীরিদের। সেই থেকে তারা ফুঁসছে। ভারতীয় দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলছে তাদের ক্ষোভের আগুন। বিক্ষুব্ধ জনতাকে দমন করতে পৃথিবীর ভূস্বর্গে শকুন নামার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে নেমেছে সামরিক বাহিনী। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসেছে চেকপোস্ট। চেকপোস্টে প্রদর্শনের জন্য অবধারিতভাবে আইডি কার্ড সঙ্গে রাখতে হয় কাশ্মীরিদের। নয়তো শিকার হতে হয় নির্যাতন এবং গ্রেপ্তারের।

প্রহসনের নির্বাচনসৃষ্ট উত্তেজনা মাঝখানে স্তিমিত হয়ে এসেছিল। কিন্তু কয়েক দিন আগে মুসলিমবিদ্বেষী হিসেবে খ্যাত জগমোহনকে কাশ্মীরের গভর্নর নিযুক্ত করেছে ভারত সরকার। জগমোহন ইস্যুতে উত্তাল সেই দিনগুলো ফিরে এসেছে আবার। জগমোহনের নিযুক্তির প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয়েছে শ্রীনগরে। পরশু রাতে শ্রীনগরের প্রতিটি বাড়িতে হামলা করেছে প্যারামিলিটারি। বিক্ষোভ ঠেকাতে যুবক ছেলেদের ক্যাম্পে তুলে নিয়ে গেছে তারা। এতে প্রতিক্রিয়া হয়েছে আরো ভয়াবহ— ফুটন্ত তেলে যেন পানির ছিটা পড়েছে। জনতার ক্ষোভ বেড়েছে বৈ কমেনি। এখন তারা জগমোহনের অপসারণ চায়।

আজ ভোরে মারিয়ামকে নিয়ে আদনান যখন বের হচ্ছিল, বাড়ির সবাই বাধা দিয়েছিল। বিশেষ করে দাদাজি, ফজরের নামাজের পর থেকেই যিনি কানে রেডিও ধরে বসে ছিলেন, ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি ওয়ার্ল্ড প্রচ্ছন্নভাবে তাকে নির্দেশ করছিল— এমন দিনে আপনজনদের ঘরে রাখো। দাদাজানের নিষেধ-বারণের পরোয়া করেনি আদনান। মারিয়ামকে খোশরাগপোরা নিয়ে যাবে বলেই সে কদিন আগে ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ি এসেছে। এই দিনটির জন্য সারা বছর অপেক্ষায় থাকে মারিয়াম। বাবা-মার মৃত্যুস্মৃতি জিয়ারত করতে না গেলে মেয়েটি ভীষণ দুঃখ পাবে। মারিয়াম কোনো কারণে দুঃখে পুড়ুক, আদনান চায় না। তা ছাড়া আদনান কাশ্মীর

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দাদাজি যে গোলযোগের আশঙ্কা করছেন, অমন গোলযোগ সে প্রতিনিয়ত মোকাবিলা করে। মিছিল-মিটিং-পিকেটিং এই উপত্যকার চিরসখা।

মুরব্বিদের কথা অমান্য করার কারণেই হয়তো দুর্ভোগ চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে আদনানকে। বাড়ি থেকে খোশরাগপোরা চার ঘণ্টার পথ, অথচ চেকপোস্টের আধিক্যে সেই পথ পাড়ি দিতে হয়েছে সাত ঘণ্টায়। মৃত্যুস্মৃতি জিয়ারত করে এতক্ষণ তাদের বাড়িতে থাকবার কথা ছিল, অথচ এখনো তারা পথের মাঝে খাবি খাচ্ছে। আজ বাড়ি ফিরতে পারবে কি না, তাই নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর সংশয়। সন্ধ্যা নামছে, ইদানীং সন্ধ্যার আঁধারের সাথে নেমে আসছে আরো একটি অন্ধকার, তার নাম কারফিউ। শ্রীনগর গিয়ে ওরা যদি কারফিউয়ের মুখে পড়ে, কীভাবে বাড়ি যাবে ভেবে গলা শুকিয়ে যায় আদনানের। একাকী থাকলে এতটা চিন্তিত হতো না ও, এই মুহূর্তে ওর যত দুর্ভাবনা মারিয়ামকে ঘিরে। এই শ্বাপদের দেশে সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে পথে বেরোনোর মতো ঝুঁকি আর কিছুতে নেই। ও মমতা নিয়ে আড়চোখে মারিয়ামের দিকে তাকায়। মারিয়ামের বাদামি চোখের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার ছায়া ওর বিষণ্ন মন আরো খারাপ করে তোলে।

ওর দুর্ভাবনাকে আরো বেশি প্রকট করতেই কি না কে জানে, উল্টো দিক থেকে ছুটে আসতে দেখা যায় একটি আর্মি ট্রাক। এই সন্ধ্যাতেই ট্রাকের চোখঝলসানো আলো দৈত্যের চোখের মতো জ্বলছে। আদনান তিনবার সুরা ইখলাস পড়ে। পাহাড়ের ওপর একাকী দাঁড়িয়ে থাকা চিনারগাছের মতো আর্মির ট্রাকটি পথ রোধ করে ওদের। পিচঢালা রাস্তায় কর্কশ শব্দ তুলে থেমে যায় বাস। যাত্রীদের মনে হয়, শব্দের ওই উৎস গাড়ির চাকা নয়, মেশিনগান। ভয়ে তাদের মুখগুলো চুপসানো। মারিয়াম হিজাব ঠিক করে ভয়ার্ত চোখে তাকায় আদনানের দিকে। দূরে বরফের টুপি পরা পর্বত এবং তার গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাইনগাছের সারি সন্ধ্যার এই ঝাপসা আঁধারেও দৃশ্যমান। শুভ্র পর্বত ও পাইনের বন আজ আর আকৃষ্ট করে না আদনানকে। ও কম্পিত হাতে মারিয়ামের আঙুল স্পর্শ করে ভরসা দেয়— ভয় পেয়ো না। নবীজি আমাদের সঙ্গে আছেন।

বাস থামতেই উর্দিপরা দুজন সৈনিক মেশিনগানের নল উঁচিয়ে ছুটে আসে এবং পজিশন নিয়ে দাঁড়ায় বাসের দরজার মুখে। অমনি ঝুপ করে এমন এক নীরবতা নেমে আসে বাসে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসা অফিসারের বুটের মচমচ শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। আদনানের সামনের সিটের প্রৌঢ় দোয়া

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পড়ে বুকে ফুঁ নেয় বারবার। ওদিকে অফিসারের ভয়ংকর শীতল চোখ ঘুরতে থাকে প্রতিটি যাত্রীর মুখের ওপর। পেছন থেকে কোনো এক বৃদ্ধের ভাঙা ভাঙা আয়াতুল কুরসির ধ্বনি ভেসে এলে বৃদ্ধের ওই আয়াতুল কুরসির ভেতর আদনান খুঁজে পায় দাদাজানের কণ্ঠস্বর। অফিসার হঠাৎ গর্জে উঠে কঠিন গলায় বলে, শ্রীনগর শহরে কেউ থামবে না। সবাই যার যার বাড়ি চলে যাবে। মিছিলে যোগ দিলে সবগুলোকে গুলি করব।

ডিউটি শেষ করে নামার জন্য বাসের পা-দানিতে পা রাখে অফিসার। মুখের বদলে তার ইউনিফর্মঢাকা পিঠটা ভেসে ওঠে যাত্রীদের চোখে। এতক্ষণ শ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছিল সবাই। অফিসারের প্রস্থানে চেপে রাখা নিশ্বাস যখন একযোগে ছাড়তে যাবে, ঠিক তখনই আবার ঘুরে যায় অফিসারের মুখ। কী ভেবে সে আদনানের সিটের কাছে এসে দাঁড়ায়— নাম কী তোমার?

আদনান।

বাবার নাম?

ফয়জুল্লাহ।

বাড়ি কোথায়?

গুরিহাকা।

জেলা?

পেহেলগাম।

কী করো?

পড়াশোনা।

কোথায়?

কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আইডি কার্ড দেখাও।

অনিচ্ছা নিয়ে আদনান আইডি কার্ড বের করে। ভেতরে-ভেতরে ও গজরায় কিন্তু বিরক্তির বিবমিষা প্রকাশ করবার উপায় নেই। মারিয়াম ফিসফিস করে দরুদ পড়ে আর দোয়া করে— হে আল্লাহ, তুমি আমাদের রক্ষাকারী। হে নবী, তুমি আমাদের হেফাজতকারী।

মারিয়ামের দোয়ার প্রভাবেই কি না কে জানে, অফিসারটি আর কোনো কথা না বলে নেমে যায় বাস থেকে। যখন বাস স্টার্ট করতে যাবে, ঠিক তখনই আবার ফিরে আসে সে। মারিয়াম ঢোঁক গিলতে গিয়ে অনুভব করে, তার গলার ভেতর তেতো তেতো ভাব। সে অসহায় চোখে জানালার ওপাশের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। রাস্তার ধারে একটি কাঠের বাড়ি, তার

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

সামনে একাকী দাঁড়িয়ে আছে একটি কাঠবাদামগাছ। গাছের নিচে জমাট বাঁধা অন্ধকার। মারিয়ামের চোখে সেই অন্ধকারের ছায়া পড়ে। অফিসার মারিয়ামের দিকে ইশারা করে আদনানের উদ্দেশে বলে, এই লাড়কি কী হয় তোমার?

ছোট বোন।

বোনকে নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাবে। মিছিলে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করলে আমরা সৈন্যরা তোমাকে খুঁজে নিয়ে মারবে।

বাস আবার ছাড়লেও আগের সেই স্বাভাবিকতা ফিরে আসে না আর। শবযাত্রার মতো নীরবতা বিষণ্ন করে তোলে বাসের ২০ জানুয়ারির সন্ধ্যা। যাত্রীদের চোখেমুখে অনিশ্চিত যাত্রার শঙ্কা। আদনান বুঝে যায়, শ্রীনগরে আবার শুরু হয়েছে বিক্ষোভ।

লালচকের কাছাকাছি আসতেই বাধার মুখে পড়ে বাস। ততক্ষণে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তার দুপাশের দোকানের ঝাঁপগুলো নেমে গেছে অস্বাভাবিক দ্রুততায়। ফুটপাতের পাশে খদ্দেরের আশায় আপেলের ঝুড়ি নিয়ে সব সময় বসে থাকে কয়েকটি ভাসমান দোকান। আজ দোকানগুলো নেই। কলার সেই পরিচিত ভ্যানটিও অদৃশ্য। কুয়াশার আধিপত্যে স্ট্রিট লাইটের দুর্বল আলোয় সামনের রাস্তা কেমন ভুতুড়ে। সেই ভুতুড়ে রাস্তায় জনতার জোয়ার। আদনানরা ভয় পাচ্ছিল তুষারপাত আর চেকপোস্টের, অথচ তাদের বাস থামিয়ে দিল জনসমুদ্রের মিছিল। জগমোহনের অপসারণ এবং গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তির দাবিতে শ্রীনগরের নারী-পুরুষ মশাল হাতে নেমে এসেছে রাজপথে। মশালের আলোয় চকচক করছে তাদের দীপ্ত চোখ। বারুদের মতো বাজছে তাদের কণ্ঠ। আদনানের হাত মারিয়ামকে ডিঙিয়ে সরিয়ে দিল জানালার কাচ। আর অমনি শীতল হাওয়ার সাথে সাগরের ঢেউয়ের মতো মুখের ওপর আছড়ে পড়ল স্লোগান :

আমরা কী চাই— আজাদি!

আমাদের দাবি— আজাদি!

লড়কে লেঙ্গে— আজাদি!

ছিনকে লেঙ্গে— আজাদি!

কী বিপুল বিক্রমে বাজছে ওই দীপ্ত শাণিত শব্দ— আজাদি আজাদি। এই উপত্যকার প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে খোদিত হয়ে আছে তুমুল প্রার্থিত ওই শব্দ— আজাদি। আদনানের শরীরের প্রতিটি কোষে শিহরণ বয়ে গেল। ওর স্পোর্টস জ্যাকেটে ঢাকা লোমকূপ খাড়া হয়ে গেল উত্তেজনায়।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

একমুহূর্তের জন্য ও বিস্মৃত হলো গন্তব্য। মারিয়ামকে যে নিরাপদে পৌঁছে দিতে হবে ঘরে, যার দূরত্ব প্রায় ষাট কিলোমিটার, অথচ এখনই রাত নেমে গেছে এবং এই বরফজমা শীতে বাস বন্ধ হয়ে গেলে এই জার্নি হবে পুলসিরাতের মতো ভয়ংকর— যাত্রাপথের এই সকল অনিশ্চয়তা এবং দুশ্চিন্তা আদনানের মস্তিষ্ক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিল আজাদির ওই স্লোগান। মিছিলের দিকে তাকিয়ে আদনান চোয়াল শক্ত করল। ছোকরা হেলপার বাসের গায়ে সজোরে থাপ্পড় মেরে বলল, বাস আর যাবে না। মিছিলে রাস্তা ব্লক।

নিচ থেকে কেউ একজন খেঁকিয়ে উঠল— রাস্তা মিছিলে ব্লক করেনি। রাস্তা ব্লক করেছে আর্মি।

আদনান পরিহাসের সাথে বিড়বিড় করল, কাশ্মীর পৃথিবীর এমন ভূস্বর্গ, যেখানে চোখ মেললে প্রকৃতির সাথে অনিবার্যভাবে ধাতব মেশিনগানও দেখা যায়।

আদনানের এই আক্ষেপ মিথ্যা নয়। আটাশ বছর পর, তত দিনে এই মৃত্যুপুরী আদনানের জীবননদীর স্রোত থামিয়ে না দিলে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এক গবেষণা জার্নাল পড়বার সুযোগ ঘটবে তার। সেই জার্নাল বিশ্ববাসীকে জানাবে, জম্মু এবং কাশ্মীরের প্রতি বর্গমাইলে নিযুক্ত আছে একশ জন ভারতীয় সৈনিক এবং প্রতি দশ জন বেসামরিক নাগরিকের বিপরীতে সক্রিয় আছে একজন সামরিক সদস্য। অথচ সমগ্র ভারতজুড়ে সৈনিক নিযুক্তির গড় ৮০০ : ১।

যেসব যাত্রীর গন্তব্য ছিল শ্রীনগর, রাস্তা অবরোধের খবর শুনে তারা ঝুপঝাপ করে নেমে গেল লালচকে। আর আদনানদের মতো অল্প কয়েকজন যাত্রী, যাদের গন্তব্য বাসস্ট্যান্ড, তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে লাগল। অসহায়ের মতো তারা চারপাশে তাকাতে লাগল আর ভাবতে লাগল করণীয়। ওদিকে হেলপারের কণ্ঠে তাড়া— সবাই নামেন। বাস আর যাবে না।

মেশিনগান কাঁধে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ইউনিফর্মধারী দুজন আর্মি। তাদের জলপাই রঙের হেলমেট এই অন্ধকারে কালো দেখাচ্ছিল। তবে কী এক অদ্ভুত কারণে মেশিনগান দুটো জ্বলজ্বল করছিল মারিয়ামের চোখে। সেদিকে ইশারা করে চুপসানো গলায় মারিয়াম বলল, এখন কী করবে? বাস তো যাবে না। ওদিকে শহরের অবস্থাও থমথমে।

মারিয়ামের দুশ্চিন্তা স্পর্শ করল না আদনানকে। ততক্ষণে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে আদনান। মিছিল তাকে ডাকছে। তার রক্তের ভেতর চনমন করছে উষ্ণতা। আজ সে বাড়ি ফিরবে না।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

মারিয়াম আতকে ওঠে— বাড়ি ফিরবে না মানে? সারা রাত মিছিল করবে নাকি? আমি কোথায় থাকব?

তুমিও মিছিলে আমার সঙ্গী হবে। বলেই সে মারিয়ামের হাত ধরে টান দেয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মারিয়াম নিজেকে আবিষ্কার করে ঠান্ডা হাওয়ার ফুটপাতে। আদনানের মুঠোর ভেতর তার কবজি। মারিয়ামের ভ্যাবাচেকা চেহারা দেখে আদনান ঠোঁট টিপে হাসে। এই শ্রীনগর শহরটি এমন, এখানে এলে শত দুর্বিপাকেও আদনান উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এখানেই যে ওর ক্যাম্পাস!

মারিয়াম কটমট করে তাকিয়ে বলে, আর্মির চেয়েও তুমি বড় গুন্ডা। এভাবে কেউ হ্যাঁচকা টান মারে নাকি! আরেকটু হলে হাতটা আমার খুলেই যেত। দ্রুত নামার ধকলে তার গোলাপি মুখ পাকা চেরির মতো রক্তিম হয়ে উঠেছে। মৃদু মৃদু কাঁপছে ঈগলডানার মতো বঙ্কিম ভ্রু। কৃত্রিম রাগে সে আদনানের মুঠো থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়। একটু থেমে বলে, এমন গুন্ডামি করলে দাদাজিকে বলে দেব কিন্তু।

রসিকতা ছেড়ে আদনান সিরিয়াস হয়। ওর পরিকল্পনার কথা জানায় মারিয়ামকে। এই রাতে বাড়ি ফেরা হবে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত ডিঙানোর চেয়েও কঠিন। আদনান চাচ্ছে রাতটা ওর ক্যাম্পাস হোস্টেলে কাটাতে। তবে তার আগে অবশ্যই মিছিলে অংশ নেবে।

মারিয়াম চেঁচিয়ে ওঠে— আমি তোমার সঙ্গে ছেলেদের হলে রাত কাটাব? পাগল নাকি!

শ্রীনগরে আমার এক বান্ধবী আছে, ফাতেমা ওর নাম। ডাললেকের পাশেই ওদের বাড়ি। তুমি ফাতেমার কাছে থাকবে আর আমি হলে। কাল সকালে বাড়ি ফিরব।

শহরের এই দুর্যোগে মারিয়ামের মুখের আলো আগেই নিভে গিয়েছিল। এখন ফাতেমার প্রসঙ্গ উঠতেই ওর চেহারায় রাত্রি নেমে আসে। ও অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো। ফাতেমার বাড়িতে আমি থাকতে পারব না।

মারিয়ামের মনে বয়ে চলা ঈর্ষাস্রোতের তরঙ্গধ্বনি শুনতে পায় আদনান। ও হাসতে হাসতে বলে, ফাতেমাকে তুমি ঈর্ষা করছ। ও আমার সাথে পড়ে। শুধুই ক্লাসফ্রেন্ড।

তুমি আমার সামনে কখনো ফাতেমার নাম উচ্চারণ করবে না।

আচ্ছা করব না। এবার চলো তো মিছিলে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

মিছিল ততক্ষণে লালচক অতিক্রম করে মাইসুমার দিকে যাচ্ছে। আজাদির স্বপ্নে বিভোর আদনান মারিয়ামের হাত ধরে মিছিলে শামিল হয়। সঙ্গে একটি মেয়ে থাকার কারণে আদনান মিছিলের সম্মুখভাগে যেতে পারে না। বরং মিছিলের যে পাশটায় নারীদের সারি, সেখানে মারিয়ামকে ঢুকিয়ে দিয়ে ও তার পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। একটু পর আদনান তার আশপাশের অংশটুকুর নেতৃত্ব দিতে শুরু করে এবং সে নারীদের উদ্দেশে স্লোগান তোলে— আমাদের বোনদের দাবি কী?

বোনেরা গলা ফাটিয়ে প্রত্যুত্তর করে— আজাদি।

আমাদের মায়েদের দাবি কী?

মায়েরা গলা ফাটিয়ে প্রত্যুত্তর করে— আজাদি।

আমাদের কন্যাদের দাবি কী?

কন্যারা গলা ফাটিয়ে প্রত্যুত্তর করে— আজাদি।

আদনান এবার এক মায়ের কোল থেকে তার সন্তানকে কেড়ে নিয়ে মাথায় তুলে স্লোগান দেয়— আমাদের সন্তানদের দাবি কী?

মায়েরা, বোনেরা এবং কন্যারা সমস্বরে বলে— আজাদি।

স্লোগানের ফাঁকে ফাঁকে আদনান মারিয়ামের দিকে তাকায়। লাল হিজাব এবং কালো পিরহানে মারিয়ামকে সত্যিকারের যোদ্ধাদের মতো লাগে। ওর মুষ্টিবদ্ধ হাত যখন স্লোগানের জন্য ওপরে উঠছে, আদনানের হৃদয়ে লিডার নদীর শুভ্র ফেনিল ঢেউ উঠছে আবেগের। যে জাতির নারীরা আজাদির জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে, সে জাতি পরাধীন থাকতে পারে না। ও মারিয়ামের দিকে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে স্লোগান তোলে— আমাদের স্ত্রীদের দাবি কী?

নারীরা প্রত্যুত্তর করে— আজাদি।

ধীরে ধীরে রাত বাড়ছে। ঘাতকের মতো নিকষ কালো অন্ধকার জেঁকে বসছে উপত্যকায়। সেই নিকষ অন্ধকারে মাইসুমার রাস্তায় জ্বলজ্বল করছে একগুচ্ছ আলোর মশাল। মশালের দীপ্ত আলোয় কাশ্মীরি যুবক-যুবতিদের ফরসা মুখ দেখাচ্ছে পাথরের মতো শক্ত। আদনান খেয়াল করে, মশালের প্রতিবিম্ব পড়ে মারিয়ামের চোখ জোড়া যেন পরিণত হয়েছে আরেক মশালে, আজাদির স্বপ্নে যে চোখে ছুটছে আলোর ফুলকি। পরিস্থিতি একদিন যে মারিয়ামের সঙ্গে মিছিল করবার সুযোগ এনে দেবে, কোনো দিন ভাবেনি আদনান। মারিয়ামের উদ্দীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ওর বুকের ভেতর আনন্দের ঝিলাম নদী বয়ে যায়। ও স্বপ্ন দেখে, মারিয়াম একদিন বধূ হয়ে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ওর ঘরে আসবে। হায়েনার হিংস্র থাবাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ওরা পেহেলগামের সবুজ গ্রামে পাতবে সুখের সংসার। দুজন মিলে নির্মাণ করবে স্বাধীনতার সৌধ। সন্তানদের ভেতর ওরা ছড়িয়ে দেবে বিপ্লবের চেতনা। স্বাধীন মাতৃভূমির উজ্জ্বল সূর্য ওরা দেখে যেতে না পারলেও সন্তানেরা যেন সেই সূর্য ছিনিয়ে আনতে জীবন বাজি রাখে, এমন এক প্রজন্ম রেখে যেতে চায় আদনান। মারিয়াম হবে তো ওর সঙ্গী?

মোড় ঘুরে মিছিলটি গাউকাদাল সেতুর দিকে এগোয়। সেতু পার হয়ে এক দরবেশের মাজার। উত্তেজনায় দরবেশের নামটি মনে করতে পারে না আদনান। দরবেশের সেই মাজার জিয়ারত করে ওরা আবার ফিরে আসবে শহরে। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুবাদে রাজধানী শ্রীনগরের সকল শ্রীই আদনানের নখদর্পণে। মিছিলটি সেতুতে উঠতে গেলে ও সবাইকে সতর্ক করে— তোমরা সাবধানে ওঠো। এটা পুরোনো কাঠের সেতু। সবাই একসাথে চাপলে সেতু ভেঙে পড়তে পারে।

মারিয়াম সেতুর নিচে ঝিলামের কুলকুল ধ্বনি শুনতে পায়। জানুয়ারির এই শীতে ঝিলামের পানি জমাট বেঁধে বরফ। শুধু মাঝখানে নালার মতো একটুখানি পানির ধারা বহমান। সেই সরু পথে গলিত পানির চাপ তুলনামূলক বেশি। অন্ধকারেও জলধারার দুর্বিনীত স্রোত কল্পনা করতে পারে মারিয়াম।

সেতুর ওপাশে যমদূতের মতো ঘাপটি মেরে আছে প্যারামিলিটারি ও সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স— জানত না বিক্ষোভকারীরা। কিংবা যারা জানত, তারা ভাবতেও পারেনি এই অন্ধকারে সৈন্যদের মেশিনগান রক্তনেশায় মেতে উঠবে। বিক্ষোভকারীরা যখন ভঙ্গুর সেই কাঠের সেতুতে উঠল, অমনি এক সঙ্গে গর্জে উঠল তাদের মেশিনগান। সূচিত হলো কাশ্মীরের প্রথম গণহত্যার।

গুলির শব্দ কানে আসতেই সবার আগে মনে পড়ল মারিয়ামের কথা। মারিয়াম মারিয়াম বলে চিৎকার করে আদনান ছুটে গেল মেয়েদের সারির দিকে। ততক্ষণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে বিক্ষোভকারীরা। তাদের হাত থেকে ছিটকে গেছে মশাল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে গেছে গাউকাদাল সেতু। আতঙ্কিতদের চিৎকার-চেঁচামেচি আর আহতদের আর্তনাদে যেন সময়ের আগেই নেমে এসেছে কেয়ামত, এই সেতুর ওপর। অন্ধকারে একটি মেয়েকে মনে হলো মারিয়াম। আদনান তার কাছে ছুটতে যাবে, ঠিক তখনই ছলকে ওঠা উষ্ণ রক্ত এসে পড়ল ওর চোখে। কোন হতভাগার শোণিতধারা— বুঝে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

উঠতে পারল না ও। ততক্ষণে অনেক মানুষের লাশ পড়ে গেছে সেতুর ওপর। মিছিলের সম্মুখভাগ এখন অনেকটাই ফাঁকা। উলের টুপি খুলে ও মুখের রক্ত মুছতে যাবে, ঠিক তখনই শিসকাটা একটি বুলেট এসে বিদ্ধ হলো ওর ডান বাহুতে। এমন অসহনীয় যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে আগে কখনো জারিত হয়নি ওর জীবন। মাথা ঘুরে পড়ে যেতে লাগলে ও সেতুর রেলিং ধরতে গেল। কিন্তু আতঙ্কিত মানুষের ছোটাছুটিতে তখন এমনভাবে কাঁপছিল কাঠের সেতুটি, আদনান রেলিং ধরতে ব্যর্থ হলো। শরীর অবশ হওয়া তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে ও রেলিংয়ের ওপাশে নদীতে পড়ে গেল। পতনের আগে ও শুধু অনুভব করল, উর্দিপরা কয়েকজন সৈন্য সেতুর ওপর উঠে এসেছে, তখনো যারা বেঁচে আছে, তাদের গ্রেপ্তার করতে।

দুই

না চাইলেও রায়হানের সাথে প্রায় দিনই মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে আদনান। আজ নিয়ে কতবার যে হলো এই ঠুকোঠুকি, আদনান মনে করতে পারে না। অথচ প্রতিটি হাঙ্গামার পর আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে ও প্রতিজ্ঞা করে, আর কখনো লড়বে না। এই সব লড়াইয়ে মুখের ওপর নখের আঁচড় আর শার্টের বোতাম ছেঁড়া ব্যতীত কোনো লাভ হয় না। উল্টো সব দোষ চাপে আদনানের ঘাড়ে। মা বলেন, বড় ভাইয়ের সাথে মারামারি করিস, তোর লজ্জা করে না! মায়ের মুখে বড় ভাই শব্দযুগল উচ্চারিত হতেই হেসে ফেলে আদনান। কী আমার বড় ভাই! কয়েক মিনিট আগে ভূমিষ্ঠ হলেই সে বড় ভাই হয়ে যায়?

আদনান মারামারি করতে চায় না। কিন্তু পরিস্থিতি এমনভাবে মারামারির প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে প্রত্যেকবার, না লড়ে আর উপায় থাকে না। এই যেমন আজ, স্কুল থেকে ফিরে ও আপেলবাগান পাহারা দিচ্ছিল। ক্যালেন্ডারে অক্টোবরের পয়লা তারিখ পড়তেই ওদের বাগানের আপেলগুলো পেকে লাল হয়ে ওঠে। তখন চোখ ফেরানো যায় না। সবুজ পাতার ফাঁকে থোকায় থোকায় ঝুলে থাকে লাল টুকটুকে মসৃণ ফলগুলো। একবার ইচ্ছা করে দেখতে, আরেকবার ইচ্ছা করে ছুঁতে। আদনান চোখ ভরে দেখে এবং হাত ভরে ছোঁয়। বাগানের কোল ঘেঁষে বহমান শিশনাগ খালের কুলকুল ধ্বনি তখন অলৌকিক বাজনা বাজায়। আর দূরে সবুজের মুখরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এক অপার্থিব পর্বত। এমন স্বর্গীয় সৌরভ ছড়িয়ে থাকে চারপাশে—

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আদনানের মন ভালো হয়ে যায়। তবে এই মায়াবী সৌন্দর্যের ভেতর কদর্যতাও হানা দেয় মাঝে মাঝে। পাড়ার দরিদ্র দুষ্টু ছেলেরা তক্কে তক্কে থাকে আপেল চুরির। সুযোগ পেলেই ডাল ভেঙে লাপাত্তা। আপেল পাকার মৌসুম এলে তাই বাড়তি কর্মচাঞ্চল্য তৈরি হয় আদনানদের পরিবারে। এই মৌসুমি ফল বিক্রির টাকায় যে ওদের সংসারের চাকায় গতি আসে।

আজ স্কুল থেকে ফেরার পথে ও যখন দাদাজির দোকান অতিক্রম করছিল, দাদাজি চিৎকার করে বলেছিলেন, খেয়ে বাগানে চলে যা। কয়েক দিন ভালো করে পাহারা দিতে হবে।

জ্বি যাচ্ছি বলে আদনান যেমন সাড়া দিয়েছিল, তেমনি দাদাজানের মুদিদোকানের সামনে সাইকেলের ওপর থেকে ও লম্বা পা নামিয়ে দিয়েছিল মাটিতে। ইদানীং ওর এই এক অভ্যাস হয়েছে। কারণে-অকারণে সাইকেল থেকে মাটিতে পা নামিয়ে দেয়। গেল বছর ও যখন ক্লাস এইটের ছাত্র, তখনো সাইকেলে বসা ওর পা এতটা সহজে মাটি স্পর্শ করত না। লম্বা হচ্ছে আদনান। বড়ও। ওর পা এখন সাইকেলের সিট থেকে অনায়াসে মাটি ছুঁচ্ছে। আর দেড় ক্লাস পড়লেই ও কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। হুট করে ওর এই যে বড় হয়ে যাওয়া, সবাইকে দেখিয়ে ও আনন্দ পাচ্ছে।

বাড়ির সবাই ব্যস্ত। বাবা গুরিহাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ান। মা ঘর সামলান। দাদাজি দোকান চালান। ছোট বোন নূরজাহান সংসারের ধার ধারে না। একটি রাখাল আছে, তার কাজ ভেড়া চরানো। রইল বাকি আদনান আর রায়হান। ওরা দুজন একই মায়ের গর্ভ থেকে একই দিনে পৃথিবীতে আসা দুই ভাই। রায়হান এসেছে কয়েক মিনিট আগে আর আদনান কয়েক মিনিট পরে। জন্মদিন অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও মায়ের জরায়ু ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার দৌড়ে পিছিয়ে পড়ায় রায়হানের ছোট আদনান। অন্তত মায়ের কাছে। আর এ কারণে দুই ভাই মারামারিতে জড়ালে, দোষ যারই থাকুক, মায়ের বকুনি বরাদ্দ থাকে আদনানের জন্য। এ সময় আদনানের খুব আফসোস হয়। জন্ম নেবার যুদ্ধে পিছিয়ে পড়ার আফসোস।

আপেলবাগানে একটি পাথরের ওপর বসে ঘাসের ডগায় আঙুল ছোঁয়াচ্ছিল আদনান। অক্টোবরের ২ তারিখ আজ। উপত্যকায় শীত বাড়তে শুরু করেছে। পর্বতগুলো সাদা হচ্ছে। দু-এক দিনের ভেতর শ্রীনগর থেকে রাজধানী বদলি হবে জম্মুতে। রাজ্যের সকল নথিপত্র পিঁপড়ার সারির মতো দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে তোলা হবে। অতঃপর সেই কনভয় সেনাবাহিনীর প্রহরায় যাত্রা করবে শ্রীনগর থেকে জম্মু। তখন রাস্তায় সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকবে। সে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ! রাজধানী স্থানান্তরের এই গল্প

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

দাদাজানের মুখে শুনেছে আদনান। কখনো দেখার ভাগ্য হয়নি। আদনান ভাবে, কোনো একবার রাজধানী বদলের ওই দিনে বানিহাল টানেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর বিস্ময়ভরা চোখে শুনবে কনভয়ের লরিগুলো।

বাগানের শেষ প্রান্তে নূরজাহানের বয়সী দুটো মেয়ে ঘুরঘুর করছিল। মেয়ে দুটোর চাহনি সন্দেহজনক। ওদের মলিন বেশবাস আর পাজামার ভেজা প্রান্ত আদনানের সন্দেহকে আরো বাড়িয়ে তুলল। সম্ভবত শিশনাগ খাল পার হয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই আপেল চুরির ধান্দা। আদনান মেয়ে দুটোকে ডাকল। একটুক্ষণ ওরা পরস্পরে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে জড়তামাখা পায়ে সেই পাথরখণ্ডের দিকে আসতে লাগল, যে পাথরের ওপর বসে ছিল আদনান। ঢোলা ময়লা জামার ভেতর ঢলঢল করছিল ওদের রুগ্‌ণ শরীর। তবে কাশ্মীরের চিরায়ত নারীদের মতো মুখের রং গোলাপি সাদা। খাড়া নাক। চোখের মণি বাদামি। আদনানের এক স্যার কাশ্মীরি মেয়েদের নাকের তীক্ষ্ণতাকে প্রকাশ করেন 'উদ্ধত' শব্দ দ্বারা। স্যারের কাছ থেকে ধার করে আনা সেই শব্দ মনে মনে আওড়াল আদনান— দারিদ্র্য তোমাদের নাকের ঔদ্ধত্যকে সংকুচিত করতে পারেনি। মুখে বলল, তোমাদের নাম কী?

যে মেয়েটির মাথায় বেগুনি হিজাব, সে বলল, আমার নাম আলেয়া। আর যার মাথায় গোলাবি হিজাব, সে জানাল, ওর নাম আতিকা।

বাড়ি কোথায়?

মেয়ে দুটো পূর্ব দিকে হাত ইশারা করে একসঙ্গে বলল, বাতেকান গ্রামে।

ওখানে কী করছিলে?

ওরা এবার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের বাদামি চোখে অব্যক্ত কোনো ব্যথার ছায়া চিনারের শুকনো পাতার মতো জেগে রইল। কয়েকবারের জেরার পর ওরা যা জানাল তা এই : সম্পর্কে ওরা চাচাতো বোন। ওদের দাদিজান অসুস্থ। বেশি দিন বাঁচবার আশা নেই। দাদিজানের আপেল খাওয়ার শখ হয়েছে। কিন্তু ওদের গাঁয়ে কারো আপেলবাগান নেই এবং আল্লাহ ওদের বাবাদের এমন দরিদ্র বানিয়েছেন, মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের শখ পূরণের সংগতিও তাদের নেই। আর এ কারণেই তারা বাতেকান থেকে ছুটে এসেছে এই আপেলবাগানে। যদি মালিককে বলে দুটো আপেল চেয়ে নিতে পারে।

মেয়ে দুটোর সাথে কথা বলতে ভালো লাগছিল আদনানের। ওদের জায়গায় নূরজাহানকে কল্পনা করে ও নিজের বাবাকে ধন্যবাদ দিল। ওর বাবাও যদি এদের বাবার মতো হতদরিদ্র কৃষক হতো, তবে নূরজাহানকেও

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

হয়তো অন্যের কাছে হাত পাততে হতো। ভাগ্যিস আদনানের বাবা একটি চাকরি করেন এবং তার যথেষ্ট স্থাবর সম্পত্তি আছে। মেয়ে দুটোর হাতে দুই থোকা পাকা আপেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল আদনান। ইচ্ছা করলে ওরা দুপুরবেলা নির্জন বাগান থেকে আপেল চুরি করতে পারত। কিন্তু ওরা তা করেনি। দাদাজি চৌর্যবৃত্তিকে ভীষণ ঘৃণা করেন। বলেন, আজ কেউ আপেল চুরি করলে কাল সে ডাকাতি করবে। আপেল চুরির সুযোগ দিয়ে কাউকে ডাকাত বানানো যাবে না। তবে যেকোনো দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য দাদাজানের হৃদয়ের দুয়ার সব সময় উন্মুক্ত। নাতি হিসেবে সেই মমতার উত্তরাধিকার কিঞ্চিৎ হলেও লাভ করেছে আদনান। মেয়ে দুটোর মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে ওর হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠল। লাফ দিয়ে ডাল নুইয়ে ও এক থোকা আপেল পাড়তে যাবে, তখনই দৃশ্যপটে উদিত হলো রায়হান। আদনানের কয়েক মিনিটের বড় ভাই সে, অথচ এমন গর্জন দিল, মনে হলো যেন সে আদনানের পিতৃতুল্য অভিভাবক। সে হুংকার ছেড়ে বলল, কার হুকুমে আপেল পাড়ছিস? জানিস না সম্পূর্ণ পেকে ওঠার আগে আপেল পাড়া বারণ? বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ নেই এখানে অথচ বছরের প্রথম ফল তুই ছিঁড়তে লেগেছিস।

আদনান ডালটাকে নুইয়ে রেখেই মেয়ে দুটোর দাদিজানের কথা বলল। ওদের দাদির অসুস্থতা এবং আপেল খাওয়ার শখের কথা বলল। কিন্তু রায়হানের মন তাতে নরম হলো না। উল্টো সে আতিকাদের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল। এবং একই রকম হুংকার ছেড়ে বলল, আপেল খাওয়ার শখ হয়েছে, কিনে খেতে পারিস না! আবার কখনো এই বাগানে দেখলে খবর আছে তোদের। যা, ভাগ!

আচমকা ধমকের মুখে পড়ে মেয়ে দুটো কেঁপে উঠল সন্ত্রস্ত ছাগলছানার মতো। ওদের ম্লান মুখের অবশিষ্ট ঔজ্জ্বল্যটুকু দপ করে নিভে গেল। একবার আদনানের দিকে চেয়ে ওরা সবুজ ঘাসের প্রান্তরে পা রাখল, একটু আগে যে ঘাস মাড়িয়ে ওরা এসেছিল। আদনান ছুটে গেল ওদের সামনে— একটু দাঁড়াও। আমি তোমাদের আপেল দিচ্ছি। ওই গুন্ডাটার কথা শুনে মন খারাপ কোরো না।

আমাকে গুন্ডা বললি কেন? মুঠ পাকিয়ে মারতে ছুটে এল রায়হান।

এইটুকু মেয়েদের সাথে যে দুর্ব্যবহার করে, সে গুন্ডা নয় তো কী! এই, তোমরা যাবে না।

আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি আর তুই কিনা ওদের থাকতে বলিস! এত বড় স্পর্ধা তোর! বলেই আদনানের শার্টের কলার চেপে ধরল রায়হান আর

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আদনান সজোরে ধাক্কা মারল ভাইকে। আদনানের ধাক্কায় দূরে ছিটকে পড়ল রায়হান, তবে তার আগে পটপট করে ছিঁড়ে গেল আদনানের শার্টের দুটো বোতাম। ছেঁড়া ওই বোতামের দিকে চেয়ে মায়ের রাগী এবং বিরক্ত মুখটা ভেসে উঠল আদনানের চোখে। আজ রাতে মায়ের বকুনি অবধারিত। আদনান যখন মায়ের কথা ভাবছিল, ততক্ষণে পতনের ধাক্কা সামলে নিয়েছে রায়হান। দ্বিগুণ ক্রোধ এবং শক্তি নিয়ে ও আবার ছুটে এল আদনানের কাছে। ততক্ষণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে আদনানও। এবার শুরু হলো ধস্তাধস্তি। আপেলবাগানে, সবুজ ঘাসের প্রান্তরে একবার রায়হান আদনানের গায়ের ওপর ওঠে তো আরেকবার আদনান রায়হানের গায়ের ওপর ওঠে। পাশেই কুলকুল শব্দে বয়ে চলে হাঁটুজলের শিশনাগ খাল। পাথরের ওপর দাঁড়ানো একটি মাছরাঙা শিশনাগকে সামনে নিয়ে ধ্যান করে জলের। মাথার ওপর উড়তে থাকে এক জোড়া চিল। দুধের ভারে ফুলন্ত বাঁট নিয়ে হেঁটে যায় একটি গাভি, পেছনে তার পুষ্ট সন্তান। প্রকৃতির এই পটভূমিকায় যুদ্ধরত আদনান আর রায়হানের ফরসা মুখ পাকা চেরির মতো লাল। কপালে, নাকের নিচে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জংলি লতার মতো অপরিপাট্য চুল। ওদের মারামারি ততক্ষণ চলে, যতক্ষণ না দুজনই চূড়ান্ত রকমের ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একটু পর, সন্তান নিয়ে গাভিটি যখন দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়, মারামারির ধকল সামলাতে দুজন দুই প্রান্তে পা ছড়িয়ে বসে। ওরা এমনভাবে হাঁপায়, ওদের বুকের ওঠানামা দেখে যুদ্ধক্লান্ত ঘোড়ার কথা মনে পড়ে। একটু জিরিয়ে নিয়ে ওরা আবার মারামারির প্রস্তুতি গ্রহণ করলে আপেলবাগানের প্রবেশপথে দেখা যায় তারিক ও অজিত সিংয়ের মুখ। দুজনই আদনানের বন্ধু। ক্রিকেট খেলার সাথি। একই মহল্লায় বাড়ি। নামের গায়েই লেগে আছে ওদের ধর্মপরিচয়ের ছাপ— অজিত হিন্দু, তারিক মুসলমান। তবে ভিন্নধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের ছাপ ওদের বন্ধুত্বে পড়েনি কখনো। ওরা বন্ধুই শুধু নয়, পারিবারিকভাবেও ওরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ। আজ এই অবেলায়, শান্ত নিবিড় আপেলবাগানে, একই মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া দুই ভাইয়ের যুদ্ধংদেহী অবস্থান সচকিত করে তোলে দুই বন্ধুকে। ওরা ছুটে আসে। ওরা দুই ভাইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রতিহত করে আরো একটি অত্যাসন্ন যুদ্ধ। দুই ভাইকে দুই প্রান্তে সরিয়ে দিয়ে ওরা চিৎকার করে বলে, তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করছ কেন!

রায়হান এর প্রত্যুত্তর করে না কোনো। ক্ষিপ্ত হয়ে সে বাগান ত্যাগ করে আর আদনানের তখন মনে পড়ে মেয়ে দুটোর কথা, যাদের কারণে মারামারির সূত্রপাত। ওর ধারণা হয়, আতিকারা হয়তো পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

মারামারি দেখছে। সেই ভাবনা থেকে ও পেছন ফিরে আতিকাদের সঙ্গে কথা বলতে যায়, কিন্তু ওর চোখ শূন্য বাগানে হোঁচট খায়। আশাহত হয়ে চলে গেছে ওরা। ওদের খুঁজতে আদনান তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। দেখে, পাজামার ঝুল উঁচু করে জেগে থাকা পাথরে পা রেখে শিশনাগ খাল পার হচ্ছে মেয়ে দুটো। নিজেকে এত তুচ্ছ আর ছোট লাগে আদনানের, লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা করে। ওরা নিশ্চয় বাড়ি গিয়ে বাবা-মার কাছে সব বলে দেবে। আপেল দেওয়া নিয়ে গুরিহাকার দুই ভাই লড়াই করেছে শুনে ওদের বাবা-মা নিশ্চয়ই খুব অবাক হবে। পরিচয় জানতে পারলে ওদের পরিবার ছোট হয়ে যাবে বাতেকানের মানুষের কাছে। রায়হানের ওপর এত রাগ হয় আদনানের, ইচ্ছা করে ভেড়া জবাই করা ছুরি দিয়ে ওর গলা কেটে দিতে!

আজ আবার কী নিয়ে লাগল? ওই মেয়ে দুটোই-বা কারা? কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না তারিক।

ওরা ওদের অসুস্থ দাদির জন্য আপেল চাইতে এসেছিল। আমি দিতে গেছি, তাতেই খেপে গেছে রায়হান। রাগে ফুঁসতে থাকে আদনান। ক্রোধে ওর গলার স্বর এঁকেবেঁকে যায়।

শান্ত হও। জানোই তো, রায়হান একটু অন্য রকম। অজিত কাঁধে হাত রাখে আদনানের।

আদনান কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে উঁচু কণ্ঠে বলে, অন্য রকম অন্য রকম করেই ওর সব অন্যায় আড়াল করা হয়, সব সময়।

আমরা একটা কাজ করতে পারি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে কৃত্রিম গাম্ভীর্য তৈরি করে বলে তারিক।

কী কাজ? জিজ্ঞেস করে অজিত।

আমরা গোপনে ওদের বাড়িতে আপেল পৌঁছে দিতে পারি।

কিন্তু ওদের বাড়ি তো চিনি না।

নাম জিজ্ঞেস করিসনি?

হ্যাঁ।

তাহলে তো হলোই। নাম জানা থাকলে মানুষ খোঁজা কোনো ব্যাপার না।

সিদ্ধান্ত হলো— পরদিন বিকেলে ওরা আতিকাদের বাড়িতে গোপনে আপেল পৌঁছে দেবে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তিন

গুরিহাকার দোতলা কাঠের বাড়িতে অক্টোবরের রাত নেমেছে। বাড়ির সামনে বেদানার মতো গোলাকৃতির উঠোন। উঠোনের তিন পাশ, বাড়ির দিকটা বাদে, কাঠের বেড়ায় ঘেরা। বাড়িতে প্রবেশের সদর দরজাটি রাজতোরণের মতো শৌখিন। দুই পাশ থেকে উঠে গেছে কাঠের দুটো থাম। ওপরে দুই থামকে সংযুক্ত করেছে ঢেউখেলানো খিলান। দূর থেকে গেটটি দেখলে মনে হয় ওখানে বুঝি কোনো নৃপতির বসবাস। উঠোনের ঠিক মাঝখানে হাত-পা ছড়ানো একটা কাঠবাদামগাছ। ডিসেম্বরের শীতে কাঠবাদামের সবুজ পাতারা সাদা হয়ে থাকে তুষারে। সদর দরজা দিয়ে উঁকি মারলে উঠোনের ডান পাশে পড়ে ভেড়ার খামার, বাঁ পাশে মুরগির খোপ। শফিক নামের যে ছেলেটি ভেড়া দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত, তার থাকার জায়গাটাও ভেড়ার ঘরের সাথেই। গৃহকর্ত্রী নাজনীন বেগম রাতের খাবার সাজাচ্ছিলেন। দরজা-জানালা বন্ধ বলে পিতলের বাসনের টুংটাং শব্দ দ্বিগুণ জোরে বাজছিল ঘরটিতে। খাবার ঘরের পুরো মেঝেজুড়ে সবুজ নরম কার্পেট। কার্পেটের চার প্রান্তে হলুদ হরফে উৎকীর্ণ আতিথেয়তার প্রশংসাসমৃদ্ধ উর্দু কবিতার চরণ। যেন অতিথিদের অবহেলার ভাবনা ঘুণাক্ষরেও মনে না আসে কারো। বিজলিবাতির আলোয় সবাই যখন খেতে বসে, একজনের অনুপস্থিতি সকলের নজরে পড়ে। এই পরিবারের মুরব্বি আবদুল লতিফ, কাঠের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে, অনুপস্থিত সদস্যের শূন্য আসনের দিকে তাকিয়ে বলেন, আদনান কোথায়? ওকে দেখছি না যে!

মুখরা নূরজাহান চটপট করে বলে, ভাইয়াজি ভেড়ার ঘরে শুয়ে আছে। আজ সে খাবে না।

ঘটনা সত্য। নূরজাহান যখন দাদাজিকে উপর্যুক্ত তথ্য দিচ্ছিল, আদনান তখন শুয়ে আছে শফিকের বিছানায়। পাশ থেকে ভেড়াদের ঢুসোঢুসির শব্দ আসছে। মুরগির কককক ধ্বনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে রাত বাড়ছে, খেতে যাও। কিন্তু আদনান আজ খাবে না। ঘুমোতেও যাবে না নিজের ঘরে। নিজের ঘর মানেই তো রায়হানের সাথে বিছানা ভাগ করে শোয়া। যার কারণে আজ ও অপদস্থ হলো দুটি মেয়ের কাছে, কানমলা খেল মায়ের হাতে, তার সঙ্গে ও ঘুমোতে পারে না।

দরজায় লণ্ঠনের ছায়া পড়ল। ভেড়াগুলোকে শেষবারের মতো দেখে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল শফিক। শফিকের ছায়া দরজায় পড়তেই কম্বলের ভেতর পুরো শরীর চালান করে দিল আদনান। আজ শফিককেও ওর অসহ্য

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

লাগছে। সমবয়সী হলেও মনিবের সন্তান হিসেবে আদনানকে শফিক ভাইয়াজি সম্বোধনে ডাকে। লণ্ঠনটা কম্বলের ওপর বাড়িয়ে ধরে আদনানকে ডাকতে লাগল শফিক— ভাইয়াজি, ও ভাইয়াজি! দাদাজি তোমাকে খেতে ডাকে।

আদনান এক ঝটকায় কম্বল থেকে মুখ বের করে বলল, দাদাজিকে বলে দাও ভাইয়াজি আজ খাবে না। আজ তার মেজাজ খারাপ। বলেই আবার সে হারিয়ে গেল কম্বলের তলে।

শফিক অসহায় গলায় বলল, না খাও ভালো কথা, কিন্তু নিজের ঘরে ঘুমাতে তো যাও। এখানে ভেড়ার গন্ধে তোমার ঘুম হবে না।

আদনান আগের মতো মুখ বের করে বলল, তুমি চুপ থাকলেই ঘুম হবে। ভেড়ার চেয়ে তুমি বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছ।

ভাইয়াজি কি আমাকে ভেড়ার চেয়েও অধম বলতে চাচ্ছ?

না, শুধু ভেড়া না, তুমি মুরগির চেয়েও অধম। এবার ভাগো। বাইরে গিয়ে ককককক করে ডাকো।

কোথায় ভাগব? এটাই তো আমার ঘর, আমার বিছানা।

আমার ঘরে গিয়ে ঘুমাও।

তাই আবার হয় নাকি! রাতে যদি ভেড়া মারামারি করে, তুমি কি ঠেকাতে পারবে?

পারব। একশবার পারব।

আদনান, তোমার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। খেতে এসো। হঠাৎ বজ্রপাত। দরজায় বাবার কণ্ঠস্বর।

চাকরের সামনে অমিততেজি আদনান এবার চুপসে গেল মুহূর্তে। বাবার গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভুলিয়ে দিল ওর অনাহারে থাকার প্রতিজ্ঞা। অনিচ্ছা নিয়ে আদনান বেরিয়ে এল কম্বলের ভেতর থেকে। লণ্ঠনের আলোর উল্টো দিকে দীর্ঘ ছায়া ফেলে ও ত্যাগ করল শফিকের ঘর। খাওয়ার পর ওদের দুই ভাইকে নিজের ঘরে ডেকে নিলেন বাবা। রেডিও বগলে করে দাদাজি চলে গেলেন নির্ধারিত বিছানায়। বাবার ঘর মানেই জ্ঞানের রাজ্য। দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিনের স্তূপ। তাকে সাজানো সারি সারি বই। বেশির ভাগই ইতিহাস এবং রাজনীতির। আছে সাহিত্যের বইও। গালিব, হাফিজ, ইকবাল, ওমর খৈয়ামের কালেকশন আছে। গ্রামের একজন সাদামাটা দরিদ্র স্কুলমাস্টারের বিদ্যাপ্রীতি অবাক করে আদনানকে। এই বয়সেই আদনান বুঝে গেছে, একটি রাজনীতিসচেতন পরিবারে তার জন্ম হয়েছে। দাদাজি ভারী ভারী ইংরেজি বই পড়তে না পারলেও নিয়মিত তিনি পত্রিকা পড়েন। আর রেডিও

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তো তার নিত্যসঙ্গী। ঘুমোতে যাওয়ার সময়ও রেডিও তার শিথানের কাছে থাকবেই। গোলমালটা লাগে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচের দিনে। সেদিন রেডিও নিয়ে দাদা-নাতির মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়। দাদাজানের ক্রিকেট নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই অথচ আদনান ক্রিকেট বলতে অজ্ঞান। পাড়ার ভেতর এই একটাইমাত্র রেডিও। আদনানের ক্রিকেট খেলার বন্ধুরা এদিন সকাল সকাল হাজির হয়ে যায় আদনানদের বাড়িতে। বিছানার মাঝখানে রেডিও রেখে সবাই চারপাশে গোল হয়ে বসে। মা একদিন কাপভরতি লবণ-চা দিতে এসে ওদের এই ধ্যান দেখে হেসে গড়িয়ে পড়েছিলেন। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তোরা তো দেখি কাবাঘরের মতো রেডিওকে তাওয়াফ করছিস।

খেলা শোনার দিন প্রায়ই স্কুল কামাই হয়ে যায়। ওরা সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করে, ক্রিকেট ম্যাচগুলো যেন ছুটির দিনে হয়। বিশেষত, ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ বন্ধ কিংবা খোলা যেদিনই হোক, ওরা স্কুলে যায় না। ভারতের বিপক্ষে ওরা সব সময় পাকিস্তানকে সাপোর্ট করে। আদনান কোনো দিন কোনো কাশ্মীরিকে দেখেনি ক্রিকেটে ভারতকে সাপোর্ট করতে। বরং ভারত যার বিপক্ষে, কাশ্মীরিরা তার পক্ষে। হোক সে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া কিংবা পাকিস্তান। তবে হ্যাঁ, ওদের একটিমাত্র বন্ধু, অজিত, সে ওদের বিপক্ষে সব সময় ভারতকে সমর্থন করে। আর এই একজনের মতের বৈপরীত্য ওদের খেলার আনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। যেদিন ভারত জেতে সেদিন অজিতের কথার মুখে টেকা কঠিন হয়ে যায়। আবার পাকিস্তান জিতলে ওরা এতটাই খেপায় বন্ধু অজিতকে, সেদিন ওর ঘর থেকে বেরোনোর অবস্থা থাকে না।

দেশ-বিদেশের খবরের জন্য দাদাজির এমন ব্যাকুলতা, খেলার দিন বিবিসি ওয়ার্ল্ড নিউজ পরিক্রমা শুরু হলে দোকান ফেলে তিনি ছুটে আসেন বাড়িতে। আদনান ও তার বন্ধুদের অনুরোধ করে ১৫ মিনিটের জন্য রেডিওটা চেয়ে নেন। তখন আদনানরা মহাবিরক্ত হয় সাংবাদ পাঠক এবং দাদাজির ওপর। আদনান খেয়াল করে দেখেছে, সংবাদের এই বিরতির মাঝখানেই ম্যাচের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে যায়। হয় ছক্কা অথবা আউট। অথচ রেডিওর এত কাছে থাকার পরও সেই ঘটনার সরাসরি সাক্ষী ওরা হতে পারে না। তবে দাদাজি ওদের ধৈর্যের পরীক্ষা দীর্ঘ করেন না। সংবাদ শেষ হতেই নাতিদের হাতে রেডিওটা ছেড়ে দিয়ে শোনা খবর আওড়াতে আওড়াতে তিনি ফিরে যান দোকানে। কোনো কোনো দিন যাওয়ার আগে তার কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে— রায়হানকে তো দেখছি না। ও নেই?

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বন্ধুরা সমস্বরে বলে, খেলাধুলার প্রতি রায়হানের কোনো আগ্রহ নেই। এবার তুমি যাও তো, দাদাজি। বিরক্ত কোরো না।

আদনান মাঝে মাঝে ভাবে, এমন খবরপাগল পিতার ঔরসেই তো বাবার মতো প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের জন্ম হবার কথা। কিন্তু আদনান ওর পূর্বপুরুষ থেকে কিসের উত্তরাধিকার বহন করছে? পড়াশোনায় ও বরাবরই ভালো। স্কুলজীবনের প্রথম দিন থেকেই ও শিক্ষকদের স্নেহ পেয়ে আসছে। কিন্তু পৃথিবীর কোনো বিশেষ ঘটনা তো ওকে তাড়িত করে না। এই উপত্যকা, উপত্যকার মানুষ, বরফের মুকুট পরা পর্বত, লিডারের মন উদাস করা ঢেউ, পাইনগাছের শাখায় সবুজের মুখরতা, আপেলবাগানের সৌরভ আর ক্রিকেটের বাইরে ওর জীবনে আর কোনো বৈভব নেই। তাহলে? বাবা প্রায়ই বলেন, সময়ই তোমার লক্ষ্য ঠিক করে দেবে; কিন্তু তোমার মস্তিষ্ক কোন পথে চালিত করবে, তা ঠিক করবার দায়িত্ব তোমার। আমি তোমাকে যুগসচেতন প্রাজ্ঞ মানুষ হিসেবে দেখতে চাই, কাল যার থেকে কখনো হতাশ হবে না।

প্রথম প্রথম বাবার এসব ভারী কথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারত না আদনান। ও কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকত বাবার পরিপাটি করা অভিজাত চেহারার দিকে আর অপেক্ষা করত বিকেলের জন্য, যে বিকেলে ওর বন্ধুরা খেলার জন্য পর্বতের পাদদেশে জড়ো হয়। কিন্তু নাইনে ওঠার পর ইংরেজিটা টুকটাক পড়তে পারার সুবাদে ও যখন স্টিভেনসন, ডিকেন্স, কিপলিং এবং ডেফোর বই পড়া শুরু করল, পড়তে লাগল 'ওথেলো', 'হ্যামলেট', 'দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস'; উর্দু লেখক প্রেমচাঁদ, মান্টো, গালিব, ইকবালে ও যখন আচ্ছন্ন হলো, ও উপলব্ধি করতে শুরু করল বাবার কথার মানে। সত্যিই, শুধু অর্থোপার্জন, বিয়ে, সন্তান উৎপাদন, পানাহার এবং মলত্যাগের জন্য মানুষের জন্ম নয়। এগুলোর পাশাপাশি অর্জনের ভিন্ন কোনো পালক যদি সে মুকুটে ধারণ করতে পারে, তবেই তার মানবজনম সার্থক।

রাতের আহার শেষে আদনান ও রায়হান বাবার মুখোমুখি গদি-আঁটা দুই আসনে বসে। বাবাকে আজ অন্য রকম লাগছে। তার দীপ্ত চোখের দ্যুতি যেন আজ নিষ্প্রভ। দৃঢ় চোয়াল খানিকটা ঝোলা। মুখের খোঁচা খোঁচা চাপদাড়ি শজারুর কাঁটার মতো খাড়া। কুঞ্চিত কপালে চিন্তার রেখা। তুচ্ছ কারণে দুই ভাইয়ের মারামারি নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু সেই সব ঘটনায় বাবার চোখের দ্যুতি কখনো নিষ্প্রভ হতে দেখেনি আদনান। বাবা কি খুব রেগে গেছেন? অথবা বিরক্ত?

এই, আমাদের চা দিয়ো তো। মায়ের উদ্দেশে উচ্চ কণ্ঠে বললেন বাবা। বদ্ধ ঘরের ওপাশে বাবার কণ্ঠ পৌঁছাল কি না কে জানে। আদনান কি একবার চায়ের কথা বলে আসবে মাকে?

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বহুকাল ধরে কাশ্মীরিদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। অত্যাচারীর বিষাক্ত তরবারি বারবার স্পর্শ করেছে আমাদের কণ্ঠনালি। এই সময়, যখন অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দরকার, তখন তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করছ। তোমাদের জন্য আফসোস! বাবার কণ্ঠ মাইকের আজানের মতো বেজে উঠল।

আদনানের ইচ্ছা করল সবকিছু খুলে বলতে— আব্বুজি, দরিদ্র দুটি মেয়ের হাতে আপেল দেওয়া কি অন্যায়? কিন্তু বাবার পাথুরে মুখের দিকে চেয়ে কথা বলার সাহস হলো না ওর।

আব্বুজি, এ বছর এখনো আপেল পাড়া হয়নি একটাও। তার আগেই আদনান কেন গাছে হাত লাগাবে। আমি ওর এই অন্যায় সহ্য করতে পারিনি। দাদাজি ওকে যেমন পাহারা দিতে বলেছেন, বলেছেন আমাকেও। আমার সামনে আপনার সম্পদ নষ্ট হোক, আমি চাইনি। অচেনা মেয়ে দুটোর সামনে ও আমাকে অপমান করেছে। আমি ওদের চলে যেতে বললে ও রুখে দাঁড়ায়। নয়তো ওকে মারতাম না। শেষের দিকে রায়হানের কণ্ঠ উঁচু গ্রামে উঠে যায়।

তোমাদের দাদাজি বাগান পাহারা দিতে বলেছেন, কিন্তু দরিদ্রকে সাহায্য করতে নিষেধ নিশ্চয় করেননি।

আজ একজনকে দিলে কাল আরো লোক আসবে। আমাদের ফলগুলো অন্যদের ঘরে চলে যাবে।

আল্লাহর ভাণ্ডারে তো কম নেই। তুমি মানুষকে যত দেবে, আল্লাহও তোমাকে তত বাড়িয়ে দেবেন। কোরআনের সেই আয়াতটা কি তুমি ভুলে গেছ, যেখানে আল্লাহ বলেছেন : যারা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে, সেই ব্যয় একটি শস্যদানার মতো। শস্যদানা থেকে সাতটি শিষ গজায় আর প্রত্যেক শিষে থাকে একশটি দানা। দরিদ্রকে তুমি একটি আপেল দিলে আল্লাহ তোমাকে দেবেন সাতশটি আপেল।

তার মানে অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় এখন আমিই দোষী সাব্যস্ত হলাম। সরি আব্বুজি। আমার ঘুম পাচ্ছে। বলেই উঠে দাঁড়াল রায়হান। ও যখন দরজার পাল্লায় শব্দ করে বেরিয়ে গেল, মা লবণ-চায়ের কেটলি হাতে প্রবেশ করলেন এ ঘরে। অবাক হয়ে বাবার উদ্দেশে বললেন, কী ব্যাপার, ওকে বকা দিয়েছ? অমন অন্ধকার মুখ করে বেরিয়ে গেল কেন ও?

আদনান বলল, আব্বুজি ওকে বোঝাতে গেছে, উল্টো আব্বুজির ওপর রাগ দেখিয়ে ও চলে গেল।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তুমি পারো শুধু রাগ করতে। কাছে বসিয়ে আদর করে দুদণ্ড গল্প তো করতে পারো না। মা কেটলি থেকে কাপে চা ঢালতে লাগলেন।

আব্বুজি, আপনি অত্যাচারীর তরবারির কথা বলছিলেন। কারা আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছে? কারা অত্যাচারী?

জানতে হলে অনেক পড়তে হবে তোমাকে। এ ঘরে তোমার তৃষ্ণা মেটানোর মতো অনেক বই আছে।

বই পড়া শুরু করেছি আমি। তবু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।

আমাদের এই উপত্যকা কোনো দিনই পরাধীনতা সহ্য করেনি, বুঝলে? বাবা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। দ্বিতীয় কাপ তুলে নিয়ে আদনান বাবার মুখের দিকে তাকাল। মা এসে বসলেন ওর পাশে। বাবা বলতে লাগলেন, আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে কলহান নামে একজন জ্ঞানী মানুষ জন্মেছিলেন এই কাশ্মীরে। তিনি 'রাজতরঙ্গিণী' নামে কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে একটি বই লিখেছেন। বইটি যদি তুমি পড়ো, জানতে পারবে যে সুপ্রাচীনকাল থেকে স্থানীয় কাশ্মীরিরাই এই উপত্যকা শাসন করত। মাঝেমধ্যে ভারতবর্ষের শক্তিমান শাসকেরা কাশ্মীরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করলেও যখনই তাদের শাসনের রশি ঢিলা হতো, অমনি এখানকার আজন্ম স্বাধীনচেতা মানুষগুলো বিদ্রোহ করে বসত। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এভাবেই এগিয়েছে কাশ্মীরের ইতিহাস।

তাই!

১৫৮৬ সালে সম্রাট আকবর কাশ্মীরকে মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ করেন। এই প্রথম বহিরাগতদের শাসনের সূত্রপাত হয় কাশ্মীরে। এরপর চারশ বছর ক্রমাগত বিদেশি শাসন চলেছে এই উপত্যকায়। কখনো মোগল, কখনো পাঠান, কখনো শিখ, কখনো ডোগরা— কিন্তু কখনোই কোনো কাশ্মীরি নয়।

আব্বুজি, তখন তো অনেক কষ্টের দিন ছিল, তাই না?

এখনো তো সুখে নেই তুমি। একটি স্বাধীন ভূখণ্ডে তোমার জন্মাবার কথা ছিল। অথচ গোলামির জিঞ্জির গলায় পরাধীন দেশে তোমাকে আসতে হলো। চোখ মেলবার আগেই লুট হয়ে গেল তোমার মাতৃভূমি। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে তোমাকে সর্বদা লাঞ্ছনার জোয়াল বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

পর্দা সরে গিয়ে হঠাৎ জানালার কাচের ওপাশে ঘন রাত্রি চকচক করে উঠল। সেদিকে চোখ পড়তেই কেমন গা ছমছম করে উঠল নাজনীনের। তিনি উঠে গিয়ে পর্দা টেনে দিলেন।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

নূরজাহান কি ঘুমিয়ে পড়েছে? জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

এখনো ঘুমায়নি। ডাকব ওকে?

বাবা কিছু বলার আগেই নূরজাহানকে ডাকতে উঠে গেল আদনান। নূরজাহান দুই বছরের ছোট বোন আদনানের। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। ছোট এই বোনটাকে আদনান বড্ড ভালোবাসে। অবশ্য ঠোকাঠুকিও কম লাগে না দুজনের। বিশেষত ছুটির দিনগুলোতে সাইকেল নিয়ে আদনান কোথাও বেরোতে গেলে ঝামেলা পাকাবেই নূরজাহান। দস্যি মেয়ের মতো সে-ও বাইরে যাওয়ার বায়না ধরবে। আদনান কিছুতেই বোঝাতে পারে না, ছেলেদের সব কাজে মেয়েদের থাকতে নেই। সেই দস্যি মেয়েটা খানিক পর আদনানের পিছু পিছু বাবার ঘরে ঢুকল। গায়ে হাঁটু ছাড়ানো লম্বা পিরহান। হাত দুটো ডোবানো পিরহানের পকেটে। ঢুলুঢুলু চোখ। ঈষৎ রেশমি চুল লুটানো মুখের ওপর। চেহারায় ঘুমের পেলবতা। নাজনীন এক কাপ চা ধরিয়ে দিলেন কন্যার হাতে। এবার ঘুম ওর চোখ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচবে। ইতিহাসের ক্লাসে বসেছে যখন, তখন ঘুমানো বারণ।

ঘুমিয়ে গিয়েছিলে? জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

না আব্বুজি। মাত্রই শুয়েছিলাম। তোমরা কী করছ না ঘুমিয়ে?

তোর আব্বুজি ইতিহাসের গল্প বলছে। তাই তোকে ডাকলাম। উৎসাহ নিয়ে বললেন নাজনীন।

নূরজাহান চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, বেশ তো। আমি শুনব। নূরজাহান বাবার পাশে গিয়ে খাটের ওপর বসল। পা ঢুকিয়ে দিল কম্বলের ভেতর। খাটের কোনায় জ্বলতে থাকা কাংড়ির দিকে একপলক তাকিয়ে ও শীত তাড়াবার চেষ্টা করল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমলে কাশ্মীরে অত্যাচারী ডোগরা শাসন কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো, সেই গল্প এখন বলব তোমাদের। বাবার চায়ের কাপ ততক্ষণে খালি। নাজনীন স্বামীর কাপে নতুন করে গোলাপি রঙের লবণ-চা ঢেলে দিলেন। বাবা বলতে লাগলেন, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাঞ্জাবে শিখ শক্তির উত্থান ঘটে রণজিৎ সিংয়ের নেতৃত্বে। এই রণজিৎ সিং ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। শিয়ালের মতো চতুর এবং সিংহের মতো সাহসী। ১৮১৯ সালের দিকে কাশ্মীরে পাঠানরা শাসন করত। রণজিৎ সিং পাঠানদের পরাজিত করে কাশ্মীর দখল করে নেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তখন রণজিৎ সিংয়ের চেয়েও মহাশক্তিধর ইংরেজদের শাসন চলছে। পাঞ্জাবের শাসন টিকিয়ে রাখার স্বার্থে, কৌশলগত কারণেই রণজিৎ সিং ইংরেজদের মনোরঞ্জন করতে থাকেন। তাই যত দিন রণজিৎ সিং বেঁচে ছিলেন, তত দিন পাঞ্জাব

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

এবং কাশ্মীর তার দখলে ছিল। কিন্তু ১৮৩৯ সালে যেই না তিনি মারা গেলেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শিখদের রাজত্ব দখল করবার পাঁয়তারা শুরু করল। শিখদের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ হলো দুইবার। শেষমেশ ১৮৪৬ সালে চূড়ান্ত যুদ্ধে পরাজিত হলো শিখরা।

আব্বুজি, তুমি কাশ্মীরের গল্প বলো। শিখদের গল্পে আমার কোনো আগ্রহ নেই। গল্পের মাঝপথে বাবাকে থামিয়ে দিল নূরজাহান। ও বড্ড তাড়াহুড়োপ্রবণ।

এই তো, এখনই কাশ্মীরে ঢুকছি। একটু ধৈর্য ধরো। তো, সন্ধিচুক্তি অনুসারে ব্রিটিশরা শিখদের কাছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ চাইল পঁচাত্তর লক্ষ রুপি। ওদিকে যুদ্ধ শিখদেরও দরিদ্র বানিয়ে ফেলেছে। এত অর্থ তারা কোথায় পাবে! রুপির বদলে তারা ইংরেজদের হাতে তুলে দিল পৃথিবীর বেহেশত কাশ্মীরকে।

সর্বনাশ! এক শাসকের কবল থেকে আরেক শাসকের কবলে! কাশ্মীর যেন দাদাজানের দোকানের সদাই। আদনান আফসোস করে উঠল।

সদাইয়ের দেখেছ কী! এখনই আরেক হাত বদল হবে। মাঝখানে বলে উঠলেন মা। সন্তানদের মতো তিনিও উত্তেজিত।

নূরজাহান বিস্মিত হয়ে বলল, তুমিও এগুলো জানো, আম্মুজি? কীভাবে জানো?

সবই সঙ্গদোষ, বুঝলি! নাজনীনের রক্তিম ঠোঁটে মুচকি হাসি। আড়চোখে তিনি তাকালেন স্বামীর দিকে। কিন্তু ফয়জুল্লাহকে তখন আচ্ছন্ন করে রেখেছে কাশ্মীরের বেদনাবিধুর ইতিহাস। স্ত্রীর রসিকতা তাকে স্পর্শ করল না। তিনি বলতে থাকলেন, শিখদের হাত থেকে কাশ্মীর চলে এল ব্রিটিশদের হাতে। কিন্তু এই দুর্গম উপজাতিপ্রধান উপত্যকা শাসনের ঝুঁকি চতুর ব্রিটিশরা নিতে চাইল না। তারা এক কোটি রুপির বিনিময়ে কাশ্মীরকে বিক্রি করে দিল জম্মুর ডোগরা রাজ গুলাব সিংয়ের কাছে এবং তাকে করদ রাজ্যের শাসকের স্বীকৃতি দিল। অর্থাৎ বার্ষিক কর দিয়ে ব্রিটিশদের মনোরঞ্জন করে তাকে চলতে হবে।

আবার বিক্রি! এত দিন জানতাম আপেল, নাশপাতি, গরু, ভেড়া বিক্রি হয়। এখন দেখছি দেশও বিক্রি হয়! বাবার কথা কেমন অবিশ্বাস্য লাগে আদনানের। এই উপত্যকার কঠিন পাথুরে মাটি উত্থান-পতনের কতই না বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী! ও জোরে শ্বাস নিয়ে বাতাসে বুক ভরতি করে। ইতিহাসের রোমাঞ্চকর এবং বিদ্‌ঘুটে চরিত্রগুলোর গন্ধ পায় নাকে। যেন ওই চরিত্রগুলোর অশরীরী আত্মা এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে কাশ্মীরের পাহাড়ে-পর্বতে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ইতিহাসের সামান্য এই আখ্যানটুকুই ওকে হতভম্ব করে দিয়েছে অথচ গল্পের তখনো অনেক বাকি, যা বলবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ফয়জুল্লাহ।

হিন্দু, মুসলমান, শিখ— যারাই শাসন করেছে কাশ্মীরকে, প্রত্যেকে নিপীড়ন চালিয়েছে কাশ্মীরিদের ওপর। তবে একশ বছরের ডোগরা শাসন কাশ্মীরিদের জীবনকে জাহান্নাম বানিয়ে ফেলেছিল। সাম্প্রদায়িক গুলাব সিং কাশ্মীরি কৃষকদের ওপর করের বোঝা এতটাই চাপিয়েছিলেন যে তার সম্বন্ধে বলা হতো, তিনি করের মাধ্যমে রক্ত চুষে নিচ্ছেন। তার এই অরাজকতার বিরুদ্ধে পুঞ্চ এলাকায় প্রতিবাদ হয়েছিল। গুলাব সিং প্রতিবাদীদের দমন করতে এমন বীভৎস পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, ইতিহাসে তার নজির মেলা ভার। বিক্ষোভকারীদের শরীর থেকে চামড়া আলাদা করে তাদের চামড়াবিহীন দেহ টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল রাস্তায়, অন্যদের শিক্ষার জন্য। গুলাব সিংয়ের পুত্র রণবীর সিং মুসলিম প্রজাদের নদীবক্ষে চুবিয়ে মারতেন, যেন ইংরেজ প্রতিনিধিরা তার রাজ্যের অনাহারী অপুষ্ট মানুষের প্রাচুর্য দেখে বিব্রত এবং নাখোশ না হয়। ১৯২০-এর দশকের গোড়ার দিকে শ্রীনগরের মানবসমাজের এক মর্মন্তুদ ছবি পাওয়া যায় জি এন কাউল নামের এক হিন্দু লেখকের রচনায়। তিনি লিখেছেন— গণিকাবৃত্তি, চৌর্যবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, রোগব্যাধি, নিরক্ষরতা এবং বেকারত্ব অন্ধকার রাতের মতো ছেয়ে গিয়েছিল উপত্যকাজুড়ে। মুসলিম প্রজারা অপরিসীম অনটনের মধ্যে কালাতিপাত করত। অন্তত ৯০ শতাংশ মুসলমানদের ঘরবাড়ি হিন্দু মহাজনদের হাতে বন্ধকি পড়েছিল।

জনৈক ব্রিটিশ সামরিক অফিসারের স্ত্রী মাদাম ব্রুস ১৯১১ সালে কাশ্মীরের ওপর একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখেন। সেই ভ্রমণকাহিনিতে বিশ শতকের প্রথম দিকের সমাজজীবনের একটি স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন : শ্রীনগরের প্রকৃত সৌন্দর্য তার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত। মন্দির এবং মসজিদের সহাবস্থান শ্রীনগরের আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু কাশ্মীরের শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সরকার শহরের মানুষদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বেশি যত্নবান। শহরবাসীর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের রসদ জোগায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কৃষক।

কাশ্মীরি লেখক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বাজাজ লিখেছেন : মুসলমান প্রজারা ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করত। ছিন্ন বস্ত্র এবং নগ্ন পায়ে মুসলিম চাষিদের দেখলে মনে হতো ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক। মুসলিম চাষিদের অধিকাংশই ছিল ভূমিহীন খেতমজুর। তারা জমিদারদের জমিতে ভূমিদাস

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

হিসেবে কাজ করত। আর খেয়ালি শাসকের বিলাসিতার জোগান দিতে হতো মোটা অঙ্কের কর পরিশোধের মাধ্যমে। সরকারের রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে তারা হিন্দু মহাজনদের ঋণের জালে আটকা পড়ত। শত জুলুম-নিপীড়ন, ঋণ আর করের বোঝা মাথায় নিয়েও তারা ডোগরার দুঃশাসনের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করেনি, কারণ, তখন তাদের ভেতর জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষই ঘটেনি। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-বিদ্রোহের জন্য যে নেতৃত্বের প্রয়োজন, সেটাও তাদের ভেতর ছিল না।

তিরিশের দশকে দুঃসময়ের অমানিশা কাটতে আরম্ভ করে। এ সময় নিরীহ কাশ্মীরি মুসলমানদের ভেতর জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে। ১৯২৭ সালে স্যার অ্যালবিয়ান ব্যানার্জি ডোগরা মহারাজা হরি সিংয়ের রাজনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ডোগরা অপশাসনে হতাশ হয়ে তিনি পদত্যাগ করেন এবং প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে হরি সিংয়ের দুঃশাসনের চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জম্মু কাশ্মীরের বিশালসংখ্যক মুসলমান জনতাকে নিরক্ষর করে রাখা হয়েছে। দারিদ্র্যপীড়িত এই মুসলমান প্রজারা অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলের মানুষ। এরা সরকার কর্তৃক গবাদিপশুর মতো শাসিত হয়।

অল্প কদিন পরই অ্যালবিয়ান ব্যানার্জির বিবৃতিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক বরাবর চিঠি লিখলেন অপরিচিত অথচ স্বাধীনচেতা এক কাশ্মীরি যুবক। এই যুবকের নাম শেখ আবদুল্লাহ। পরবর্তী সময়ে কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে উচ্চারিত হবে শেখ আবদুল্লাহ নামটি এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার কারণে কালক্রমে তিনি শেরে কাশ্মীর বা কাশ্মীরের সিংহ উপাধিতে ভূষিত হয়ে উঠবেন। যখন তিনি সংবাদপত্র বরাবর চিঠিটি লেখেন, তখন তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনা শেষ করে তিনি অত্যাচারী ডোগরা শাসনের বিরুদ্ধে কাশ্মীরি জনতাকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শেখ আবদুল্লাহর উদ্যোগে বিভিন্ন মসজিদ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সভাগুলোতে হরি সিংহের অপশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানানো হয়। তিনি জনতাকে বোঝাতে থাকেন— কাশ্মীরে বিদেশি শাসন বলবৎ রয়েছে। হরি সিং কাশ্মীরি নন। তিনি ইংরেজদের দয়ায় কাশ্মীর লাভ করে এর নাগরিকদের ওপর, বিশেষত মুসলমানদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছেন। অল্প দিনের ব্যবধানে কাশ্মীর উপত্যকায় তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন শেখ আবদুল্লাহ এবং তার

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

যেকোনো আহ্বানে জনতা স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিতে থাকে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে কাশ্মীরিদের ভেতর প্রথম জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল।

আল্লাহকে শুকরিয়া যে ঠিক ওই সময় তিনি শেখ আবদুল্লাহকে পাঠিয়েছিলেন। নূরজাহান উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ওর চোখ থেকে ততক্ষণে ঘুমের আবির পালিয়ে গেছে।

কাশ্মীরে তখন ডোগরাবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে, মহারাজা হরি সিংহ বাধ্য হলেন মুসলমান প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসতে। কাশ্মীরি মুসলমানরা মহারাজার কাছে তাদের ক্ষোভের কারণ পেশ করবার জন্য সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গঠন করল। এই সাত সদস্যের ভেতর ছিলেন শেখ আবদুল্লাহও। ১৯৩১ সালের ঘটনা সেটি। যখন সরকারের সাথে প্রতিনিধিদের আলোচনা সভা চলছিল, তখন আবদুল কাদির নামে এক সাহসী যুবক কাশ্মীরের একটি প্রতিবাদ সমাবেশে মহারাজার অপশাসনের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা রাখেন। হরি সিংয়ের সরকার তার বক্তৃতায় এতটাই বিব্রত এবং ক্ষিপ্ত হয়, রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে তাকে গ্রেপ্তার করে এবং তার বিচারের দিন ধার্য করা হয় ৬ জুলাই। আবদুল কাদিরের মুক্তির দাবিতে গণবিক্ষোভে ফেটে পড়ে কাশ্মীরি জনতা। জনগণের ক্ষোভের মুখে সন্ত্রস্ত জম্মু-কাশ্মীর সরকার আবদুল কাদিরকে শ্রীনগর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়। তার বিলম্বিত বিচারের দিন ধার্য করা হয় ১৩ জুলাই। জেল এবং বিচারের দিন বদল করেও ঠান্ডা করা যায় না উত্তপ্ত জনগণের ক্রোধকে। বিচারের দিন সমাগত হলে জনতার বিরাট মিছিল সরকারি বাহিনীর প্রতিরোধ উপেক্ষা করে শ্রীনগর জেলের ভেতর ঢোকার প্রচেষ্টা চালায়। আবদুল কাদিরকে ছিনিয়ে আনা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু হরি সিংয়ের পুলিশ বাহিনী সেই সুযোগ দেয় না জনতাকে। তারা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে গুলি চালায় বিক্ষুব্ধ মিছিলকারীদের ওপর। ঘটনাস্থলে বাইশ জন প্রতিবাদী কাশ্মীরি যুবক মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। ১৯৩১ সালে ১৩ জুলাই ২২টি প্রাণের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরিদের জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রথম ঝলকানি বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে। দিনটি আজও মনে রেখেছে কাশ্মীরিরা। এখনো দিনটিকে তারা গভীর শ্রদ্ধার সাথে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে থাকে।

১৩ জুলাইয়ের রাষ্ট্রীয় হত্যা কাশ্মীরিদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে স্তব্ধ করতে পারে না। নেতৃত্বের অভাবে এত দিন তারা মুখ বুজে মার খেয়ে এসেছে, কিন্তু একবার যখন তারা নীরবতার ভেতর নিজেদের কণ্ঠস্বর খুঁজে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পেল, তাদের আর মুক বানিয়ে রাখা গেল না। দলে দলে তারা সরকারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে শামিল হতে থাকল। অনেকে এই অভ্যুত্থানের ভেতর সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে পায়। শাসক যখন অত্যাচারী হিন্দু এবং আন্দোলনকারীরা অত্যাচারিত মুসলমান, তখন এই আন্দোলনের গায়ে সাম্প্রদায়িকতার তকমা লাগানো খুবই সহজ। কিন্তু এই অভিযোগ সঠিক নয়। কাশ্মীরিদের এই অভ্যুত্থান ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল অত্যাচারী পুলিশ, হিন্দু মহাজন ও জায়গিরদার; কখনোই সাধারণ কোনো হিন্দু নয়।

১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে 'নিখিল জম্মু-কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স' গঠিত হলে কাশ্মীরিদের বিক্ষিপ্ত আন্দোলন একটি সাংগঠনিক ছাউনির নিচে চলে এল। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নিযুক্ত হলেন শেখ আবদুল্লাহ। সভাপতির ভাষণে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, কাশ্মীর আন্দোলন কখনোই কোনো সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নয়। মুসলিম, হিন্দু, শিখ সকল ধর্মের মানুষের ক্ষোভ ও হতাশা দূর করে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করাই এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। তার এই বক্তব্য যে শুধুই মুখের কথা নয়, মনের কথা; তার নমুনা পাওয়া গেল সাত বছর পরই। ১৯৩৯ সালের ২৭ এপ্রিল মুসলিম কনফারেন্সের কার্যকরী কমিটি নামসংক্রান্ত নতুন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সেদিন থেকে জম্মু-কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্সের নাম হয় জম্মু-কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স। ১৯৪০ সাল নাগাদ ন্যাশনাল কনফারেন্সে যোগদান করে হিন্দু ও শিখদের অনেক সংখ্যালঘু সদস্য। শেখ আবদুল্লাহ তার আত্মজীবনী 'আতিশ-ই-চিনারে' স্বীকার করেছেন, সংগঠন থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেওয়ার পেছনে তার ওপর জওহরলাল নেহরু এবং আল্লামা ইকবালের প্রভাব কাজ করেছে। যদিও মুসলিম শব্দ কেটে দেওয়াকে অনেক রক্ষণশীল পরিবার ভালো চোখে দেখেনি। শেখ আবদুল্লহর ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে না পেরে মিরওয়াইজ ইউসুফ শাহ তার ঘনিষ্ঠদের নিয়ে সংগঠন থেকে বেরিয়ে যান এবং আজাদ মুসলিম কনফারেন্স নামে নতুন সংগঠনের সূচনা করেন। শেখ আবদুল্লাহ ও ইউসুফ শাহের বিরোধটা ছিল সাম্প্রদায়িক বনাম অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ।

১৯৪৪ সালে ন্যাশনাল কনফারেন্স কাশ্মীরের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসংক্রান্ত একটি দাবিনামা হরি সিং সরকারের কাছে পেশ করে। এই দাবিনামার ওপর ভিত্তি করে 'নয়া কাশ্মীর' নামে একটি ইশতেহারও প্রকাশ করা হয়। কাশ্মীরিদের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসে নয়া কাশ্মীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

১৯৪৫ সালে অত্যাচারী ডোগরা শাসনের বিরুদ্ধে নব-উদ্যমে আন্দোলন শুরু করে কাশ্মীরিরা। গণ-অভ্যুত্থানের তীব্রতার মুখে মহারাজা হরি সিং রামচন্দ্র কাককে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে আন্দোলন দমানোর যাবতীয় দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত করতে বাধ্য হন। পরের বছর ন্যাশনাল কনফারেন্স ডোগরা শাসনের অপসারণের দাবিতে 'কাশ্মীর ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেয়। ১৯৪২ সালের ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী ভারতীয় জনগণের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন দ্বারা যে শেখ আবদুল্লাহ প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে কথা স্পষ্ট করে না বললেও চলে। সে সময় শেখ আবদুল্লাহ একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, যে মুহূর্তে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামীরা ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন, সে মুহূর্তে কাশ্মীরিরা অবশ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল মহারাজার শাসনের অবসানের দাবিও যুক্তিসংগতভাবে তুলতে পারেন। কাশ্মীরের সার্বভৌমত্ব তার প্রকৃত অধিকারী কাশ্মীরিদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে।

কাশ্মীর ছাড়ো আন্দোলনের তীব্রতা হরি সিং সরকারকে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত করেছিল। আন্দোলন দমাতে প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক সামরিক শাসন জারি করলেন। কাশ্মীরি জনতার স্বাধীনতার স্পৃহা দমন করতে সব ধরনের নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করল সামরিক বাহিনী। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত হলো অনেক মানুষ। অনেকে হলো আহত। গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করা হলো। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে গ্রেপ্তার করা হলো শেখ আবদুল্লাহকে। তাকে তিন বছরের জন্য কারারুদ্ধ করা হলো।

আব্বুজি, আপনি ডোগরা সরকারের জুলুমের কথা বলছেন। কিন্তু এখন তো আমরা ভারতীয় সরকারের জুলুমের শিকার। ভারত কীভাবে আমাদের ওপর কর্তৃত্ব শুরু করল? কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আদনান।

সেটা তো আরেক মর্মান্তিক ইতিহাস। সেই ইতিহাসে ঢুকব বলেই ভূমিকা হিসেবে ডোগরা মহারাজার অপশাসন এবং স্বাধিকার আন্দোলনে ন্যাশনাল কনফারেন্স ও শেখ আবদুল্লাহর অবদানের কথা উল্লেখ করলাম। আমাদের স্বাধীনতার সূর্য ডোগরাদের হাত থেকে কীভাবে ভারতীয়দের হাতে চলে গেল, আজ সেই ইতিহাস বলতে গেলে অনেক রাত হয়ে যাবে। তাই আজ এ পর্যন্তই থাকুক। অন্যদিন তোমাদের কৌতূহল নিবারণ করব, কেমন? এখন ঘুমাতে যাও। আর হ্যাঁ, রায়হানের সাথে তুমি আর লাগতে যেয়ো না। জানোই তো, ও একটু অন্য রকম।

পর্বতের মতো ভারী, দুপুরের মতো বিষণ্ন বেদনার বোঝা নিয়ে সেই রাতে ঘুমাতে গেল আদনান ও নূরজাহান।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পরদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হলো আদনানের। স্কুল ছুটি হলে তারিক-অজিতের সাথে ও সোজা চলে গেল আপেলবাগানে। ব্যাগভরতি আপেল পেড়ে শিশনাগ খাল পার হয়ে বিকেলের আগে আগে আতিকাদের খোঁজে ওরা পৌঁছে গেল পাশের গাঁ বাতেকানে। পাশাপাশি গ্রাম হলেও শিশনাগের বিয়োগরেখার কারণে বাতেকানে কখনো যাওয়া হয়নি ওদের। গুরিহাকা থেকে আলাদা কিছু নয় বাতেকান, তবু গ্রামটিতে পা রেখে মনে হলো, প্রকৃতির বৈচিত্র্য দেখতে মাঝেমধ্যে এদিক-সেদিক বেরিয়ে পড়লে মন্দ হয় না। একটি টিলার ওপর একাকী দাঁড়িয়ে ছিল একটি ফারগাছ। টিলার সবুজ চত্বরে মুখ লাগিয়ে ঘাস খাচ্ছিল দুটো গরু। যে পর্বতের পাদদেশে আদনানরা ক্রিকেট খেলে, বাতেকানের খালপাড় থেকে সেই পর্বত দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। ঝকঝকে নীল আকাশকে মনে হচ্ছিল একটি চাদর, যা একমুহূর্তে পর্বতের চূড়ার ওপর নেমে আসবে। আকাশের ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল ভারতবর্ষের মানচিত্রের মতো এক টুকরো সাদা মেঘ, কল্পনা করলে যার ভেতর বাবা-মায়ের মুখও আবিষ্কার করা যায়। আদনানরা ওদের বয়সী কোনো ছেলেকে খুঁজছিল, যার কাছে আতিকাদের কথা জিজ্ঞেস করা যায়। কিন্তু আশপাশে কোনো মানুষ তো নেই-ই, বাড়িঘরও নেই। ওরা বুঝল, এটা গ্রামের শেষ প্রান্ত, লোকালয় আরো ভেতরে।

গরু দুটোর গালে আদর দিয়ে, ধানখেতের আল মাড়িয়ে, পপলারগাছের ছায়া ডিঙিয়ে ওরা পৌঁছে গেল সেখানে, যেখান থেকে লোকালয়ের শুরু। সামনের বাড়িটির ছাদের ওপর দৃষ্টি গড়িয়ে দিলে ওপাশে মসজিদের মিনার দেখা যাচ্ছিল। মিনারটি হয়তো ওদের চোখ এড়িয়ে যেত, কিন্তু আসরের মধুর আজানধ্বনি ওদের মিনারের দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য করল। অজিত বলল, তোরা নামাজ পড়বি না?

পড়ব পড়ব। আপেলের ব্যাগ অজিতের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওরা নামাজ পড়ার সিদ্ধান্ত নিল। ঠিক তখন ওদের চোখ পড়ল ধানখেতের পাশে একটুকরো সবুজ মাঠে, যেখানে ওদের বয়সী কয়েকটি ছেলে ক্রিকেট খেলছে। খেলার প্রতি এমন তীব্র-তুমুল আকর্ষণ ওদের, ওরা দৌড়ে গেল দর্শকসারিতে এবং খেলা দেখায় এমনভাবে বিভোর হলো, একটু পর নামাজ দূরে থাক, বাতেকানে আসার উদ্দেশ্যই ভুলে গেল। আধা ঘণ্টা পর যখন একটি শবযাত্রীর দল লাশের খাটিয়া নিয়ে উচ্চ স্বরে কালেমা পড়তে পড়তে খেলার মাঠ অতিক্রম করল, তখন ঘোর ভাঙল ওদের। ক্রিকেট যতই আকর্ষণীয় হোক, তা নৈমিত্তিকতার উর্ধ্বে নয়। কিন্তু একটা মানুষের ইহলোক ত্যাগ, সে তো বড়ই চাঞ্চল্যকর এবং বেদনাদায়ক ঘটনা। একজন মানুষের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

মৃত্যুর সাথে জড়িয়ে থাকে জীবিত পৃথিবীর অনেকগুলো আয়োজন। মৃত্যু মানেই দুঃখী দুঃখী চেহারার দূরবর্তী স্বজনদের পুনর্মিলন, কাছের মানুষের আছাড়ি-বিছাড়ি কান্না, কবর খনন, চিরবিদায় স্টোরের মালিকের গোপন আনন্দ, হুজুরের ব্যস্ততা, মুসল্লিদের সাজ সাজ রবে জানাজায় উপস্থিত, দাফনের পর মোনাজাতে ফোঁপানোর শব্দ, শিন্নি বিতরণ ইত্যাদি। একমাত্র মৃত্যুই পারে উক্ত আয়োজনের প্রতিটি চরিত্রকে নিপুণভাবে মঞ্চে হাজির করতে। মৃত্যুমঞ্চের চরিত্রদের দেখতে বড় ভালো লাগে আদনানের। যখনই ও কারো মৃত্যুসংবাদ শোনে, ছুটে যায় মৃতবাড়িতে। লাশ দেখে। লাশকে ঘিরে স্বজনদের কান্না দেখে। ভিড়ের মানুষ দেখে। তারপর ছুটে যায় গোরস্তানে। কবর খনন দেখে। গোরখোদকের পেশির ওঠানামা দেখে। কবরের মাটির বিষণ্নতা দেখে। সারাটা দিন মৃত্যুসংশ্লিষ্ট প্রতিটি চরিত্রকে ও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। মৃত্যুর প্রতিটি উপকরণে এত আগ্রহ কেন আদনানের, সে নিজেও জানে না।

আজ শবযাত্রীদের নিমগ্ন কালেমাধ্বনি চমকিত করে আদনানকে। ঘাড় ঘোরাতেই টুপি পরিহিত ওই সব মুখের ওপর আটকে যায় ওর চোখ, মৃত্যুচিন্তার ভীতিকর আবহে সংবেদহীন যাদের চেহারা। ক্রীড়ারত কিশোরেরা মৃতের সম্মানে কতক্ষণ স্থগিত রাখে খেলা আর এই ফাঁকে আদনানরা জুটে যায় শবযাত্রার লেজে। ওরাও দুঃখী দুঃখী মুখ করে নিঃশব্দে চলতে থাকে খাটিয়ার পেছন পেছন। ওদের উদ্দেশ্য— শবযাত্রীদের কারো কাছ থেকে আতিকাদের ঠিকানা জেনে নেওয়া। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ পেরিয়ে ঈদগাহ মাঠে গিয়ে শেষ হয় শবযাত্রার মিছিল। গুরিহাকার মতোই ইটের বুননে তৈরি মেহরাব, দুই ঈদে এখানে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই ইমাম সাহেব খুতবা দেন। একটি দেবদারুগাছ ছাতার মতো ছায়া দিয়ে আছে মেহরাবের মাথায়। ছাতার মাথার ওপর উড়ছে এক জোড়া উদাসীন চিল। ততক্ষণে আদনানরা জেনে গেছে, ঈদগাহ মাঠে জানাজা পড়ে পাশের গোরস্তানে দাফন করা হবে লাশ। জানাজার কাতারে দাঁড়াতে অজিত ইতস্তত করলে আদনান ফিসফিস করে— আরে, দাঁড়িয়ে পড়। শুধু অভিনয় করবি।

জানাজায় ইমাম সাহেবের পাশাপাশি একজন শীর্ণ প্রৌঢ়, যার সমগ্র শরীরে দারিদ্র্যের ছোবল, সম্মিলিত মুসল্লিদের উদ্দেশে কথা বলেন। তিনি তার সদ্য পরলোকগত মায়ের জন্য দোয়া চান সবার কাছে। এই এতক্ষণে আদনানরা জানতে পারে, মৃত ব্যক্তি একজন নারী এবং তিনি এই প্রৌঢ়ের মা। সহসা আতিকার দাদির কথা মনে পড়ে আদনানের। আতিকার দাদিজান মারা গেল না তো! ঈদগাহ মাঠের শেষ প্রান্তে একটি কাঠবাদামগাছের নিচে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বেশ কয়েকজন নারীর ভেতর আলেয়া ও আতিকাকে দেখে বুকের ভেতর ধড়াস করে ওঠে আদনানের। একবার মনে হয়, ছুটে গিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করে, যিনি মারা গেছেন, তিনি কি তোমাদের দাদিজান, কিন্তু প্রবল হয়ে ওঠা কৈশোরিক আড়ষ্টতায় নারীসমাগমের উদ্দেশে ওর পা ওঠে না। এ সময় এক পিচ্চিকে পাওয়া যায়, মাথার মাপের চেয়ে বড় টুপি পরে সে জানাজায় এসেছে, তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আতিকাকে চেনো?

আতিকা আমার বেহেনজি। সকালে আমার দাদিজান মারা গেছে।

এটাই তোমার দাদিজান? খাটিয়ার দিকে ইঙ্গিত করে আদনান।

হ্যাঁ। ইতিবাচক জবাব দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে বালক। বোঝাই যায়, এই ছোট্ট জীবনে সে দাদিজানের অনেক আদর খেয়েছে।

মনটা বিষণ্ন হয়ে যায় আদনানের। একজন বৃদ্ধ নারী, মৃত্যুর পূর্বে যিনি আপেল খেতে চেয়েছিলেন, আদনানের ব্যর্থতায় তার শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়নি। নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হয় আদনানের। ও বন্ধুদের জানায়— যার জন্য ওদের আপেল নিয়ে আসা, তিনি আর ইহলোকে নেই। বন্ধুদের চেহারায়ও নীল বেদনার ছায়া পড়ে। অজিত আফসোস করে— আমরা যদি কালই আসতাম!

সব দোষ রায়হানের। আদনান চিৎকার করে ওঠে।

এই, জানাজায় এসে এত কিসের গল্প তোমাদের! এক মুরব্বি খেঁকিয়ে ওঠেন। ধমক খেয়ে ওরা চুপসে যায়। জানাজা শেষে দাফন হয় লাশ। বিগলিত কান্নাময় মোনাজাতের ভেতর দিয়ে সমাপ্ত হয় মৃতের প্রতি জীবিতদের দায়িত্ব। কিন্তু আদনানদের দায়িত্ব তখনো শেষ হয়নি। ওরা একটু দূরে একটি মৃত গাছের গুঁড়ির ওপর বসে নির্জনতার অপেক্ষায় থাকে। ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসে ভিড়। কয়েকজন স্বজন চল্লিশ কদম পেরিয়ে গেলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যখন কবরে ফেরেশতা চলে আসে, তখনো আতিকার বাবা অথবা চাচা, যিনি সবার কাছে দোয়া চেয়েছিলেন, তিনিসহ আরো কয়েকজন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং অনেকক্ষণ। নীল আকাশে হঠাৎ মেঘ ঘনিয়ে এলে সদ্য দাফনকৃত মানুষটাকে আল্লাহর জিম্মায় রেখে অবশিষ্টরা বাড়ির পথ ধরেন। তারিক বলে, মেঘ করছে। বৃষ্টি নামবে। বাড়ি যেতে হবে না?

আদনান গম্ভীর কণ্ঠে বলে, যাব। তবে একটু কাজ বাকি আছে।

গোরস্তান যখন পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে যায় এবং দূরেও কোনো মানুষের ছায়া দেখা যায় না, তখন ওরা তিন বন্ধু কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আদনান বিভিন্ন গোরস্তানে, বিশেষত দরগায়, মৃতদের জন্য কবরের ওপর জীবিতদের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

খাবার ছড়াতে দেখেছে। জীবিতদের উপহার দেওয়া খাবার মৃতরা খেতে পারে কি না জানে না আদনান। তবে এ মাটির ধর্মীয় ও লোকজ সংস্কৃতি এবং চাপা অপরাধবোধ এই মুহূর্তে ওকে আপেল ছড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। ও বড় মমতা নিয়ে আতিকার দাদিজানের শিথানের কাছে রেখে দেয় আপেলের ব্যাগটা। ফিসফিস করে বলে, জীবিতকালে খেতে পারলেন না, এখন তো অনন্ত অবসর, সুযোগ করে খেয়ে নিয়েন। বলতে বলতে ওর চোখ ভিজে আসে। নিজের দাদিজানকে কাছে পায়নি আদনান। ওর জন্মের পূর্বেই তিনি ত্যাগ করেছেন ইহধামের মায়া। আতিকার দাদির মাথার পাশে বসে ওর নিজের দাদির কথা স্মরণ হয়। তখন কান্নার বেগ আরো বেড়ে যায়। ওর চোখের জল আড়াল করবার জন্যই কি না কে জানে, বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা বাতেকানের মাটির ওপর সুরের অপূর্ব মূর্ছনা তৈরি করে। ভেজা মাটির অদ্ভুত সোঁদা গন্ধে ভরে ওঠে চারপাশ। বৃষ্টিতে অবগাহন করতে করতে ঘরে ফেরে ওরা তিন বন্ধু।

চার

পর্বতের সামনে পুকুরের মতো একটুকরো গর্ত। সামনে সবুজের কার্পেটে মোড়া বেশ কয়েকটি টিলা। বসন্তে টিলাগুলো যখন সবুজে চকচক করে, রাখালেরা ভেড়ার পাল নিয়ে আসে চরাতে। সবুজের ফাঁকে ফাঁকে জেগে থাকে প্রাকৃতিক আসনের মতো পাথরখণ্ড। দূর থেকে দেখলে মনে হয় পাথরগুলোও বুঝিবা ভেড়া। সবুজে মুখর আকাশছোঁয়া পর্বত সামনে নিয়ে পাথরের ওপর বসে ভেড়া পাহারা দেয় রাখাল বালকেরা। সাগরের বিশাল ঢেউয়ের মতো টিলার একেকটি ভাঁজ। কখনো কখনো ভেড়ার আস্ত একটি পাল ওই ভাঁজের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন মনিবের ভেড়ার দুশ্চিন্তায় সচকিত হয়ে ওঠে রাখালের দল। আসন বদল করে তখন তারা ভেড়ার কাছাকাছি কোনো পাথরের ওপর গিয়ে বসে।

সবুজ টিলাগুলোর প্রান্ত বিনীত হতে হতে গিয়ে মিশেছে পুকুরের মতো সেই অবনত ভূমির সাথে, যার উল্টো পাশে বিশাল পর্বতের উদ্ধত দেয়াল। সারা বছর পানিশূন্য থাকলেও গত কয়েক দিনের বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে অবনত ভূমিটি তরুণীর সজল চোখের মতো জলাশয়ের রূপ ধারণ করেছে। সেই জলাশয়ের পাশে দাঁড়ালে সবুজ পর্বতের প্রতিবিম্বে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

সেদিন বৃষ্টিহীন বিকেলে টিলার খাঁজে ক্রিকেট খেলতে এসে আদনানরা দেখে, জানুয়ারির শীতে জলাশয়ের পানি জমাট বেঁধে বরফ। একটু ঝুঁকলে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বরফ নামের সেই আয়নায় মুখ দেখা যাবে অবস্থা। খুশিতে ওদের মুখ ডগমগ করে ওঠে। ওরা হইহুল্লোড় করতে করতে ছুটে যায় বরফের ওপর। ওদের প্রত্যেকের পায়ে রেশমি লাইনিং করা রবারের সোলযুক্ত জুতো। পরনে মোটা কাপড়ের ট্রাউজার। গায়ে হাঁটুছোঁয়া পিরহান। পশমি টুপিতে মুখ-মাথা এমনভাবে ঢাকা, হঠাৎ দেখায় ওদের মায়েরাও হয়তো চিনতে পারবে না। এই দলটির একটিমাত্র ব্যাট। ব্যাটের মালিক আদনান। বাবা পেহেলগাম শহর থেকে কিনে এনে দিয়েছেন ওকে। ব্যাটের মালিকানার সুবাদে পাড়ার ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন বনে গেছে সে। ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, ও যা বলে, বেশির ভাগ সময় বন্ধুরা তা পালন করে। আজ ও চিন্তিত মুখে বরফের গায়ে ব্যাট ঠোকে আর ভাবে, জমাট বাঁধা এই বরফে স্ট্যাম্প কীভাবে পুঁতবে! তখন হঠাৎ পাথরের চাঁইয়ের কথা মনে পড়ে ওর। ও ব্যাট কাঁধের ওপর তুলে চিৎকার করে আদেশ করে— এই বেলাল, এই তারিক, এই অজিত, পাথরের একটা চাঙড় আন তো!

বন্ধুরা ধরাধরি করে পাথরের একটি চাঙড় বয়ে আনলে সেটিকে খাড়া করে বসিয়ে স্ট্যাম্প বানিয়ে ফেলে আদনান। অজিত মুগ্ধ চোখে বলে, তোর মাথায় এত বুদ্ধি! এটা দারুণ স্ট্যাম্প! পোঁতাপুঁতির ঝামেলা নেই।

দল ভাগ হয়। আনন্দ এবং উত্তেজনা নিয়ে খেলা গড়ায় মাঠে। পর্বতের সবুজ ফুঁড়ে যখন বেরিয়ে আসে একেকজন বোলার, ব্যাটসম্যানের টার্গেট থাকে সজোরে ব্যাট হাঁকিয়ে বলটাকে পর্বতের সেই জায়গায় উড়িয়ে দিতে, যেখানে কান্নার দাগের মতো ঢল নামার দাগ লেগে আছে। কিন্তু কোনো ব্যাটসম্যানই তাদের লক্ষ্য পূরণে সফল হয় না। মহল্লার কয়েকটি বাচ্চা ছেলে বুঝে অথবা না বুঝে দর্শকসারিতে দাঁড়িয়ে হাততালি দেয় আর জবুথবু হয়ে কাঁপে। কয়েকটা চিল মাথার ওপর বিষণ্ন ডানায় চক্কর কাটে। বসন্তে যে উইলোগাছটি ভেড়ার পালের সাথে হেসে হেসে গল্প করে, এখন, এই শীতে তুষারঢাকা শূন্য চত্বরে একাকী গাছটি আরো একটি সন্ধ্যাযাপনের প্রস্তুতি নেয়। তখনো সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার ঢের বাকি, খেলার মাঝখানে অজিতের সাথে ঠোকাঠুকি লেগে যায় হোরাইরার। অজিত দ্রুতগামী বোলার। অজিতের ওভারের একটি বল হোরাইরার থুতনিতে আঘাত করলে মেজাজ হারায় হোরাইরা। ক্ষিপ্ত হয়ে ও ছুটে আসে অজিতের দিকে আর হিন্দু বলে গালি দেয়। টেনিস বল কতটুকুই-বা আহত করতে পারে হোরাইরাকে, তার চেয়ে দ্বিগুণ আহত হয় অজিত, হোরাইরার সাম্প্রদায়িক গালিতে। কতক্ষণ ও হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে হোরাইরার দিকে, তারপর নতমস্তকে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করে। এই উপত্যকায় সংখ্যাগুরু মুসলমানের পাশে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ওরা সংখ্যালঘু হয়ে জন্ম নিয়েছে। ওরা হিন্দু পণ্ডিত। এই অন্যায্য পাপের কারণে যদি খেলতে এসে গালি খেতে হয়, তবে সেই খেলার প্রয়োজনই নেই। ও মাঠ ত্যাগ করতে চাইলে আদনানসহ ছুটে আসে কয়েকজন। ওরা অজিতকে বোঝায়, হোরাইরা কাজটি মোটেও ঠিক করেনি। রাগের মাথায় বলে ফেলেছে। এর আগে তো কখনো এমন হয়নি।

হয়নি, এখন থেকে হবে। অজিতের গলার স্বরে অভিমান থমথম করে।

আর হবে না। আমি দায়িত্ব নিলাম। আদনান ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে।

হোরাইরাও ততক্ষণে সামলে নিয়েছে ব্যথা। ও নরম গলায় বলে, যাস না, অজিত। আমি দুঃখিত।

সকলের অনুরোধে অজিত খেলায় ফেরে বটে, কিন্তু সেদিন আর বল করে না ও। শুরুতে খেলার যে উচ্ছ্বাস ছিল, সেই উচ্ছ্বাসের সুর কেটে যায়। আদনান তবু সবাইকে ছন্দে ফেরাতে চেষ্টা করে। খেলা যখন প্রথম ইনিংসের শেষ ওভারে গিয়ে দাঁড়ায়, বল হাতে উইকেটের কাছে আসে আদনান। ঝগড়া-বিবাদে আজ অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে। সময়স্বল্পতায় পেস অ্যাটাক রেখে ও স্পিন বল করে। ধীরে ধীরে কাশ্মীরের অপূর্ব মায়াবী সন্ধ্যা নামে ওদের ক্রিকেট মাঠে। কনকনে শীত জাঁকিয়ে বসে উপত্যকার গায়ে। এমন সময় টিলার ঢালে চিনারগাছের নিচে দুজন পথচারীর ছবি ভেসে ওঠে। শীতের পোশাকের প্রাবল্যে তাদের চেহারা দেখা না গেলেও এইটুকু অন্তত আন্দাজ করা যায়, তাদের একজন প্রৌঢ় এবং অপরজন কিশোরী। প্রৌঢ়ের পিঠে ঝুলছে ভারী ব্যাগের মতো পোঁটলা। ইতস্তত পায়ে আসছে তারা এদিকেই। খেলা রেখে বন্ধুদের কয়েকজনকে সেদিকে মনোযোগী হতে দেখে রেগে যায় আদনান। ঢিলেমি করলে আজ ওর টিম পুরো ওভার ব্যাট করতে পারবে না। ফিল্ডিং খেটে সময়ের অভাবে ব্যাট করতে না পারার মতো বেদনা আর কিছুতে নেই, অন্তত আদনানের কাছে। ও চিৎকার করে সবাইকে খেলায় মনোযোগ দিতে বলে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে এমন এক পরিস্থিতি রচিত হয় এই সন্ধ্যায়, খোদ আদনানকেই মাঠ ছেড়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াতে হয়। ও যখন ওভারের দ্বিতীয় বলটা করতে যাবে, তখন টিলার ঢেউয়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শফিক, আদনানদের রাখাল। হন্তদন্ত হয়ে আদনানের কাছে এসে জানায়— ভাইয়াজি, দুজন মেহমান এসেছে বারমুলা জেলা থেকে। তোমাদের বাড়ি যেতে চায়, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আমি ওদের কাছে তোমার কথা বলেছি। তুমি এখানে খেলছ, তা-ও বলেছি। ওই তো ওরা আসছে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

শফিকের কথার পরিপ্রেক্ষিতে আদনানের ভ্রু ভেঙে যায়। বারমুলা থেকে এই শীতের সন্ধ্যায় কে আসতে পারে, হুট করে মনেও পড়ে না ওর। ও দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয় টিলার ঢালু প্রান্তে, শীতের পাতাঝরা গাছের মতো বিষণ্ন ভঙ্গিতে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে দুজন আগন্তুক, যারা কিনা ওদের বাড়ির পথ খুঁজছে। অজান্তে আদনানের হাত থেকে পড়ে যায় ক্রিকেট বল। অচেনা মেহমান গন্তব্য হারিয়ে পথের মাঝে ঘুরপাক খাবে আর আদনান কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো খেলা চালিয়ে যাবে, এই কুশিক্ষা কাশ্মীর উপত্যকা ওকে দেয়নি। 'তোরা খেল, আজ আমার খেলা হচ্ছে না রে' বলে শফিকের সাথে ও হাঁটা ধরে আগন্তুকদ্বয়ের উদ্দেশে। শীতের ধোঁয়া ধোঁয়া সন্ধ্যায় সালাম বিনিময়ের পর ও মেহমানদের উদ্দেশে বলে, আপনারা নাকি আমাদের বাড়িতে যাবেন? তা কোথা থেকে এসেছেন? আপনাদের ঠিক চিনতে পারছি না।

প্রৌঢ় লোকটি সূর্য ডোবার মতো ধীরে কিশোরীর দিকে তাকালে কিশোরীটি নাকের ওপর থেকে নেকাব নামিয়ে ভাইয়াজি বলে কেঁদে ওঠে। আর আদনান তখন অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করে মারিয়ামকে। যে মারিয়াম ওর খালাতো বোন, যে খালার বিয়ে হয়েছে বারমুলা জেলায় এবং বহুদিন হয় ওরা বারমুলা যায়নি। এবং মারিয়ামও কি নিকট অতীতে এসেছে ওর বড় খালার বাড়ি পেহেলগামের গুরিহাকায়? আদনান মনে মনে হিসাব কষে— খালা-খালুর সাথে মারিয়াম শেষবার যখন এসেছিল এই পেহেলগামে, তারপর চলে গেছে চারটি শীত। আদনান তখন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র আর মারিয়াম প্রাইমারিতে ক্লাস থ্রিতে পড়ে। সেই শিশু মারিয়াম আজ নূরজাহানের মতো টানা চোখের কিশোরী হয়ে উঠেছে বটে; কিন্তু এর মধ্যে কী এমন ঘটল যে খালা-খালুকে রেখে অচেনা মানুষের সঙ্গে তাকে বেড়াতে আসতে হবে বড় খালার বাড়ি এবং খালাতো ভাইকে দেখে কেঁদে ফেলতে হবে চিৎকার করে? অনেকগুলো প্রশ্ন বুকের মধ্যে বাজপাখির ডানা ঝাপটালেও আদনান সেসবে পাত্তা দেয় না; কারণ, ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। এক্ষুনি মসজিদের মাইকে মাগরিবের আজান হবে। দাদাজি দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে হাজির হবেন জামাতে। আদনানকে মসজিদে না পেলে তিনি গোস্‌সা করবেন। পথের মাঝে জেরা না করে মেহমান নিয়ে তাই বাড়ির পথ ধরল আদনান। প্রৌঢ়ের পোঁটলাটা মাথায় তুলে নিল শফিক। বাড়ি গেলেই খোলাসা হবে সব।

আদনান ভেবেছিল, মেহমানকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই ও জামাতে হাজির হবে; কিন্তু উঠোনে পা রাখতেই এমন অপ্রত্যাশিত এক শোকের ছায়া নেমে এল বাড়িজুড়ে, আদনানের আর মসজিদে যাওয়া হলো না। খালার বুকের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মারিয়াম যা বলল, তার সারমর্ম এই : তিন দিন আগে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন মারিয়ামের বাবা-মা। মারিয়াম এমন এক অভাগা মেয়ে, বারমুলায় বাবা-মা ছাড়া ওর আপন কেউ নেই। বাবা ছিলেন একা এক ভাই। নয়তো চাচা-চাচির কাছে ও থাকতে পারত। নিয়তি সেই সুযোগটাও দেয়নি ওকে। আর তাই এই দুর্দিনে প্রতিবেশীদের পরামর্শে অনুমতির তোয়াক্কা না করেই ও আজীবন বসবাস করতে খালার কাছে চলে এসেছে।

শেষের কথাটা এমনভাবে ধাক্কা মারল নাজনীনের বুকে, তিনি মারিয়ামের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ওরে, তুই তো আমার আরেকটা বেটি রে! আমার কাছে আসতে তোর অনুমতি লাগবে নাকি! তোকে আজীবন আমি বুকের ভেতর আগলে রাখব। কে আমার আসল বেটি— নূরজাহান, নাকি তুই— কেউ বুঝতেই পারবে না কোনো দিন। বলেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এরপর তিনি মারিয়ামকে ঘরে তুলে মৃত বোন ও তার স্বামীর জন্য ইনিয়ে-বিনিয়ে শোক করতে লাগলেন। সেই সন্ধ্যায় আদনানদের বাড়িটা দুঃখের ছবি হয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত জেগে রইল। মাগরিবের পর গোলাপি রঙের লবণ-চা খাওয়ার রেওয়াজ এই বাড়িতে। আজ সন্ধ্যায় চায়ের জন্য চুলা জ্বলল না। নূরজাহান অশ্রুভরা চোখে একবার মায়ের পাশে, একবার মারিয়ামের পাশে বসতে লাগল। বুদ্ধি হওয়ার পর মাকে সে কোনো দিন এমন আহাজারি করে কাঁদতে দেখেনি। তিন দিন আগে বোনের লাশ সামনে নিয়ে যে শোক করবার কথা ছিল নাজনীনের, তিন দিন পর বোনের এতিম মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে সেই শোক করতে লাগলেন তিনি। আট ওভার ফিল্ডিং করে ব্যাট করতে না পারার যে দুঃখ আদনান বয়ে এনেছিল খেলার মাঠ থেকে, মারিয়ামের ব্যথাভরা মুখের সামনে সেই দুঃখ ম্লান হয়ে গেল। ওর খুব ইচ্ছা করছিল মারিয়ামের সামনে গিয়ে সান্ত্বনামূলক দু-একটা বাক্য উচ্চারণ করতে, কিন্তু তিন দিন আগে যে মেয়েটি মা-বাবাকে হারিয়েছে, তাকে কী বলে সান্ত্বনা দিতে হয়, জানে না আদনান।

সেই রাতে ঘুম হলো না আদনানের। পাশের ঘর থেকে মারিয়ামের ফোঁপানোর আওয়াজ দুঃস্বপ্নের মতো ওকে জাগিয়ে রাখল দীর্ঘক্ষণ। টিনের কৌণিক চালে তুষারপাতের শব্দ হচ্ছিল। একটু পরপর জমা হওয়া তুষার সশব্দে গড়িয়ে পড়ছিল নিচে। বুঝতে শেখার পর থেকে রাতের টিনের চালে তুষারের এই শব্দ বড় প্রার্থিত ছিল আদনানের কাছে। তীর্থযাত্রীদের মতো প্রতিটি শীতে ও অপেক্ষা করত তুষারপাতের। কম্বলের উষ্ণতায় তুষারের শব্দ ওর দুচোখজুড়ে রূপকথার ঘুম নামাত। কিন্তু আজ তুষারপাতের মায়াবী

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

শব্দকে ওর মনে হলো পাহাড়ি কোনো দুঃখী মেয়ের কান্নার আওয়াজ, যে আওয়াজ কাঠবাদামগাছের মাথার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে পুরো উপত্যকায়। পাশ ফিরে ও কানে কম্বলচাপা দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করল।

শীতকালে পথঘাট তুষারে ঢাকা থাকে বলে বাড়িতেই ফজরের জামাত হয়। ব্যথার রাত্রি পোহালে দাদাজি বাড়ির সবাইকে ডেকে তুললেন নামাজ পড়তে। বসার ঘরে দাদাজির ইমামতিতে নামাজ পড়ল বাড়ির পুরুষ সদস্যরা। নাজনীন দুই মেয়েকে নিয়ে ভোরের ইবাদত সারলেন নিজের ঘরে। আজ নাজনীনের প্রার্থনা যেন ফুরায় না। খোদার দরবারে দুহাত তুললে পাহাড়ি ঝরনার ঢল নামল তার দুচোখে। প্রার্থনার ভেতর ছোট বোনের শৈশবস্মৃতি তার বুকের ভেতর বারবার ছোবল বসাতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মারিয়াম। ক্লাস সেভেনে পড়ুয়া একটি মেয়ে আর কতই-বা কাঁদতে পারে। পাকা আপেলের মতো ওর মসৃণ কপোলে চড়চড় করছিল কান্নার দাগ। সকাল ছড়িয়ে পড়লে নূরজাহান আদনানের কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, মারিয়াম কাল থেকে শুধু কাঁদছে। ভাইয়াজি, এসো স্নোম্যান বানিয়ে ওর দুঃখ ভুলিয়ে দিই।

কিছু একটা করে মারিয়ামের মন ভালো করতে হবে— আদনানও ভাবছিল মনে মনে। অন্তত কোনো একটা কাজে ওকে ব্যস্ত রাখতে পারলে দুঃখ না ভুললেও অন্তত কান্নাটা ওর থামবে। নূরজাহানের প্রস্তাব পছন্দ হলো আদনানের। মারিয়ামকে সঙ্গে নিয়ে ওরা ভাই-বোন ঘরের পেছনে গেল, যেখানে চাল থেকে গড়িয়ে পড়া তুষার স্তূপ হয়ে ছিল। মারিয়ামকে দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা দুজন তুষার দিয়ে একটি মানুষ বানিয়ে ফেলল। শুভ্র তুষারে মানুষের আকৃতি চমৎকারভাবে ফুটে উঠলেও চোখ যেন ফুটছিল না। নূরজাহান তখন ছুটে গেল রান্নাঘরে। দুই টুকরো কয়লা এনে ও বসিয়ে দিল স্নোম্যানের চোখের জায়গায়। অমনি নিষ্প্রাণ স্নোম্যান যেন দৃষ্টি ফিরে পেল। সে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকল আদনানদের দিকে। নূরজাহান উচ্ছল কণ্ঠে মারিয়ামের উদ্দেশে বলল, সুন্দর না, বলো?

মারিয়াম আলতো করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল, হ্যাঁ, সুন্দর। এরপর সে নিজেও হাত লাগাল। আদনান ও নূরজাহান পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে নিল গোপনে। হ্যাঁ, ওদের পরিকল্পনা সফল হয়েছে। ওরা চাচ্ছিল মারিয়াম কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাক। একটু পর ভুল ভাঙল ওদের। ব্যস্ত রাখতে গিয়ে ওরা মারিয়ামের হাতে এমন অস্ত্র তুলে দিয়েছে, যার মাধ্যমে ওর শোকের ক্ষত আরো দগদগিয়ে উঠল। স্নোম্যান বানিয়ে ও যখন হাত ঝেড়ে ফেলল, আদনানদের চোখে ধরা পড়ল তিনটি তুষারমানব। দুজন নারী-পুরুষ

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পাশাপাশি দাঁড়ানো। আর একটু দূরে একাকী দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। মারিয়াম নূরজাহানকে বলল, আরো কয়েকটা কয়লা এনে দাও না! দুটো কয়লা আনবে লম্বা আকৃতির। আম্মুজির চোখ ছিল টানা টানা। বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। আদনান ও নূরজাহান ওদের খালাতো বোনের নির্মাণশৈলীর সামনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় দৃশ্যপটে হাজির হলো রায়হান। সে বিস্মিত কণ্ঠে মারিয়ামের উদ্দেশে বলল, কী ব্যাপার, তুমি এই ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আদনান আর নূরজাহান নিশ্চয়ই তোমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। শিগগির ঘরে চলো। আম্মুজি তোমাকে ডাকছে। আম্মুজি, ও আম্মুজি, মারিয়ামকে ঠান্ডার মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছে আদনান।

চুলায় ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি রেখে ঘরের পেছনে ছুটে এলেন নাজনীন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, ঠান্ডার মধ্যে তোমরা সবাই বাইরে কেন? আদনান, কী হচ্ছে এখানে?

রায়হানের আচরণে আদনান এতটাই হতভম্ব হয়েছে, ও মায়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলে গেল।

নূরজাহান বলল, আমরা স্নোম্যান বানিয়ে মারিয়ামকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করছি, আম্মুজি।

ঘরে এসো সবাই। চা করেছি। চা খাবে। নাজনীন চলে গেলেন। তার পিছু পিছু গেল রায়হান। মারিয়ামকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল নূরজাহান। সবাই ঘরে ফিরলেও বাইরে তুষারের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে রইল আদনান। রায়হানের ওপর মনে মনে ও ফুঁসছে। সব কাজে রায়হান কেন ওর বিরোধিতা করে, বুঝতে পারে না ও। ওর পিরহানের পকেটে একটি পাকা আপেল গড়াগড়ি করছিল। এক সুযোগে মারিয়ামের হাতে গুঁজে দেবে বলে ও আপেলটা তুলে এনেছিল মায়ের ঘর থেকে। আপেল দিতে না পারার আক্ষেপে ওর ক্রোধ আরো বেড়ে গেল। ক্রিকেট বলের মতো ও আপেলটা ছুড়ে মারল তুষারের ভেতর।

পাঁচ

মারিয়ামের শোকের মতো এবারের শীতকালটাও দীর্ঘ হলো। উপত্যকার লোকেরা শীতের ঘায়ে ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। জ্বর-সর্দি-ঠান্ডায় আক্রান্তদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল পাল্লা দিয়ে। স্কুল-কলেজের অপ্রত্যাশিত ছুটির মেয়াদ বারবার নবায়িত হতে লাগল। আকস্মিক তুষারপাতের কারণে ভেস্তে যেতে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

লাগল আদনানদের পরিকল্পিত ক্রিকেট ম্যাচের সূচি। ঘরে সময় কাটে না বলে কোনো কোনো রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে আদনান বেরিয়ে পড়ে সাইকেল নিয়ে। তুষার কেটে কেটে গুরিহাকার সরু রাস্তা ধরে ও চলে যায় পেহেলগাম-অনন্তনাগ প্রধান সড়কে। রাস্তার ধারে সাইকেল থেকে পা নামিয়ে ও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা রংবেরঙের ট্যুরিস্ট বাস দেখে। কলকাতা, বোম্বে, নয়াদিল্লি থেকে পর্যটকদের বয়ে নিয়ে আসে এসব বাস। কোনো কোনো বাসের জানালায় ও শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের মুগ্ধতায় ভরা মুখ দেখে। কারো কারো গলায় ঝুলতে দেখে ক্যামেরা। একবার স্বল্পবসনা এক ইংরেজ নারী বাস থামিয়ে সাইকেলে বসা ওর ছবি তুলেছিল। যাবার সময় ওর হাতে গুঁজে দিয়েছিল চকলেট আর টিপে দিয়েছিল গাল। ইংরেজ নারীর ওই ক্যামেরার মতো একটি ক্যামেরার বড় শখ আদনানের। কোনো দিন এই শখ পূরণের সাধ্য হবে কি না, জানে না ও। হয়তো সাধ্য এমন সময় হবে, যখন আর শখটাই থাকবে না।

আজ ভেড়ার ঘরে সাইকেলের শব্দ হতেই ছুটে আসে নূরজাহান। সাইকেলের ক্যারিয়ার চেপে ধরে ও আবদার জুড়ে দেয়— কোথায় যাবে? আমিও যাব তোমার সাথে।

নূরজাহানের এই পিছু লাগা স্বভাব পছন্দ নয় আদনানের। নূরজাহানের কারণে ইতিপূর্বে ওর বহু গোপন অভিযান ভণ্ডুল হয়েছে। আজ যখন ও ট্যুরিস্ট বাস এবং ক্যামেরা দেখার বাসনায় সাইকেল বের করছে, তখন নূরজাহানের উপস্থিতি ওকে বিরক্ত করে তোলে। ও কপাল কুঁচকে বলতে যায়, আমার সাইকেলে মেয়েদের চড়া বারণ, ঠিক তখনই নূরজাহানের পেছনে ও ওড়নাঢাকা মারিয়ামের মুখটা দেখতে পায়। গোলাপি পিরহান পরা মারিয়াম দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে আছে আনত নয়নে। অমনি মুখের কথা মুখেই আটকে যায় আদনানের। ও তখন বাক্য বদল করে, তুই গেলে মারিয়ামের কী হবে? বাড়িতে একা একা ওর কি ভালো লাগবে?

কথা গোছানোই থাকে নূরজাহানের— তাহলে ওকেও সঙ্গে নাও।

প্রস্তাব পছন্দ হয় আদনানের। এই অভিযানে মারিয়াম সঙ্গে থাকলে মন্দ হয় না। কিন্তু দুটি মেয়েকে সামনে-পেছনে বসিয়ে সাইকেল চালানোর যে অনভ্যস্ত আড়ষ্টতা, তা জাপটে ধরে পরক্ষণে। সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে ও কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। একটু ভেবে সাইকেল রেখে ও বলে, চল যাই।

সাইকেল নেবে না? আমরা সাইকেলে ঘুরব।

আজ না। অন্যদিন।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বাইরে পা রাখতেই শোক সংবাদ বেজে ওঠে মসজিদের মাইকে। দক্ষিণ পাড়ার আবদুল ওয়াহাব দাদা মারা গেছেন। মনটা খারাপ হয়ে যায়। দুদিন আগে তার অসুস্থতার খবর শুনেছিল আদনান। জ্বর-ঠান্ডা। শীতকালে জ্বর-ঠান্ডা সাধারণ রোগ। কিন্তু এই সামান্য অসুখই যে তাকে কবরে নিয়ে যাবে, ভাবেনি ও। আসলে বয়স হয়ে গিয়েছিল তো! লোকটার সাথে মসজিদে দেখা হতো প্রতিদিন। আদনানকে খুব আদর করতেন তিনি। বলতেন, তোমার বয়সী কাউকে নামাজ পড়তে দেখলে বুক ভরে যায়। প্রায় দিনই তার জোব্বার পকেট থেকে বেরিয়ে আসত লাল টুকটুকে আপেল। আদনানের হাতে গুঁজে দিয়ে বলতেন, খাও। টাটকা। সেই মানুষটা চলে গেলেন আজ। মসজিদে তার বসবার শূন্য জায়গাটায় চোখ পড়লে বুক হু হু করে উঠবে নিশ্চয়।

গন্তব্য বদল করল আদনান। আবদুল ওয়াহাব দাদার বাড়ি দূরে নয়। মসজিদসংলগ্ন গোরস্তান পার হয়ে পায়ে হাঁটা উঁচু-নিচু যে পথটা শিশনাগ খালের কোল দিয়ে চলে গেছে দক্ষিণে, ওই রাস্তা ধরে কিছুদূর এগোলেই একটা মুদিদোকান, মুদিদোকানের পেছনের বাড়িটাই তার। আদনান মৃতবাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। নূরজাহান জানাল, আমরাও যাব। আজ রোদ উঠেছে। ঘরে বন্দী থাকতে থাকতে জীবন অতিষ্ঠ।

পা তুলতেই সবুর চাচার ভ্যানের সাথে দেখা। অজিতদের কাঠের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অজিতরা কি কোথাও যাচ্ছে? ভ্যানের কাছাকাছি হতেই বাড়ির ভেতর থেকে বাবা-মার সাথে বেরিয়ে এল পরিপাটি অজিত। অজিতের বাবার গায়ে চকচকে ধুতি-পাঞ্জাবি; তার ওপর চাপিয়েছেন কাশ্মীরি উলের শাল। মায়ের পরনে সালোয়ার-কামিজ, কামিজের ওপর খুব নিপুণভাবে জড়ানো চাদর। তার চওড়া সিঁথিতে দৃশ্যমান সিঁদুর, হাতে শাখা। বাবা পেটফোলা দুটো ব্যাগ ভ্যানের ওপর রাখলে আদনানের বুক দুরুদুরু করে ওঠে। ওদের বেড়াতে যাওয়া কি লম্বা সময়ের জন্য? তা-ই যদি হয়, তবে ওদের ক্রিকেট টিম বেশ কিছুদিনের জন্য একজন পেস বোলারের অভাবে ভুগবে। কে না জানে, ওদের দলের সবচেয়ে গতিশীল বোলার অজিত। আর এ কারণেই, দলের অধিনায়ক হিসেবে, আদনানের বুক দুরুদুরু করে ওঠা।

অজিত, কোথায় যাচ্ছিস তোরা? মনের অস্থিরতা এক পাশে সরিয়ে জিজ্ঞেস করে আদনান।

তীর্থে যাচ্ছি। এক সপ্তার মধ্যে ফিরে আসব।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আদনানের মনে পড়ে, প্রতিবছর এই সময়টাতে ওরা সপরিবার জম্মুর কাটরা জেলায় যায় তীর্থে, মাতা বৈষ্ণো দেবীর মুখদর্শনে। ফিরে আসার পর লাগাতার কয়েক দিন চলে অজিতের জম্মু সফরের গল্প। একই গল্প প্রতিবছর ফিরে ফিরে আসে। তবু ভিন্ন ধর্মের উৎসব, উপাসনা ও পুরাণের গল্প খুব আগ্রহ নিয়ে শোনে আদনান, পুনরাবৃত্তির যন্ত্রণাসহই। কল্পনার চোখে ও দেখে, পাহাড়চূড়ায় অবস্থিত এক পবিত্র মন্দির, সাপের মতো মোচড় দেওয়া পাহাড়ি পথে পায়ে হেঁটে যেখানে পৌছাতে সময় লাগে পাঁচ ঘণ্টা। শুধু মন্দিরই নয়, আদনানের কল্পনাপ্রবণ চোখ দেখতে পায় অনিন্দ্যসুন্দরী এক নারীকে— কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ঐশ্বরিক তেজপ্রবাহের মাধ্যমে যার জন্ম। বাবা-দাদার মুখে অনেক রকম গল্প শুনেছে আদনান। কিন্তু তিন মাতার ঐশ্বরিক তেজস্ক্রিয়ায় এক কন্যার জন্মলাভের গল্প ও কখনো শোনেনি। মাতারা এই কন্যার নাম রাখেন বৈষ্ণো। কন্যাকে তারা সুন্দরী তরুণীর রূপ দিয়ে এক রত্নাকরের বাড়িতে পাঠান। বৈষ্ণো রত্নাকরের বাড়িতে পালিত হতে থাকেন। এক গ্রাম্য মেলায় যুবতি বৈষ্ণোকে দেখে কামনাতাড়িত হয়ে ওঠেন সেই এলাকার বিখ্যাত তান্ত্রিক ভৈরবনাথ। ভৈরবনাথের লালসা থেকে বাঁচতে মাতা বৈষ্ণো ত্রিকুটা পাহাড়ের দিকে চলতে থাকেন। চলার পথে তিনি একটি পাথরের ওপর ক্ষণকালের জন্য দাঁড়ান। পাথর তার পদচিহ্ন ধারণ করে ধন্য হয়। ভক্তরা পাথরের গায়ে আজও খুঁজে পায় মায়ের পবিত্র পায়ের ছাপ। মায়ের পদচিহ্ন ঘিরে সেই জায়গায় আজ গড়ে উঠেছে এক মন্দির। নাম : চরণপাদুকা মন্দির। তীর্থযাত্রীরা এই মন্দিরে মায়ের নামে পূজা না দিলে তাদের তীর্থযাত্রা ব্যর্থ হয়েছে বিবেচিত হয়।

পাথরের গায়ে পদচিহ্ন রেখে এক গুহায় আশ্রয় নেন মাতা বৈষ্ণো। হনুমানকে আদেশ করেন, এই গুহায় আমি ৯ মাস তপস্যা করব, যেভাবে মানবশিশু ৯ মাস মাতৃগর্ভে আশ্রিত থাকে, তুমি ভৈরবনাথকে প্রতিহত করো।

হনুমান গুহার মুখে ভৈরবনাথকে ঠেকিয়ে রাখেন। একপর্যায়ে হনুমান তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লে মাতা বৈষ্ণো গুহার মুখে বাণ নিক্ষেপ করেন। সেখানে প্রবাহিত হয় এক নদী, আজ যে নদীর নাম বানগঙ্গা। হনুমানজি চলে গেলে মাতা বৈষ্ণো এই নদীতে নিজের চুল ধৌত করেন, বৈষ্ণো দেবীর চুলের স্মরণে এই নদী বালগঙ্গা নামেও পরিচিত ওঠে। এখন বানগঙ্গা বা বালগঙ্গায় স্নান না করলে তীর্থযাত্রীদের গোপন বাসনা পরিপূর্ণ হয় না। আর যে গুহায় বৈষ্ণো দেবী ৯ মাস তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, কালে কালে সেই গুহার নাম হয়ে যায় অর্ধকুমারী। সেখানেও গড়ে উঠেছে এক মন্দির। সেটাও ভক্তদের তীর্থস্থান।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

হনুমানজি চলে যান, কিন্তু তখনো ভৈরবনাথ মাতা বৈষ্ণোকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। বৈষ্ণো দেবী আত্মরক্ষার্থে পাহাড়ের আরো উর্ধ্বে আরোহণ করতে থাকেন। একপর্যায়ে এক গুহার মুখে আপন কৃপাণ দিয়ে ভৈরবনাথকে হত্যা করেন তিনি। জীবিতকালে দেবীকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা ভৈরবনাথকে অনুশোচিত করেনি, মৃত্যুর পর অনুশোচনা তাকে দগ্ধ করতে থাকে। তিনি মাতার কাছে অশ্রুসজল চোখে ক্ষমা চান। দয়ার্দ্র মাতা ক্ষমা করেন ভৈরবনাথের ভুল। ভৈরবনাথকে বর দিয়ে তিনি বলেন, ভক্তদের তীর্থযাত্রা তখনই সার্থক হবে, যখন আমার পাশাপাশি ভৈরবনাথের জন্যও তাদের আগমন ঘটবে। এরপর মাতা বৈষ্ণো গুহার মধ্যে চিরকালের জন্য অন্তর্লীন হন। আর কালের পরিক্রমায় তার অন্তর্হিত গুহাটিতে গড়ে ওঠে মাতা বৈষ্ণো ভবন ও মন্দির। অজিতরা প্রতিবছর ওই বৈষ্ণো দেবীর মুখ দর্শনের জন্যই তীর্থে গমন করে।

এককালে যে জায়গাটি ছিল জনমানবহীন নির্জন পাহাড়ি প্রান্তর, মায়ের ভক্তিতে আরক্ত পূজারিদের পদচারণে এখন চব্বিশ ঘণ্টা মুখর থাকে জায়গাটি। অজিতদের কাছে মায়ের দর্শন এতটাই অনিবার্য যে ধনীদের অনেকে হেলিকপ্টারযোগে পাহাড়চূড়ায় অবস্থিত বৈষ্ণো মন্দিরে অবতরণ করে। কেউবা চার বেহারার লোহার পালকিতে চড়ে যায় মায়ের দর্শনে। কেউবা যায় ঘোড়ায় চড়ে। আর যাদের হেলিকপ্টার, ঘোড়া কিংবা পালকি ভাড়া করার সাধ্য নেই, অজিতদের মতো তারা যায় পায়ে হেঁটে। আদনান একবার বলেছিল, আমাকে নিয়ে যাবি, তোদের মাকে দেখার বড় সাধ।

অজিত আঁতকে উঠেছিল— বিধর্মীদের তীর্থে যাওয়া বারণ। তবে হ্যাঁ, তুই দেখার জন্য যেতে পারিস। কত যে সুন্দর আমাদের দেবী! অনেকগুলো মন্দির পেরিয়ে তবে বৈষ্ণো মায়ের আশ্রম। সেখানে বিভিন্ন ঘরে সাজানো আছে অনেক রকম মূর্তি। নতুনরা ভাবে, এগুলোর কোনোটা বোধ হয় মা বৈষ্ণো। আসলে এদের কেউই বৈষ্ণো দেবী নয়। তারা দেবীর পাহারাদার। দেবী তো আছেন গুপ্ত গুহার মধ্যে। পাথুরে লম্বা টানেলের ভেতর দিয়ে যেতে হয় সেই গুপ্ত গুহায়। টানেলের ভেতর লালগালিচা বিছানো। পাহাড়ি জল চুইয়ে পড়ে টানেলের পাথুরে গা বেয়ে। প্রথম যেবার গিয়েছিলাম, আমার গা ছমছম করে উঠেছিল জলের টুপটাপ শব্দে। টানেলের শেষ মাথায় আজও তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছেন বৈষ্ণো দেবী। আর তার সাথে আছেন দেবীর তিন মাতা মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

অজিত এমনভাবে বলে ওদের দেবতাদের কথা, শুনলেই দেখা হয়ে যায়। গেল কয়েকবার ও একই গল্পের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। এবার নিশ্চয় নতুন কোনো ডানা গজাবে ওর গল্পের। আদনান জিজ্ঞেস করে, কবে ফিরবি?

জবাব দেয় না অজিত। বাবার মুখের দিকে তাকায়। তীর্থে যাচ্ছে অথচ নিজেই জানে না কত দিনের সফর। জেঠা বলেন, এক সপ্তাহর যাত্রা। তোমরা সব ভালো থেকো। তোমার বাবাকে বলো আমার কথা। ব্যস্ততায় ভাইজানের সাথে দেখা করতে পারলাম না।

আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন, জেঠা। একবার আমিও আপনাদের সাথে তীর্থে যাব।

অবশ্যই যাবে বেটা। নূরজাহান-মারিয়াম, আমার দুই মা, তোমরাও ভালো থাকো। ভ্যান ছেড়ে দেয়। অজিত হাত নাড়ে। আদনান চিৎকার করে— জলদি ফিরবি। তুই আমাদের প্রধান পেস বোলার। পথের বাঁকে অজিতদের ভ্যান হারিয়ে যায়। আদনান তখনো তাকিয়ে থাকে ওই বাঁকের মুখে। ও ফিসফিস করে বলে, সহি-সালামতে ফিরে আয়।

অজিতদের মতো কয়েক লক্ষ পণ্ডিতের বসবাস এই কাশ্মীরে। এই উপত্যকার হিন্দু-মুসলমান যুগ যুগ ধরে ঝিনুকের দুটো ঢাকনার মতো একই সঙ্গে বসবাস করে আসছে, কোনোরূপ কোন্দল ছাড়াই। পেশায় কাঠমিস্ত্রি অজিতের বাবা। গুরিহাকার অধিকাংশ ঘরের ফার্নিচার তার হাতে তৈরি। আদনানের বাবার সাথে ছোটবেলায় একসঙ্গে পড়েছে। সেখান থেকেই বন্ধুত্ব দুজনের, যেমন বন্ধুত্ব অজিতের সাথে আদনানের। বাবা প্রায়ই বলেন, অজিতকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে তোমার আনন্দিত হওয়া উচিত, আদনান। অজিতকে তুমি জ্ঞানের নতুন দরজা ভাবতে পারো। বহু অজানারে করতলগত করতে পারো অজিতের মাধ্যমে! আন্তধর্মীয় সংস্কৃতির যে সৌন্দর্য, তার সঙ্গে তোমার পরিচয় ঘটাতে পারে অজিত। চোখ উপচানো উচ্ছ্বাস নিয়ে অজিত যখন ওর দেবতাদের গল্প বলে, বাবার কথাই সত্য মনে হয় আদনানের। এমন একজন বন্ধু উপহার দেওয়ায় ও আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে।

দুই টিলার মাঝখানে সমতল ভূমিতে গুরিহাকার একমাত্র মসজিদ। সম্পূর্ণ কাঠ দিয়ে নির্মিত মসজিদটির ছাদ দোচালা ঘরের মতো দুদিকে ঢালু। কাঠের দৃষ্টিনন্দন মিনারটি এত উঁচু যে অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। গুরিহাকার গোরস্তান টিলার ঠিক উল্টো পাশে। মসজিদ অতিক্রম করতে গিয়ে আদনানরা দেখে, উইলোগাছের ছায়ায় ওদের গোরস্তানটি মৃতদেহের মতো শীতল হয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঘন নিবিড় ছায়ায় গোরস্তানের ওপর তখনো জমে আছে তুষারের আস্তর। গোরখোদক গুলজার চাচা তুষার সরিয়ে কবর খনন

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

করছে। তার গায়ে টাকনুছোঁয়া লম্বা পিরহান। মাথায় কানঢাকা টুপি। পায়ে শক্ত সোলের জুতা। হাতে প্লাস্টিকের হাতমোজা। দূর থেকেই গুলজার চাচার সাথে সালাম বিনিময় হয়ে গেল আদনানের। পায়ে পায়ে ওরা কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গুলজার চাচা বাঁকানো কোমর সোজা করে বলল, অনেক দিন পর কবর খুঁড়তে এলাম, বুঝছ? অল্পতেই তাই হাঁপিয়ে উঠছি। সাড়ে তেরো মাস পর কেউ মারা গেল।

প্রত্যুত্তরে আদনান কিছু বলতে যাবে, তার আগেই গমগম করে বেজে উঠল মারিয়ামের কণ্ঠ : শরীর সচল রাখার জন্য আপনি কি অধিক মৃত্যু চান, চাচাজি? মারিয়ামের বলবার ঢঙের মধ্যে এমন তাচ্ছিল্য ছিল, আদনান ও নূরজাহান হতভম্ব হয়ে গেল।

আস্তাগফিরুল্লাহ! আমি তো রসিকতা করছি। আদনান, বেটিটা কে? গুলজার চাচা কোদালের হাতায় ভর দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

ও মারিয়াম। আমার খালাতো বোন।

মারিয়াম অস্ফুট স্বরে বলল, লাশের অভাবে আপনি কাজ পান না অথচ এমন অনেক লাশ আছে, যারা গোরখোদক পায় না। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, লাশের অভাবে আপনাকে যেন বসে থাকতে না হয়।

তোমার কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না, বেটি। গুলজার চাচা যুগপৎ বিস্মিত ও বিব্রত।

চাচা, আপনি কাজ করুন, আমরা বাড়ি যাই। বলেই বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল আদনান। পেছন ফিরে নূরজাহান ও মারিয়ামকেও আদেশ করল সঙ্গে চলার। আদনান এত দিনে বুঝে গেছে, মৃত্যু, লাশ, কবর— এসবের প্রসঙ্গ এলেই অন্য রকম হয়ে যায় মারিয়াম। ওকে তখন আর ঠিক চেনা মানুষ লাগে না। বাবা-মার আকস্মিক মৃত্যু এখনো ওকে কুরেকুরে খাচ্ছে। যত দিন না ও ঠিক হচ্ছে, তত দিন ওকে নিয়ে তাই সতর্ক হয়ে চলতে হবে।

নূরজাহান ভাইয়ের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে বলল, মরা বাড়ি যাবে না, ভাইয়াজি?

ভালো লাগছে না।

তাহলে অন্য কোথাও চলো। মারিয়াম, তুমি যাবে তো? নূরজাহান গ্রীবা ঘুরিয়ে মারিয়ামের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা ছুড়ে দিল; কিন্তু মারিয়াম পাশে নেই। ও তখনো রয়ে গেছে গোরস্তানে, তুষারের ভেতর হাঁটু গেড়ে বসে একটি কবরের এপিটাফ পড়ছে আর গুলজার চাচা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে রহস্যময়ী মেয়েটার দিকে। মারিয়ামের এই আচরণে বিব্রত হয় আদনান। নূরজাহানের সাথে দৃষ্টিবিনিময় করে ও পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে মারিয়ামের কাছে। বলক

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ওঠা ভাতের মতো তখন ফোঁপাচ্ছে মারিয়াম। নূরজাহান দ্রুত ওর কাঁধে হাত রেখে পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে। মারিয়ামের রুদ্ধ কণ্ঠের দেয়াল এবার ভেঙে যায়। ও ব্যথাতুর কণ্ঠে বলে, আম্মুজি-আব্বুজির কবরেও এমন ফলক থাকতে পারত!

আদনান বাহু ধরে তোলে মারিয়ামকে। বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, খালা-খালুর মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমাকে খোশরাগপোরা নিয়ে যাব, যেখানটায় তারা হারিয়ে গেছেন।

মারিয়াম ওর বাদামি চোখের জল মুছে বলে, ঝামেলা করার জন্য আমি দুঃখিত। আর কখনো তোমাদের বিব্রত করব না। তারপর ও ধীরপায়ে গুলজার চাচার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, চাচাজি, আপনি অনেক মহৎ কাজ করছেন। আপনি সযত্নে মানুষের শেষ ঠিকানা নির্মাণ করেন। আপনার দীর্ঘ হায়াতের জন্য আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব।

ফেরার পথে আপেলবাগান, ফসলি মাঠ এবং নূরজাহানদের স্কুল হয়ে ফেরে ওরা। আপেলবাগানে এখন কোনো আপেল নেই। নিজেদের খাওয়ার জন্য একটা গাছ রেখে নভেম্বরে উইলোগাছের পাতলা কাঠের কার্টনে ভরে সমস্ত আপেলই ব্যাপারীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন দাদাজি। তবু এই ফলশূন্য বাগানে দাঁড়িয়ে মারিয়ামের উদ্দেশে আদনান বলে, এটা আমাদের আপেলবাগান। এখন, এই শীতে বাগানে না আছে ফুল, না আছে কুঁড়ি কিংবা কাঁচা-পাকা আপেল। মার্চে আমাদের এই বাগান ভরে উঠবে সাদা সাদা ফুলে। মে মাসে ফুলগুলো পরিণত হবে আপেলের কুঁড়িতে। সবুজ পাতার ভেতর সবুজ কুঁড়িকে তখন খুঁজে পাওয়াই হবে দুষ্কর। সেপ্টেম্বর থেকেই পাকতে শুরু করবে আপেল।

মারিয়াম ততক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ও হাসতে হাসতে বলে, আমাকে আপেলের জীবনচক্র সম্পর্কে অজ্ঞ বিদেশি পর্যটক ভেবেছ?

নিজেদের বাগান বলেই এমন প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছি। আদনানও যোগ দেয় ওর হাসিতে।

আপেলবাগান ছাড়িয়ে ওরা যখন ওদের ফসলি মাঠের ভেজা আলে পা রাখে, দেখে, এই শীতে ওদের ধানের মাঠ অনাবাদি জমির মতো পড়ে আছে অযত্নে। চেনা-অচেনা লতাগুল্ম আর আগাছায় ভরে আছে প্রান্তর। এক জোড়া বেজি ওদের দেখে ঘাসের ভেতর মুখ লুকায়। শীত যেভাবে কাশ্মীরিদের জীবনকে অচল করে দিয়েছে, অচল করে দিয়েছে ওদের ফসলি মাঠকেও। আজকের এই স্থবিরতা দেখে কে বলবে, কদিন পরই এখানে ধান রোপণের ধুম পড়ে যাবে! ধূসর মাঠের ভেজা আলে হাঁটতে হাঁটতে আদনান নিজের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

সাথে নিজে কথা বলে, নাকি মারিয়ামকে শোনায়, বোঝা যায় না। আদনান ওদের স্থাবর সম্পত্তিগুলোর সাথে পরিচয় ঘটাচ্ছে মারিয়ামের, কারণ, মারিয়াম এখন আর ওদের খালাতো বোন নয়, যার বাড়ি দূরের বারমুলায়; বরং মারিয়াম এখন ওদের পরিবারেরই একজন। নূরজাহান কিংবা আদনান যেমন ওদের আপেলবাগান, ধানি জমি, ভেড়ার পালকে চেনে, মারিয়ামেরও তা চেনা উচিত।

মাঠ পেরিয়ে আদনান নূরজাহানের যৌথ স্কুল। ইটের দেয়ালের ওপর টিনের চাল নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে হাত-পা ছড়িয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে স্কুলঘর। জনমানবশূন্য থমথমে পরিবেশে প্লাস্টারবিহীন ইটের দেয়ালের লম্বা বিল্ডিংকে মনে হচ্ছে ভূতের বাড়ি। তুষারের অত্যাচারে মাঠের সবুজ ঘাস মারিয়ামের চুলের মতো ঈষৎ লালচে। স্কুল মাঠের দুপাশে দৈত্যের মতো উঁচু উঁচু চিনারগাছের সারি। শীতে পাতা হারিয়ে গাছগুলো কুৎসিত রকমের ন্যাড়া। বসন্ত এলেই এর শাখাপ্রশাখা আবার ভরে উঠবে সবুজ পাতায়। সবুজের দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে শরৎকালে যখন সবুজ পাতারা হলুদ হতে শুরু করবে, মনে হবে গাছগুলোর মাথায় আগুন ধরে গেছে। তখন গাছের দিকে চোখ রাখা দায়। শরতের ওই সময়টার স্কুল আদনানের সবচেয়ে প্রিয়। দাদাজি একবার বলেছিলেন, কোনো এক মোগল বাদশাহ নাকি চিনারের এই জ্বলন্ত রূপ দেখে ফারসি ভাষায় চিৎকার করে বলেছিলেন— চিহ নার! মানে, কী আগুন! সেই থেকে এর নামই হয়ে গেল চিনার। চিনারের আগুনে রাজা-বাদশাহরা মুগ্ধ হলে আদনান কেন হবে না! এ কারণে অন্য ঋতুতে স্কুল কামাই গেলেও শরতের ও নিয়মিত ছাত্র।

স্কুল খুললে তোমাকে এখানেই ভর্তি হতে হবে। এই আঙিনা ভালো করে চিনে নাও। এখানে তুমি নূরজাহানের মতো অনেক বান্ধবী পেয়ে যাবে।

নূরী আছে, আমার আর নতুন কোনো বান্ধবীর দরকার নেই। নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে মারিয়াম মিষ্টি করে হাসে।

মসজিদের মাইক আবার কথা বলছে। আদনান কান খাড়া করে। আবদুল ওয়াহাব দাদাজির জানাজা হবে বাদ জোহর। আদনান হাতঘড়ি দেখল। জোহরের নামাজের বেশি দেরি নেই। জীবিতকালে যে মানুষটা ওকে ভালোবাসত, সেই মানুষটার জানাজায় শামিল হতে ওর মন বারবার আদেশ করতে লাগল। দুই বোনকে নিয়ে ও হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। জানাজার আগেই ওকে পৌঁছাতে হবে লোকালয়ে। জানাজার নামাজের জন্য আজ এত ব্যাকুলতা আদনানের, কিন্তু আদনান জানে না, খুব শিগগির এমন দিন আসবে, যখন এই উপত্যকার মানুষেরা জানাজা পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

যাবে, কিন্তু লাশ ফুরাবে না। আদনান, মারিয়াম, নূরজাহানদের যাত্রা সেই রক্তাক্ত সময়ের দিকে।

একই গাঁয়ের মানুষ হিসেবে আবদুল ওয়াহাবের মৃত্যুসংক্রান্ত বিষণ্নতা আক্রান্ত করেছিল আদনানের বাবা ফয়জুল্লাহকেও। জানাজা ও দাফন থেকে ফিরে খাবারের মাদুরে বসে তিনি ছিলেন চুপচাপ। সমবয়সী পড়শিকে হারিয়ে দাদাজি আবদুল লতিফ কোলের পাশে রেডিও রাখতে ভুলে গেছেন আজ। খাবারের থালায় ইতস্তত হাত নেড়ে বাবা ও দাদার বিষণ্ন চেহারার ভাষা পড়বার চেষ্টা করছিল আদনান। একবার ও খেয়াল করল, মারিয়ামের হাতও থমকে আছে দস্তরখানে। শুধু নূরজাহান ও রায়হান নির্বিকার।

বাবা হঠাৎ থমথমে কণ্ঠে বললেন, আবদুল ওয়াহাব চাচাজির স্বপ্ন ছিল স্বাধীন কাশ্মীর দেখে যাওয়ার। অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে তাকে পৃথিবীকে বিদায় জানাতে হলো। হয়তো পরাধীনতার গ্লানি বুকে নিয়ে একদিন আমরাও মারা যাব।

দাদাজি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, গণভোটের নামে বারবার আমাদের প্রবঞ্চিত করা হয়েছে। নয়তো এখন আমরা স্বাধীন ভূখণ্ডের মালিক থাকতাম। কাশ্মীরের পথে পথে বন্দুকের নল-উঁচানো ভারতীয় আর্মিদের দেখে ঘৃণায় মুখ ফেরাতে হতো না আমাদের। সেদিন নেহরুর একটুখানি সদিচ্ছাই পারত আমাদের সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিতে।

আবদুল ওয়াহাব দাদাজির মৃত্যুসৃষ্ট এই বিষণ্ন বাতাস খাবারের দস্তরখান থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিল আদনান, বিশেষত মারিয়ামের জন্য। কারণ, যখনই কারো মৃত্যু নিয়ে আলোচনা হয়, মারিয়ামের চেহারায় অমাবস্যার অন্ধকার নেমে আসে। মারিয়ামের চেহারার ওই ঘনীভূত মেঘ বড় যন্ত্রণা দেয় আদনানকে। আর এ কারণে, দাদাজির মুখে ইতিহাসের গন্ধ পেতেই ও প্রসঙ্গের মুখ ঘুরিয়ে দিতে চাইল সেদিকে। বলল, দাদাজি, নেহরু সাহেব কী করেছিলেন?

সেটা তোমার আব্বুজির কাছে শোনো। ফয়জুল্লাহ ভালো বলতে পারবে।

আবার ইতিহাসের গল্প! খাওয়ার সময় এসব চলবে না। চোখ পাকিয়ে তেড়ে এলেন নাজনীন।

আরে বউমা, খেতে খেতে ইতিহাস যতটা জমে, অন্য সময় ততটা জমে না। বললেন আবদুল লতিফ।

রুটি চিবোতে চিবোতে নূরজাহান বলল, আব্বুজি, আগে একদিন কথা দিয়েছিলেন, ডোগরা শাসনের কবল থেকে কীভাবে আমরা ভারতীয়দের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কবলে পড়লাম, সেই গল্প বলবেন। আপনি এখনো আপনার কথা রাখেননি। কথা দিলে সেই কথা রাখতে হয়।

সবাই যখন ধরেছে, তখন শুনিয়ে দাও ইতিহাসের দু-চারটা লাইন। তবে হ্যাঁ, দীর্ঘ করা যাবে না। তোমাদের খাওয়া হলে আমাকে সব আবার গোছাতে হবে। তাড়া দিলেন নাজনীন।

শুরু করলেন ফয়জুল্লাহ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার খাওয়ার পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের লালসার জিহ্বা কিছুটা খাটো হলো। সারা দুনিয়াজুড়ে বিস্তৃত বিশাল কলোনি চালানোর ক্ষমতা তাদের আর থাকল না। তারা অর্থ সাহায্যের জন্য হাত পাতল আমেরিকার কাছে। আমেরিকা শর্ত দিল— কলোনিগুলোকে বিশ্বস্ত লোকদের হাতে তুলে দাও, যারা আমাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলবে। শুরু হলো ভারতবর্ষকে ভারতীয়দের হাতে সোপর্দ করার তোড়জোড়। মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক মাতৃভূমির দাবি জানিয়ে আসছিল আগে থেকেই। এবার যখন ভারতের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ এল, তখন জোরদার হলো তাদের দাবি। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামের আলাদা দুটি দেশের জন্ম হলো। দেশভাগের অন্যতম শর্ত ছিল, ব্রিটিশ শাসনের বাইরে যে সমস্ত স্বশাসিত করদ রাজ্য আছে, তারা ইচ্ছেমতো ভারত বা পাকিস্তান যেকোনো ডমিনিয়নে যোগ দিতে পারবে। আবার কেউ যদি স্বাধীন থাকতে চায়, তাতেও বাধা দেওয়া হবে না। কাশ্মীরে তখন সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগোষ্ঠীর শাসক হিন্দু হরি সিং। মুসলিম জনগোষ্ঠী নিয়ে তিনি ভারতে যোগ দেবেন কি না, বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তার দ্বিধার কারণ— সংখ্যাগুরু জনগণ চায় স্বাধীনতা কিংবা পাকিস্তানভুক্তি; কিন্তু কিছুতে নয় ভারতভুক্তি। ওদিকে হরি সিংয়ের প্রথম পছন্দ স্বাধীনতা। তা না হলে ভারতভুক্তি; কিন্তু কিছুতে নয় পাকিস্তানভুক্তি। সবকিছু দেখেশুনে হরি সিং স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ধরেই রেখেছিলেন কাশ্মীর পাকিস্তানের হবে। একে তো এটা মুসলিমপ্রধান জনপদ, তার ওপর ভৌগোলিকভাবে পাকিস্তানের খুব কাছে। কাশ্মীর তারই পাওনা। কিন্তু হরি সিংয়ের স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্তে স্বপ্নভঙ্গ হলো জিন্নাহর।

মাউন্টব্যাটনের উপদেশ অনুযায়ী হরি সিং ভারত পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের সাথে একটি অপরিবর্তনশীল স্থিতাবস্থাসংক্রান্ত চুক্তি করতে সম্মত হলেন। এই চুক্তির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল— ইতিপূর্বে জম্মু-কাশ্মীর সরকার বাণিজ্য, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ব্রিটিশ ভারতের সাথে যে ধরনের সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিল, এখন ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে একই ধরনের সম্পর্ক

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বজায় রেখে চলবে। কিন্তু পাকিস্তান এই চুক্তিতে আগ্রহ দেখালেও ভারত আগ্রহ দেখাল না। কাশ্মীরি জনগণ ভারতবিযুক্তির কারণে খুশি হলেও তারা হরি সিংয়ের ওপর মোটেও খুশি ছিল না। হরি সিং ছিলেন সাম্প্রদায়িক, অত্যাচারী এবং স্বৈরাচার। ইতিপূর্বে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা হরি সিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন করেছে। এখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে পুরো উপমহাদেশের মানচিত্র ওলট-পালট হলেও কাশ্মীরিদের সেই দুঃখের দিনের অবসান ঘটল না। তাদের নেতা শেখ আবদুল্লাহ হরি সিংয়ের কারাগারে তখনো বন্দী। নেতৃত্বের অভাবে হরি সিংয়ের বিরুদ্ধে তারা কেবল ফুঁসতে লাগল। এই যখন অবস্থা কাশ্মীরের, তখন, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুঞ্চ অঞ্চলের জনগণ হরি সিংয়ের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ডাক দিল। ভৌগোলিকভাবে পুঞ্চ জেলাটি ছুঁয়ে গেছে ভারত-পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণরেখা। বর্তমানে এর এক ভাগ আজাদ কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত, অপর ভাগ ভারত অধিকৃত জম্মুর সাথে যুক্ত। পাকিস্তানের অংশ নাম ধারণ করেছে রাওয়ালকোর্ট এবং ভারতের অংশ আগের সেই পুঞ্চ নামেই রয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে এই পুঞ্চ থেকে মহারাজা হরি সিংয়ের বিরুদ্ধে যে গণবিক্ষোভ জেগে উঠেছিল, কালক্রমে এটাই পাক-ভারত যুদ্ধের পরিণতি বরণ করে। পুঞ্চের গণজাগরণের ইতিহাস পুরোপুরি না বললে কাশ্মীরের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পুঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা ছিল মুসলমান। ঐতিহাসিকভাবে এই মুসলমানেরা স্থানীয় ভূস্বামীদের হাতে, যারা ছিল হিন্দু এবং মহারাজার নিকটজন, শোষিত হয়ে আসছিল। বাড়তি করের চাপে তাদের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। এ রকম পটভূমিতেই ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার ঘণ্টা বেজে ওঠে। পুঞ্চের মুসলমানরা ছিল জাতিগতভাবে যোদ্ধা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই অঞ্চলের প্রায় ষাট হাজার সৈন্য ব্রিটিশদের হয়ে যুদ্ধ করেছিল। তাদের হাতে তখনো ছিল বিপুল অস্ত্রশস্ত্র। তারা দেখছিল, তাদের পার্শ্ববর্তী পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হচ্ছে। এই যুক্ত হওয়া নিয়ে সেখানে জাতিগত দাঙ্গাও শুরু হয়ে গেছে। দাঙ্গায় আক্রান্ত অনেক শিখ ও হিন্দু এসে আশ্রয় নিয়েছে জম্মুতে। আবার পুঞ্চে ছিল মুসলিম কনফারেন্সের প্রভাব। মুসলিম কানফারেন্স চাচ্ছিল কাশ্মীর পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হোক। ফলে মুসলিম কনফারেন্স দ্বারা প্রভাবিত পুঞ্চবাসীও চাচ্ছিল পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হতে। অন্য দিকে শেখ আবদুল্লাহর ন্যাশনাল কনফারেন্স চাচ্ছিল কাশ্মীরের ভাগ্য জনগণের ওপর ছেড়ে দিতে। তারা স্বাধীন থাকবে, নাকি ভারত কিংবা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হবে, সে তাদের ইচ্ছা। আর মহারাজা হরি সিং এ সময় কালক্ষেপণের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

উদ্দেশে নীরবতার আশ্রয় নেন। স্থানীয় হিন্দুরা মহারাজাকেই সমর্থন করছিল।

পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের দাঙ্গা মহারাজা হরি সিংকে উদ্বিগ্ন করে তুললে তিনি পুঞ্চে বিপুল পরিমাণে সামরিক উপস্থিতি বাড়াতে থাকেন। নাগরিকদের চলাফেরা এবং মালামাল পরিবহনে কড়াকড়ি আরোপ করেন। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়ে যায়। এতে পুঞ্চবাসীর পূর্বের ধূমায়িত ক্ষোভে আগুনের আঁচ লাগতে থাকে। কিন্তু মহারাজা এ ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপহীন। কোথায় তিনি পুঞ্চবাসীর ক্ষোভ দূরীকরণের চেষ্টা করবেন, তা নয়, আগস্ট মাসে তিনি পুঞ্চবাসীকে অস্ত্র জমা দিতে বললেন। ওদিকে সামরিক বাহিনীর ঘেরাওয়ের ভেতর যখন পুঞ্চের বাসিন্দারা বিক্ষুব্ধ, ঠিক তখনই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের জঙ্গিরা গণহত্যায় মেতে ওঠে। পুঞ্চবাসীর অপরাধ, তারা জেলার বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করেছিল। এই গণহত্যায় পুঞ্চের কতসংখ্যক মুসলিম নিহত হয়েছে, তা নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। তবে ব্রিটিশ প্রচারমাধ্যমগুলো নিহতের সংখ্যা দুই লাখের অধিক বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে। এই গণহত্যা জম্মুর ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার হিসাবই পাল্টে দেয়। এ সময় বর্তমান পাকিস্তাননিয়ন্ত্রিত অংশের পুঞ্চ উপজাতিরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুর্গত মুসলিম স্বজাতিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। শুরু হয় হরি সিংয়ের বিরুদ্ধে পুঞ্চবাসীর বিদ্রোহ। তারা গঠন করে আজাদ কাশ্মীর সরকার। পাকিস্তান রেডিও নতুন এই সরকার গঠনের সংবাদ প্রচার করে গুরুত্বের সাথে। ঠিক তখন কাকতালীয়ভাবে আরেকটি ঘটনা ঘটে যায়। মহারাজা হরি সিং প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাককে বরখাস্ত করে নতুন প্রধানমন্ত্রী বানান কংগ্রেস-সমর্থিত মেহের চাঁদ মহাজনকে। এতে পুঞ্চবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, মহারাজা ভারত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকছেন। ফলে মুসলমানদের উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়। ক্ষিপ্ত উপজাতিরা পুঞ্চের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাজধানী শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তায়, যেসব পাকিস্তানি সৈন্য এই সময় ছুটিতে ছিল, সুযোগ বুঝে তারাও যুক্ত হয় উপজাতিদের সাথে। যদিও দাপ্তরিকভাবে পাকিস্তান শুরুতে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তবে বিদ্রোহীদের ওপর তাদের সমর্থন ও পরোক্ষ মদদ ছিল পুরোপুরিই।

উপজাতিদের বিদ্রোহে মুজাফফরাবাদসহ কাশ্মীরের বিপুল অঞ্চল মহারাজার হাতছাড়া হয়ে যায়। মহারাজার নির্দেশ ছিল— যেকোনো মূল্যে লোকদের মুজাফফরাবাদে আটকে রাখতে হবে। মুজাফফরাবাদের উজির সেই চেষ্টাই করেছিলেন। কিন্তু জনতার পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিপরীতে কার্যত

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

উজিরের কোনো ক্ষমতাই ছিল না তখন। উজির নিজেই সরকারি বাংলোতে আক্রমণকারীদের গুলিতে নিহত হলেন। আক্রমণকারীদের প্রধান টার্গেট ছিল মহারাজার উজির-আমলাসহ বিভিন্ন রাজকর্মচারী। তারই অংশ হিসেবে নিহত হওয়া উজিরের।

পুঞ্চ অতিক্রম করে উপজাতিরা প্রবেশ করে বারমুলায় এবং ব্যাপক লুটপাট ও ধ্বংসলীলা চালায়। উপজাতিরা ছিল হিংস্র, উচ্ছৃঙ্খল এবং গোঁয়ার। তাদের নিয়মতান্ত্রিক কোনো যুদ্ধপ্রশিক্ষণ ছিল না। হরি সিংকে বিতাড়িত করে কাশ্মীর উপত্যকার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার মতো দক্ষ নেতৃত্বগুণও ছিল না তাদের। ফলে অত্যাচারী হরি সিংয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেমে তারা ভুলে যায় এই আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শ্রীনগরে মহারাজার প্রাসাদ দখল করবার পরিবর্তে তারা লুটতরাজে কালক্ষেপণ করে বারমুলায়। এতে প্রস্তুতির জন্য অনেকটা সময় পেয়ে যান মহারাজা হরি সিং। স্বাধীনতা ঘোষণার প্রাক্কালে এই অতর্কিত আক্রমণের মুখে প্রমাদ গুনতে থাকেন তিনি। হিংস্র এই উপজাতিদের তিনি রুখবেন কী করে! এদের রুখবার মতো শক্তি তার নেই। নিরুপায় মহারাজা রাজধানী ছেড়ে পালালেন জম্মুতে। খবর পেয়েই বিদ্রোহীরা উল্লাসে ফেটে পড়ল। পাকিস্তানি রেডিওতে খবর প্রচারিত হলো— রাজা দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়েছেন।

বিপন্ন মহারাজা যখন প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, তখন সবার আগে তার মনে পড়ল ভারতীয় সেনাবাহিনীর কথা। অমন সুপ্রশিক্ষিত বিশাল সৈন্যভাণ্ডার থাকলে আজ কাপুরুষের মতো তাকে পালাতে হতো না। তিনি বুঝতে পারলেন, একাকী টিকে থাকা সম্ভব নয়। ভারতের সাহায্য তার প্রয়োজন। ২৬ অক্টোবর সাহায্যের আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মেহের চাঁদ মহাজনকে দিল্লি পাঠালেন হরি সিং। নেহরু জানালেন, কাশ্মীর এখন স্বাধীন রাষ্ট্র। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে সামরিক অভিযান পরিচালনা করবার ন্যায্যত কোনো অধিকার ভারতীয় সেনাবাহিনীর নেই। আমরা তখনই কাশ্মীরকে সাহায্য করতে পারি, যখন কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মহাজন তখন সাহায্যের জন্য ব্যাকুল। যেকোনো মূল্যেই হোক, মহারাজার সিংহাসন টিকিয়ে রাখতে হবে। সেই বৈঠকে ঠিক কী কী ঘটেছিল, তার একটি চমকপ্রদ চিত্র মহাজনের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়। মহাজন নেহরুকে বলেছিলেন, এই মুহূর্তে যদি ভারতীয় সৈন্য শ্রীনগরের পথে রওনা না হয়, তবে তিনি সমঝোতার জন্য পাকিস্তানে জিন্নাহর কাছে ছুটে যাবেন।

মহাজনের এই সংলাপে ভয়ংকর রকমের ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন নেহরু। তিনি মহাজনকে ঘর থেকে বের করে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। শেখ আবদুল্লাহর

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

হস্তক্ষেপের পরই কেবল নির্মূল হয়েছিল নেহরুর ক্রোধ। তত দিনে হরি সিংয়ের কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়েছেন কাশ্মীরের জনপ্রিয় নেতা শেখ আবদুল্লাহ এবং জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ঝুঁকে পড়েছেন ভারতীয় শাসকদের প্রতি। পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি তাকে বেশি আকর্ষণ করছে তখন। ফলে, প্রথম চাওয়া স্বায়ত্তশাসন হাতছাড়া হলে কাশ্মীরের পাকিস্তানভুক্তির চেয়ে তার কাছে বেশি প্রার্থিত কাশ্মীরের ভারতভুক্তি। আর এ কারণেই নেহরুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা আবারো উষ্ণ হয়ে উঠেছে।

সেদিন, ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর, দিল্লিতে ভারত সরকার ও জম্মু-কাশ্মীর সরকারের মধ্যে ভারত অন্তর্ভুক্তিসংক্রান্ত দলিল স্বাক্ষরিত হলো। কাশ্মীরি জনতার মতামত না নিয়েই কেবল শাসকের ইচ্ছার বশে কাশ্মীরিদের জীবনকে জুড়ে দেওয়া হলো ভারতের সাথে। এই দলিল অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীর সরকার প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ— এই তিনটি বিষয়ে ভারতের কর্তৃত্ব মেনে চলতে স্বীকৃত হলো। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলো, জম্মু-কাশ্মীরের আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক হলে সেখানকার মানুষের স্বীকৃতি নেওয়ার পরই তাদের ভারত অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। আজাদ কাশ্মীর সরকার ঘোষণা দিল— এই চুক্তি অবৈধ। সিংহাসনচ্যুত হরি সিংয়ের কোনো অধিকার নেই কাশ্মীরের পক্ষে চুক্তি করবার।

চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সাথে সাথে দিল্লি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্য গিয়ে নামল শ্রীনগরের ছোট্ট রানওয়েতে। আক্রমণকারী উপজাতিরা তখন শ্রীনগর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ভারতীয় সৈন্যরা বিশৃঙ্খল উপজাতিদের তাড়িয়ে দিল শ্রীনগর থেকে। কিন্তু কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যদের উপস্থিতি বরদাশত করতে পারল না পাকিস্তান। গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উপজাতিদের জন্য সৈন্যসহায়তা পাঠালেন পাকিস্তান থেকে। স্বাধীনতার প্রথম বছরেই একই মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া দুটি যমজ রাষ্ট্র কাশ্মীর ইস্যুতে জড়িয়ে পড়ল যুদ্ধে। ভারতীয় সৈন্যরা বারমুলা পুনর্দখল করল। মুজাফফরাবাদ রয়ে গেল পাকিস্তানের অধীনে। ভারতবর্ষের মতো ভাগ হয়ে গেল কাশ্মীর। আজও পৃথিবীর এই ভূস্বর্গ পেটের ক্ষত চেপে দুটুকরো হওয়ার বেদনা বয়ে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু আব্বুজি, দাদাজি বলছিলেন গণভোটের কথা। নেহরু নাকি কথা রাখেননি! এতক্ষণে ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছিল আদনান। আলোচনার এই পর্যায়ে গণভোটবিষয়ক জিজ্ঞাসা ওর মস্তিষ্কে উছলে ওঠে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তবু কাশ্মীরের বিড়ম্বিত ইতিহাস শ্রোতাদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তারা বিস্মৃত হয়েছিল হাত ধোয়ার কথা। প্রত্যেকের হাতে চড়চড় করছিল শুকিয়ে যাওয়া মাংসের ঝোল। ফয়জুল্লাহ শেষবারের মতো আঙুল চেটে বলতে লাগলেন, উপজাতিদের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে হরি সিংয়ের সাথে যখন নেহরুর তড়িঘড়ি চুক্তি হয়, নেহরু সম্ভবত অপরাধবোধে ভুগছিলেন। এ কারণে আন্তর্জাতিক মহলকে জানানোর উদ্দেশে তিনি বিভিন্ন সভায় বারবার বলছিলেন, এই চুক্তি সাময়িক। অচিরেই একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ গণভোট অনুষ্ঠিত হবে কাশ্মীরে। কাশ্মীরিরাই ঠিক করবে তারা কোন দিকে যাবে।

কিন্তু নেহরু কথা রাখেননি, তাই না, খালুজি? এই প্রথম কথা বলে ওঠে মারিয়াম।

শুধু নেহরু না, নেহরু-জিন্নাহ কেউই কথা রাখেনি। মূলত কাশ্মীর এমন ভাগ্যহত রূপসী নারী, যাকে পাওয়ার জন্য সবাই লালায়িত অথচ তার হৃদয়ের আওয়াজ শুনবার মতো ধৈর্য কারো নেই।

তারপর কী হলো, আব্বুজি? এই জিজ্ঞাসা নূরজাহানের।

১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি নেহরু কাশ্মীর সমস্যাকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে উত্থাপন করেন। জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত নেয়, গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরিরাই নির্ধারণ করবে কাশ্মীরিদের ভাগ্য। পাক-ভারত যুদ্ধ বন্ধ এবং গণভোটের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের পাঁচ সদস্যের কমিশন ভারতবর্ষে আসে। গণভোটের পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে কমিশন কয়েকটি প্রস্তাব রাখে। প্রথম প্রস্তাব : পাকিস্তান উপজাতি যোদ্ধাদের কাশ্মীর থেকে সরিয়ে নেবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব : ভারতও তাদের মোতায়েনকৃত অধিকাংশ সৈন্য কাশ্মীর থেকে সরিয়ে নেবে। তৃতীয় প্রস্তাব : কাশ্মীরে অবাধ গণভোট নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় বসবে। কিন্তু দুই রাষ্ট্রের কেউই তাদের অংশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে রাজি হয় না। উভয়েরই শঙ্কা ছিল— সৈন্য প্রত্যাহার করার ফলে যদি দখলকৃত অংশটাও প্রতিপক্ষের হাতে চলে যায়! এরপর বহুবার বহু কমিশন গণভোট আয়োজনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনো প্রচেষ্টাই আলোর মুখ দেখেনি। পাকিস্তান শেখ আবদুল্লাহর কারণে গণভোটের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। কারণ, তখন শেখ আবদুল্লাহ ছিলেন কাশ্মীরের তুমুল জনপ্রিয় নেতা। নেহরুর সঙ্গে সখ্যের কারণে কাশ্মীরকে তিনি ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছিলেন। শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বগুণে হতে পারে কাশ্মীরিরা ভারতের পক্ষে ভোট দেবে— এই ভয় ছিল পাকিস্তানের। অন্য

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

দিকে ভারত বিশ্বাস করতে পারেনি কাশ্মীরিদের। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা পাকিস্তান রেখে ভারতের সাথে যুক্ত হবে— এমন অলীক স্বপ্ন নেহরু দেখতে পারেননি। ফলে, উভয় দেশই গণভোটের প্রশ্নে বারবার টালবাহানার আশ্রয় নিয়েছে এবং ভেস্তে গেছে কাশ্মীরিদের স্বাধিকারের স্বপ্ন।

১৯৫৩ সালের আগস্টে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী দিল্লিতে আলোচনায় বসলেন। দুই পক্ষই স্থির করল, গণভোটের স্বার্থে তারা নিজ নিজ সৈন্য প্রত্যাহার করবে এবং পরের বছর গণভোটের আধিকারিক নিযুক্ত হবে। কিন্তু কিছুদিন যেতেই ভারত অভিযোগ করল, আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করছে। হতে পারে এই অস্ত্র ব্যবহৃত হবে কাশ্মীরে। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে ভারত সৈন্য প্রত্যাহার করতে পারে না। এরপরও জাতিসংঘ অনেকবার গণভোটের চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভারতের মিত্ররাষ্ট্র রাশিয়া জাতিসংঘের প্রতিটি প্রস্তাবেই আমেরিকা ও পাকিস্তানের প্রতি শত্রুতাবশত ভেটো প্রদান করেছে। আর প্রতিবার রাশিয়ার এই ভেটো প্রদানকে অভিনন্দিত করেছে ভারত, গোপনে। যে ভারত শক্তি প্রয়োগ করে স্ব-উদ্যোগে জুনাগড়ে গণভোটের আয়োজন করল, সেই তারাই কাশ্মীরের গণভোটের প্রশ্নে বারবার পিছু হটল।

জুনাগড়ে কী ঘটেছিল, আব্বুজি?

ব্রিটিশ শাসনামলে জুনাগড়ও ছিল কাশ্মীরের মতো দেশীয় করদ রাজ্য। পার্থক্য শুধু এই জায়গায় যে জুনাগড়ের শাসক ছিলেন মুসলমান আর প্রজাসাধারণ হিন্দু।

কাশ্মীরের ঠিক বিপরীত?

হ্যাঁ। তো মাউন্টব্যাটনের দেশভাগ আইনমতে জুনাগড়ের রাজার সামনে তিনটি পথ খোলা ছিল। স্বাধীন থাকো অথবা ভারত কিংবা পাকিস্তানের সাথে যোগ দাও। জুনাগড়ের মুসলিম শাসক স্বাধীন থাকাকেই অগ্রাধিকার দিলেন। অথচ তার হিন্দু প্রজারা চায় ভারতের সাথে যুক্ত হতে। ভারত তখন রাজার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে গণভোটের আয়োজন করল জুনাগড়ে। নেহরু নিশ্চিত ছিলেন, গণভোটে ভারতের পক্ষেই রায় আসবে। তাই তো জুনাগড়ের বেলায় গণভোটের তার এত আগ্রহ। সেখানে শাসকের ইচ্ছার কোনো মূল্য দেওয়া হলো না। অথচ হরি সিংও স্বাধীন থাকতে চাইছিলেন। কিন্তু তাকে চাপে ফেলে ভারতভুক্তিতে রাজি করানো হলো। এ সবই সাম্রাজ্যবাদী লালসার ফসল।

দুটি দেশের খামখেয়ালির কারণে সেই যে আমরা পরাধীন হলাম, তা থেকে আর মুক্তি মিলল না। অথচ একটিবার যদি এই উপত্যকায় সুষ্ঠু

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

গণভোট হতো, আমরা নিশ্চিতভাবে স্বাধিকার লাভ করতাম। এই জনপদের মানুষদের আমি চিনি। এরা আজাদির পক্ষেই ভোট দিত। দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ল দাদাজির কণ্ঠে। জানাজার সেই বিষণ্নতা আবার যেন ফিরে এল খাবারের মাদুরে। সবাই গম্ভীর চেহারায় হাত ধুয়ে ধীরে ধীরে উঠে পড়ল দস্তরখান থেকে। সবুজ মাদুরের প্রান্তে আতিথেয়তার সৌন্দর্য-উৎকীর্ণ উর্দু কবিতার চরণ পড়ে রইল একাকী।

ছয়

১২ ফেব্রুয়ারির সকালটি ছিল মেঘে ঢাকা। বাবার ঘরের জানালায় দাঁড়ালে যে পর্বতটি স্পষ্ট দেখা যায় এবং বসন্তে যে পর্বতটি সবুজ ঘোমটা পরে থাকে, সেই পর্বতের গায়ে এখন লেগে আছে মেঘের ছোপ ছোপ অন্ধকার। আদনানদের কাঠবাদামগাছের শাখাগুলোও মেঘের মতো গম্ভীর। উঠোনে আনমনে হেঁটে বেড়াচ্ছে কয়েকটি মুরগি। ভেড়ার ঘরটি কবরের মতো নিঝুম। শীতের প্রকোপে অসুখ বেড়ে যাওয়ায় ভেড়াগুলোকে এক ব্যাপারীর হাতে গছিয়ে দেওয়া হয়েছে সস্তায়। দাদাজি এক কাপ লবণ-চা খেয়ে রেডিওর নব ঘোরাতে ঘোরাতে বেশ আগেই চলে গেছেন দোকানে। রান্নাঘরে বাসনকোসনের টুংটাং শব্দ জানান দিচ্ছে মায়ের কর্মতৎপর উপস্থিতি। কম্বলমোড়া বাবা কাচের জানালার সামনে বসে পড়ছেন বই। রায়হান ঘুমে। আদনান স্কুলের পড়া দেখছে। তুষারপাত বন্ধ হওয়ায় গেল সপ্তাহ থেকে স্কুল খুলে গেছে সবার। ভোর থাকতেই রান্নাঘরে তাই মসলার গন্ধ।

পড়ায় মন বসছে না আদনানের। আব্বুজির কাছ থেকে শোনা ইতিহাসের গল্প ওকে হঠাৎ করেই যেন বড় করে তুলেছে। কী হবে এত পড়াশোনা দিয়ে! এত দিনে ও বুঝে গেছে, পড়াশোনা একটি পরাধীন জাতিকে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় নিয়ে যেতে পারে না। শিক্ষারও আগে চাই স্বাধীনতা। এই উপত্যকার পথে-প্রান্তে ও অসংখ্য যুবককে ঘুরে বেড়াতে দেখে, যাদের সম্মানজনক জীবিকা নেই। কৃষিকাজ, পশুপালন, খুদে ব্যবসা, দোকানদারি, অস্থায়ী পর্যটনশিল্পের সাথে জড়িত মৌসুমি কর্মের বাইরে সম্মানজনক এবং নিরাপদ কোনো পেশা তাদের ভাগ্যে জোটে না। বিত্তবানদের সন্তান, যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে দেশের বিভিন্ন শহরে, এমনকি বিদেশে যায়, তারাই শুধু আকর্ষণীয় চাকরির সুযোগ পায়। আদনান মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কাশ্মীর ছেড়ে কোথাও যাবে না সে। চকচকে দুটো

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পয়সার আশায় ভারতীয় শোষকের প্রত্যক্ষ গোলামি করবার জন্য ও মাতৃভূমি ত্যাগ করতে পারে না।

বইয়ের পাতা থেকে জানালায় চোখ রাখলে বাইরের ছোট্ট একটি দৃশ্য রোমাঞ্চিত করে আদনানকে। এই সাতসকালে, কনকনে শীতের ভেতর নূরজাহান ও মারিয়াম ঠিলা হাতে ঝরনার পানি আনতে যাচ্ছে। দুজনের গায়েই পিরহান। হিজাবে ঢাকা মাথা। ছন্দবদ্ধ পদক্ষেপ। কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে খলবল করে হাসছে ওরা। ওদের ওই হাসিতে অংশ নিতেই কি না কে জানে, মেঘের ছায়া সরে কঙ্কর বিছানো রাস্তায় আচমকা সূর্যের আলো গড়িয়ে পড়ে। সূর্যের নবীন আলোয় দুই কিশোরীকে মনে হয় জাফরান ফুলের কুঁড়ি, ফোটার জন্য যা হয়ে আছে উন্মুখ। আদনান বই রেখে বাইরে চলে আসে। দৌড়ের ওপর ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মারিয়ামের চোখে চোখ রেখে বলে, আমি থাকতে তোমাদের পানি আনার কষ্ট করতে হবে না। বলেই ও নূরজাহানের হাত থেকে ঠিলাটা নিয়ে নেয়।

নূরজাহান বলে, তাহলে তুমি পানি আনো। আমরা গেলাম।

গেলাম মানে! সেধে উপকার করতে আসছি দেখে পুরাটাই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিবি! না, তোদেরও যেতে হবে সাথে। দূরের পথ। একা ভালো লাগবে না।

আম্মুজির পাশে একজনকে থাকতে হবে। রান্নার অনেক কাজ। নূরজাহান আপত্তি জানায়।

মারিয়াম বলে, নূরী, তুমি নাহয় ভাইয়াজির সঙ্গে যাও। আমি খালাজির কাছে থাকছি।

না। তুমিই বরং যাও। তুমি সঙ্গে থাকলে ভাইয়া কাজে উৎসাহ পাবে। বলেই একটু সরে গিয়ে চোখ উল্টিয়ে আদনানের দিকে তাকায় নূরজাহান। ওর উদ্দেশ্য আদনানকে খেপিয়ে তোলা। আদনান সত্যি সত্যি খেপে যায়। ও তেড়ে যায় নূরজাহানকে মারতে। আর নূরজাহান বাতাসে হিজাব উড়িয়ে বাড়ির দিকে দেয় দৌড়। একটুক্ষণ পর মারিয়ামের দিকে ফিরে আদনান বিব্রত কণ্ঠে বলে, দেখলে তো, কত বড় বাঁদর! সুযোগ বুঝে পালাল। এখন তোমাকেই যেতে হবে।

আশপাশের বাড়িগুলো কেমন ঝিম মেরে আছে। কাচের বন্ধ জানালার মতোই চুপচাপ প্রকৃতি। রাস্তার দুধারের সবুজ ঘাসের ডগায় জমে আছে বিন্দু বিন্দু শিশির। মারিয়ামের ইচ্ছা করে আঙুল ছুঁইয়ে সবগুলো বিন্দু ফাটিয়ে দিতে। ওর ধারণা— এতে ওর আঙুল লাভ করবে স্বর্গসুখ।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পাশের বাড়ির ফটক থেকে গাভির রশি হাতে তারিক যখন বের হয়, পতন ঘটে নৈঃশব্দ্যের এবং মারিয়ামের ইচ্ছারও। তারিক গরু রাখতে যাচ্ছে চারণভূমিতে। আদনান ভ্রুতে গিঁট ফেলে বলে, তোদের গরুর পেট এত মোটা হলো কবে?

গরুর পেটে বাচ্চা, তাই পেট মোটা। হাসতে হাসতে বলে তারিক।

বাচ্চার নাম কিছু ঠিক করেছিস?

ভাবছি লালু রাখব।

কালো বাছুর হলেও লালু রাখবি? খোঁচা দেয় আদনান।

তারিক দৃঢ়তার সাথে বলে, আমাদের গাভির বাছুর লালই হবে।

খেলার মাঠ পর্যন্ত ওরা একসাথে চলল। খেলার মাঠের পাশে সবুজ টিলায় গরু বেঁধে ফিরে গেল তারিক। আদনানদের গন্তব্য আরো দূরে। পর্বতের উল্টো পাশে তরুণীর চোখের জলের মতো নালা থেকে নেমে আসা নীল পানির ঝরনা ওদের গন্তব্য। টিলা ছেড়ে ওরা রাস্তায় উঠল। উঁচু-নিচু টিলা ভাঙার চেয়ে দূর হলেও সমতল রাস্তায় চলা সহজ। মসজিদ ছাড়িয়ে, আপেলবাগান মাড়িয়ে, জাবের চাচার দোকান পেরিয়ে ওরা চলল ঝরনার কাছে। ততক্ষণে ভোরের মগ্নতা ভেঙে গেছে। পাশের মহল্লার কয়েকটি শিশুকে ওরা কোরআন শিখতে মসজিদে যেতে দেখল। ইমাম সাহেব বহুদিন ধরে চালু রেখেছেন ভোরের মক্তব। রঙিন শৈশবে দাদাজির উদ্যোগে এখানেই কোরআন পড়া শিখেছিল আদনান। মায়ের কোলের পর এই মক্তব ওর প্রথম পাঠশালা। বাচ্চাগুলো যখন একসাথে সুর করে সালাম দিল, আদনানের সামনে থেকে ঘোমটা সরাল ওর মায়াবী শৈশব। টুপি-পাঞ্জাবিতে সাজিয়ে আম্মুজি ওকে এই বাচ্চাগুলোর মতোই ভোরের মক্তবে পাঠাতেন। এমন মায়াময় ছিল সেই দিন, সাধ্য থাকলে মখমলি সেই দিনগুলো সময়ের বালুঘড়িতে বেঁধে রাখত আদনান।

হিজাবের নিচ দিয়ে ঈষৎ কোঁকড়ানো লালচে চুলের একটি গোছা মারিয়ামের কপালে নেমে এসেছিল। সেদিকে তাকিয়ে আদনান বলল, হিজাব পরলে তোমাকে বাচ্চা বাচ্চা লাগে। একটা কায়দা ধরিয়ে দিলে তুমিও ওই শিশুগুলোর মতো মক্তবে যেতে পারবে। হাসতে লাগল আদনান।

মারিয়াম প্রতিবাদ জানাল। কটমট করে তাকিয়ে বলল, আমি বাচ্চা মেয়ে নই। যে মেয়েটা এবার এইটে উঠল, তাকে বাচ্চা বলা অন্যায়। তা ছাড়া আমি কোরআন পড়তে পারি। কায়দা বুকে নিয়ে মক্তবে যাব কোন দুঃখে!

কোরআন পড়তে পারো? তাহলে শোনাও তো একটা সুরা!

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আমি আমার আল্লাহ ও নবীজিকে শোনানোর জন্য কোরআন শিখেছি, তোমার জন্য নয়। মারিয়াম মুখ বাঁকিয়ে হাসল।

ফেরার পথে বেলালদের আপেলবাগান, জাবের চাচার মুদিদোকান, মসজিদ ও খেলার মাঠ ছাড়িয়ে ওরা যখন গুরিহাকার প্রধান রাস্তায় উঠল, তখনই অনুভব করল কিছু একটা ঘটতে চলেছে গ্রামে। দূর থেকে ভেসে আসছে চিৎকার-চেঁচামেচি এবং হট্টগোলের শব্দ। কোথাও যেন একত্র হয়েছে অনেকগুলো মানুষ। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ছে ইথারে ইথারে। এই সকালবেলা আবার কী ঘটল গুরিহাকায়! আদনানের কৌতূহলী পা থমকে দাঁড়াল। কাউসারদের মহল্লায় কি মারামারি লেগেছে? আরেকটু কাছে আসতেই উচ্চারিত শব্দগুলোকে সুছন্দিত এবং পরিপাটি স্লোগানের মতো মনে হলো। কপালে কুঞ্চন তুলে আদনান তাকাল মারিয়ামের দিকে। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, মিছিল!

আদনানের উত্তেজনা স্পর্শ করল মারিয়ামকেও— কিসের মিছিল?

এদিকেই আসছে। কাছে এলেই বোঝা যাবে। আদনান পানির ঠিলাটা মাথা থেকে নামিয়ে তাকিয়ে রইল পথের শেষ বিন্দুতে, যেদিক থেকে আসছে স্লোগান।

আদনান ও মারিয়াম যখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে কাঙ্ক্ষিত মিছিলটির জন্য, ততক্ষণে বহু দূরের দিল্লির তিহার জেলখানায় বিচারিক ফাঁসির নামে হত্যা করা হয়েছে কাশ্মীরের মুক্তিসংগ্রামের মহান নেতা মকবুল ভাটকে। তার লাশের অস্তিত্ব যেন উপত্যকায় কোনো গোলযোগ সৃষ্টি না করে এবং তার কবর যেন কাশ্মীরি যুবকদের অনুপ্রেরণা উৎস হতে না পারে, এ কারণে তার লাশ পর্যন্ত হস্তান্তর করা হয়নি পরিবারের কাছে। ভারতের প্রশাসন আজাদির জন্য প্রাণ দেওয়া মকবুল ভাটকে কবরস্থ করেছে জেলখানার ভেতরেই। এ জন্যই কি আজকের সকালটা মেঘাচ্ছন্ন?

মকবুল ভাটের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না; মকবুল ভাটের কবরে, আজাদির পুষ্প ঝরে— এ-জাতীয় স্লোগান যত নিকটবর্তী হয়, আদনান ততই আচ্ছন্ন হয় মকবুল ভাটের স্মৃতিতে। একটা সময় প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে ছাপা হতো মকবুল ভাটের খবর ও ছবি। মানুষটা জন্মেছিলেন কুপওয়ারা জেলার ত্রিগাম গাঁয়ে, ১৯৩৮ সালে, কৃষক পরিবারে। ১৯৫৩ সালে নেহরু সরকার শেখ আবদুল্লাহকে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় গ্রেপ্তার করলে তার সমর্থকেরা 'গণভোট ফ্রন্ট' গঠন করেন। মকবুল ভাট ছিলেন এই সংগঠনের নিবেদিত কর্মী। ১৯৫৮ সালে তিনি উচ্চশিক্ষা এবং রাজনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে চলে যান। গণভোটের প্রশ্নে ভারত এবং

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পাকিস্তানের কাছ থেকে বারবার প্রতারিত হওয়ার পরও তখন পর্যন্ত কাশ্মীরিরা আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আজাদির স্বপ্ন বুকে ধারণ করে দিন গুজরান করছিল। তারা ভাবছিল, অচিরেই সুদিন আসবে। শিগগিরই গোলামির শিকল তাদের কণ্ঠ থেকে অপসারিত হবে। মকবুল ভাটও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। গণভোটের আশার পিদিম তখনো টিমটিম করে জ্বলছিল তার বুকে। আর এ কারণেই, আজাদ কাশ্মীরে গিয়ে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ পথ গ্রহণ করেন এবং সেখানকার গণভোট ফ্রন্টের সভাপতি নিযুক্ত হন। কিন্তু দিন যত অতিবাহিত হয়, ভারতীয়দের জুলুম-নিপীড়ন-সামরিকায়ন আর প্রতারণার ঘায়ে আস্থা ও ভরসার ফুল ক্রমেই ঝরে পড়তে থাকে। কালক্রমে এই অবিশ্বাস এবং হতাশা থেকে মকবুল ভাট প্রতিষ্ঠা করেন জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট নামে এক সশস্ত্র সংগঠন, সংক্ষেপে যাকে বলে জেকেএলএফ। রক্তের আস্তিনে আজাদির সৌধ নির্মাণের স্বপ্ন এই সংগঠনটির, আর তাই এই সংগঠনে যুক্ত হতে হলে তাকে অঙ্গীকারনামা রচনা করতে হয় রক্তের অক্ষরে। প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বছরে, অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে কাশ্মীরে এক ভারতীয় নিরাপত্তাকর্মী নিহত হলে তার দায় চাপানো হয় মকবুল ভাটের ওপর। তখনো তিনি আজাদ কাশ্মীরে। সে বছর দেশে প্রবেশের প্রাক্কালে নিরাপত্তারক্ষীর হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করে ভারত প্রশাসন। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু রায় কার্যকরের আগেই তিনি বাজিকরের মতো জেল থেকে উধাও হয়ে যান এবং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেদ করে তিনি পাড়ি জমান পাকিস্তানে। জেল থেকে পালানো এবং নিরাপত্তারক্ষীদের বোকা বানানোর ঘটনা গোটা কাশ্মীরে তাকে বিপুল জনপ্রিয় করে তোলে। ক্রমে তিনি কাশ্মীরিদের হৃদয়ে কিংবদন্তিতুল্য নেতা হয়ে ওঠেন। কাশ্মীরিরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে— মকবুল ভাটের মাধ্যমেই তারা পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে সক্ষম হবে।

১৯৭৬ সালে তিনি আবার ফিরে আসেন কাশ্মীরে। তার এবারের আগমনের উদ্দেশ্য একটি গেরিলা দল গঠন করে আজাদির জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করা। কিন্তু দুর্ভাগ্য মকবুল ভাটের, এবারও তিনি গ্রেপ্তার হন ভারতীয় বাহিনীর হাতে এবং এবার আর তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হননি। দশ বছর আগের সেই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে তার বিচার শুরু হয় এবং আদালত তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখে। ১৯৮৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তার ফাঁসির দিন ধার্য করা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং মানবাধিকার সংগঠন ভারত সরকারকে দণ্ডাদেশ থেকে সরে আসার অনুরোধ জানায়। কিন্তু ৯ ফেব্রুয়ারি ভারতের রাষ্ট্রপতি সকল আবেদন নাকচ করে দেন। জলের বুকে জলফড়িঙের মৃদু

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বুদ্‌বুদ তোলার জন্য যে জন্ম হয়নি জেকেএলএফের, বরং ভারত সরকারের সিংহাসনে কাঁপন ধরাবার জন্য যে তার জন্ম, তার প্রথম নজির বিশ্ববাসীর কাছে দৃশ্যমান হয় মকবুল ভাটের মৃত্যুদণ্ডের ছয় দিন আগে। প্রত্যেক নামাজ শেষে কাশ্মীরের ঘরে ঘরে যখন মকবুল ভাটের মুক্তির জন্য প্রার্থনা চলছে, ঠিক সেই সময় ইংল্যান্ডে তার দুর্ধর্ষ সহযোদ্ধারা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা ইংল্যান্ডে অবস্থানরত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার রবীন্দ্র মিত্রকে বার্মিংহাম থেকে কিডন্যাপ করে এবং ভারত সরকারের কাছে চরমপত্র প্রেরণ করে— মকবুল ভাটকে মুক্তি না দিলে মেরে ফেলা হবে রবীন্দ্র মিত্রকে। কিন্তু ভারত সরকারের কাছে তখন রবীন্দ্র মিত্রের জীবনের চেয়ে মকবুল ভাটের মৃত্যু বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভারত সরকার মকবুল ভাটকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করে। ভাটের সহযোদ্ধারা বাধ্য হয়ে হত্যা করে রবীন্দ্র মিত্রকে, লিসেস্টারের নিকটবর্তী এক গভীর অরণ্যে, ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখ সকালে। ব্রিটিশ গণমাধ্যম ফলাও করে প্রচার করে এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ এবং তারা আশঙ্কা ব্যক্ত করে— জম্মু-কাশ্মীরের রাজনীতিতে এক সুগভীর প্রভাব ফেলতে যাচ্ছে মকবুল ভাটের সংগঠন জেকেএলএফ।

মিছিল এগিয়ে এলে একমুহূর্তের জন্য মারিয়ামের সঙ্গ বিস্মৃত হয় আদনান। ছয় দিন আগে রবীন্দ্র মিত্র হত্যাকাণ্ডের সেই তুমুল উত্তেজক খবর দাদাজির পাশে বসে রেডিওতে শুনেছিল ও। ওর কানে এখনো বেজে চলেছে সংবাদ পাঠকের শঙ্কিত সেই কণ্ঠ— জম্মু-কাশ্মীরের রাজনীতিতে এক সুগভীর প্রভাব ফেলতে যাচ্ছে মকবুল ভাটের সংগঠন জেকেএলএফ। আনমনা হয় আদনান। ওদের এই ভাগ্যহত জনপদ যে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে একটি রক্তাক্ত নদীর দিকে, ভবিতব্যের শিলালিপিতে ও কি দেখতে পায় সেই দিন?

মিছিল ওর সমুখে ধুলোর ঘূর্ণি ওড়ালে ও নিশ্চিন্ত হয়, গেল রাতে শহীদ করা হয়েছে মকবুল ভাটকে এবং তার লাশ হস্তান্তর করা হয়নি কাশ্মীরিদের হাতে। ওর রক্তে তখন ক্রোধের তুফান ছোটে। ওর সমুখে দৃশ্যমান হয় এক নিরীহ সাদা দেয়াল, ছোপ ছোপ রক্তে যে দেয়াল পরক্ষণে রঙিন। ও ভুলে যায় ওর অস্তিত্বের সংলাপ। ও ভুলে যায় মারিয়ামকে। ও ভুলে যায় বইয়ের পাতা সরিয়ে এই শীতসকালে ও কেন উঠে এসেছিল বাইরে। পানির ঠিলা এবং মারিয়ামকে পথের মাঝে ছেড়ে দিয়ে ও শামিল হয় মিছিলে। ওর তরুণ কণ্ঠ শত কণ্ঠের সাথে মিলিত হয়ে প্রকম্পিত করে উপত্যকার বাতাস। ওর মুষ্টিবদ্ধ হাত অনেকগুলো হাতের সাথে যুক্ত হয়ে পরিণত হয় আগুনের মশালে। মশাল হয়ে ওঠা আদনানের ওই শাণিত হাত অনেকক্ষণ চোখে লেগে থাকে মারিয়ামের। যখন ঘোর ভাঙে ওর, মিছিল ওকে একলা ফেলে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

চলে গেছে অনেক দূরে। ও চোখ রগড়ে দেখে, মিছিলের প্রলম্বিত লেজটি গুরিহাকার প্রধান রাস্তা ছাড়িয়ে রাহাপোরা বাজারের দিকে মোড় নিচ্ছে। আদনানের জন্য হঠাৎ বিপন্ন বোধ করে মারিয়াম। এই মিছিলের গন্তব্য কোথায়? কখন ফিরবে আদনান? অনিশ্চিত শঙ্কার মেঘ যখন মারিয়ামের সারা মুখে লেপ্টে থাকে, ঠিক তখন দৃশ্যপটে হাজির হয় রায়হান। পথের মাঝে পানির ঠিলা নিয়ে মারিয়ামকে খাবি খেতে দেখে ভ্রু কুঁচকে যায় ওর। ও অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, মারিয়াম, তুমি এখানে? একলা পানি আনতে গিয়েছিলে?

আদনান ভাইয়াজির সাথে গিয়েছিলাম। ধাতস্থ হয়ে জবাব দেয় মারিয়াম।

কোথায় সে?

মিছিলে গেছে।

মিছিল! কিসের মিছিল!

মকবুল ভাটের ফাঁসি হয়ে গেছে। তারই প্রতিবাদে মিছিল। খাদে নামা কণ্ঠে বলে মারিয়াম। ও ভেবেছিল ফাঁসির সংবাদ ব্যথিত করবে রায়হানকে। মিছিলে শামিল হতে না পারার আক্ষেপে অস্থির হয়ে উঠবে। কিন্তু মকবুল ভাটের মৃত্যু রায়হানকে স্পর্শ করে বলে মনে হয় না। বরং ও তখন ব্যস্ত মারিয়ামকে নিয়ে। শ্লেষ মিশিয়ে ও বলে, তোমাকে ফেলে রেখে আদনান মিছিলে চলে গেল! কাণ্ডজ্ঞান দেখেছ ওর? তোমার যদি কিছু হয়ে যেত! জানি, তারপরও তুমি ওর সাথেই ঘুরবে। তোমার জন্য আফসোস। এবার বাড়িতে চলো। রায়হান মারিয়ামের হাত ধরতে যায়। কিন্তু মারিয়াম আলগোছে নিজের হাতাখানা টেনে নেয় ওড়নার ভেতর।

তুমি আমাকে এড়িয়ে চলো কেন? শক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে রায়হান।

কোথায় এড়িয়ে চললাম?

এই যে হাত ধরতে দিলে না!

যারা দুর্বল কিংবা বৃদ্ধ, একাকী পথ চলতে পারে না, তাদের হাত ধরুন। আমি বৃদ্ধ কিংবা দুর্বল নই। আমি একাকী পথ চলতে সক্ষম।

আমাকে অপমান করছ?

সাধারণ এক সত্য কথা বললাম। এই সামান্য কথায় কেউ অপমানিত হলে তো আমার কিছু করার নেই।

রায়হান আর দাঁড়ায় না। মারিয়ামকে একলা ফেলে সাপের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে সে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। বাড়িতে এসেও বন্ধ হয় না তার বিষ উদ্গিরণ। সে প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদাভাবে আদনানের বিরুদ্ধে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কুৎসা গাইতে থাকে। অথচ বাড়ির সকলের তখন মনখারাপ। বিষণ্নতায় মা ভাত পুড়িয়ে ফেলেছেন। বাবা অস্থির পায়চারি করছেন বাড়ির আঙিনায়। দাদাজি সংবাদ শোনার সাথে সাথে দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে দিয়েছেন। এমন দিনে কোনো কিছুই স্বাভাবিক চলতে পারে না। আজ শোকের দিন। আজ প্রতিবাদের দিন। আজ বন্ধের দিন। তাই তো সবার আগে দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে ফেলা দাদাজির। শুধু দাদাজি কেন, এদিন পুরো উপত্যকাজুড়েই স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধ্ পালিত হলো। শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করল। ড্রাইভাররা বন্ধ রাখল গাড়ির চাকা। বাবা স্কুলে গেলেন না। মোড়ের একমাত্র বেকারির চুলায় জ্বলল না আগুন। কেবল উত্তপ্ত আলোচনার জন্য খোলা রাখা হলো চায়ের দোকান। এত কিছুর পরও যখন নামল না রায়হানের জিঘাংসার ফণা, বাবা ধমক মেরে স্তব্ধ করে দিলেন তাকে। বললেন, এই শোকের দিনে তোমার ভাই মিছিলে গেছে আর তুমি তার বিরুদ্ধে কুৎসা গাইছ। কাপুরুষ কোথাকার!

বাবার ধমক খেয়ে রায়হানের মুখে অন্ধকার নামলেও এ বাড়ির আরেকটি মুখে খেলে গেল খুশির উদ্ভাস। সেই মুখ মারিয়ামের। মনে মনে ও অসংখ্যবার ধন্যবাদ দিল খালুজানকে। পরক্ষণে ওর মনে পড়ল আদনানের কথা। সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চলল, অথচ এখনো ফিরছে না আদনান। একটি মিছিলের ফিরে আসতে কি এত সময় লাগে! মনের অস্থিরতা লুকাতে না পেরে ও ছুটে গেল দাদাজি কাছে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, দাদাজি, আদনান ভাইয়াজি তো এখনো এল না!

এবার আদনানের না-ফেরার শঙ্কা স্পর্শ করল দাদাজিকেও। তিনিও মারিয়ামের মতোই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করলেন— আর কিছুক্ষণ দেখি। না হলে খুঁজতে বের হব।

রায়হান বাদে সকলে জড়ো হলো বাবার ঘরে। প্রত্যেকের থমথমে মুখের দিকে চেয়ে মনে হলো, এই বাড়ির কেউ মারা গেছে অথবা কারো মৃত্যুর জন্য সকলে অপেক্ষা করছে। শোকতপ্ত মানুষগুলোকে উষ্ণ রাখতে নূরজাহান কেটলি ভরে চা করে আনল। চায়ের প্রতি এ বাড়ির প্রত্যেকের দুর্নিবার আকর্ষণ থাকলেও আজ আর কেউ চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়ানোর আগ্রহ পেল না। নূরজাহান একটু পরপর চোরাচোখে তাকাতে লাগল মারিয়ামের দিকে। মারিয়ামের চেহারার দুর্বোধ্য শিলালিপির পাঠোদ্ধার তার উদ্দেশ। ওর চেহারায় ফুটে থাকা বেচাইন যে অবস্থা, তা এক ভাইয়ের প্রতি বোনের চিরায়ত দুর্ভাবনার মতো নয়। এই দুর্ভাবনাকে ঠিক কী বলে, জানে না নূরজাহান। নূরজাহানের এই সব বিক্ষিপ্ত ভাবনার মাঝে হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে মারিয়াম— হায়! আমি যদি তাকে বাধা দিতাম!

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

মসজিদে জোহরের আজান হলে বেরিয়ে পড়েন দাদাজি। অন্য দিন যে সময় তিনি মসজিদে যান নামাজ পড়তে, আজ তাকে সে সময় নাতির খোঁজে বেরোতে হয়। মোড়ের চায়ের দোকানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, গুরিহাকা থেকে যে মিছিলটি রাহাপোরা বাজারের দিকে গিয়েছিল, অনেক আগেই সেটি ফিরে এসেছে। দাদাজি এতক্ষণ দুশ্চিন্তা করলেও সেই দুশ্চিন্তার গভীরতা ছিল শিশনাগ খালের মতো নাব্যতাহীন; কিন্তু এবার, নাতিকে রেখে মিছিলের ফিরে আসার পরিপ্রেক্ষিত তার বুকের ভেতর লিডার নদীর তুফান ছোটায়। দোকানদার হজরত উল্লাহর কাছ থেকে সাইকেল চেয়ে নিয়ে তিনি রাহাপোরা বাজারের দিকে প্যাডেল মারতে শুরু করেন।

ফুরিয়ে আসা বিকেলে জায়নামাজে বসে দোয়া করছিল মারিয়াম। কান্নার গমকে ফুলে ফুলে উঠছিল ওর পিঠ। চোখ মুছতে মুছতে নূরজাহান কয়েকবার ঘুরে গেছে এ ঘর থেকে। মারিয়ামের কান্নাভেজা মোনাজাত তবু শেষ হয়নি। খাবার ঘরের মাদুর নিঃশব্দে পড়ে ছিল একাকী। এ বাড়ির হাঁড়িতে আজ দুপুরের খাবার চড়েনি। মকবুল ভাটের জন্য প্রথমত সবার মন খারাপ ছিল। সেই খারাপ করা মন এখন আদনানের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বিকেলে দাদাজি ফিরে এলেন শুকনো মুখে। কোনো ভালো খবর তিনি বয়ে আনতে পারেননি। ফয়জুল্লাহ ছেলের সকল বন্ধুর বাড়ি খোঁজ নিয়েছেন। বন্ধুদের বাড়িতেও নেই আদনান। নাজনীন এবার বিপন্ন গলায় চিৎকার করে উঠলেন— তোমরা পুলিশকে কেন জানাচ্ছ না!

সন্ধ্যায় ফয়জুল্লাহ যখন পুলিশের কাছে যাবেন বলে ভাবছিলেন, তখন বিধ্বস্ত চেহারায় ফিরে এল আদনান। অনেক বছর পর বিনা নোটিশে প্রবাসী সন্তান ঘরে ফিরলে যেমন আনন্দ হয়, আদনানকে ঘিরে তেমন ভেজা চোখের আনন্দ শুরু হলো এই পরিবারটির মধ্যে। শুধু মারিয়ামের গোলাপি গালে অনিরুদ্ধ অভিমান পিছলে পড়তে লাগল। তার একটাই আক্ষেপ— দেরি হবে যখন, তখন মারিয়ামকে কেন বলে গেল না সে! আর তাই সবাই যখন আদনানকে ঘিরে মিছিলের বৃত্তান্ত শুনতে ব্যস্ত, মারিয়াম তখন পাশের ঘরের দরজা ধরে ফোঁপাচ্ছে। সামনের বছর স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বসবে আদনান। এই বয়সী ছেলেরা মেয়েদের অভিমানের ভাষা বোঝে না। খেলাধুলা, হইহুল্লোড় কিংবা অ্যাডভেঞ্চার তাদের যতটা প্রিয়, ততটা প্রিয় নয় মেয়েদের ব্যাকুল চাহনি। তাই তো মারিয়ামের গোলাপি গালে জমে থাকা থোকা থোকা অভিমানের সহজ ধারাপাত বুঝতে ব্যর্থ হলো আদনান। যার ফল হলো আরো ভয়ংকর। যার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় জায়নামাজে চোখের জল ফেলছিল মারিয়াম, সেই ছেলেটি যখন ফিরল, নিরাপদেই ফিরল, মেয়েটি

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তখন তার সঙ্গে কথাই বলল না। যে ছেলে ওর চোখের জলের নিবেদন বোঝে না, তার সঙ্গে কথা থাকতে পারে না মারিয়ামের।

ঝিলাম নদীর মতো দীর্ঘ সেই রাত্রি শেষে ভোরের আলো ফুটলে মারিয়াম আর নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারল না। ফজরের নামাজের পর ও ধীরপায়ে প্রবেশ করল আদনানের কক্ষে। গতকালের ধকলে এখনো কাবু আদনান। আর তাই নামাজ শেষে আরেকটু ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল ও। এমন সময় মারিয়াম গিয়ে দাঁড়াল ওর বিছানার পাশে।

কিছু বলবে? কম্বলে অর্ধেক ঢাকা আদনানের মুখ।

একটু সময় নিয়ে ফোলা গালে মারিয়াম বলল, কাল মিছিল থেকে ফিরতে অত দেরি হলো কেন? আমার খুব ভয় হচ্ছিল।

আদনানের হঠাৎ খেয়াল হলো, গতকাল পরিবার এবং পাড়া-পড়শিদের সকলে যখন ঘিরে ধরেছিল ওকে, মিছিলের বৃত্তান্ত শুনবার উদ্দেশে, সেই ভিড়ে মারিয়াম ছিল না। রাতের খাবার দস্তরখানে সবাই যখন কথা বলছিল মকবুল ভাট ও মিছিল বিষয়ে, তখনো মারিয়াম ছিল চুপচাপ। আদনান এবার সতর্ক হয়ে উঠল। নিশ্চয় কোনো কারণে মন খারাপ করেছে মারিয়াম। ও কম্বল ঠেলে খাটের রেলিংয়ে পিঠ ঠেকিয়ে বসল। মারিয়ামকেও আহ্বান করল বসতে। একটু দূরত্ব বজায় রেখে মারিয়াম যখন নিঃশব্দে বসল বিছানায়, আদনান নিচু স্বরে বলল, তোমার কি মনখারাপ?

মারিয়ামের হঠাৎ কী যে হলো, ফুঁপিয়ে 'না' শব্দটি উচ্চারণ করেই ও ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। আদনান হতভম্ব হয়ে বসে রইল বিছানায়। বুঝল, তার অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটে গেছে। কিন্তু কী ঘটেছে, ধরতে পারল না।

শিক্ষার্থীরা আজও ক্লাস বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে। আর তাই নাজনীনের রান্নাঘর সূর্য ওঠার পরও নিঝুম। ছেলেমেয়েরা আজ ঘরে থাকবে, ফলে, ভোরের এই উষ্ণ আরামটুকু শরীরকে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারেননি তিনি। নয়তো রান্নার ফাঁকে বোনের মেয়ের এই অস্বাভাবিক আচরণ তার চোখে পড়ত নিশ্চয়।

বেশ বেলা করে সকালের খাওয়া সম্পন্ন হলে আদনান ঘুরঘুর করছিল মারিয়ামের আশপাশে। কী হয়েছে মারিয়ামের— সরাসরি জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিল ও। বাড়িভরতি মানুষ। সবার সামনে ভোরের মতো আবার যদি কোনো কাণ্ড করে বসে! আদনান সুযোগের অপেক্ষায় রইল। সুযোগ পাওয়া গেল দুপুরের আগে, অজিতদের বাড়ি থেকে ফেরার সময়। আদনান নিরাপদে বেঁচে ফিরেছে, সেই খুশিতে নাজনীন পায়েস রান্না করেছিলেন। বাটিভরতি

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পায়েসের একটা ভাগ অজিতদের দিতে গিয়েছিল আদনান। ফেরার সময় ও দেখল, মারিয়াম কাঠবাদামগাছের নিচে মুরগির সামনে চুপচাপ চাল ছিটাচ্ছে। আদনান ওর সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে তোমার?

কিছু না। নীরস গলায় বলল মারিয়াম।

কিছু একটা যে হয়েছে, তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

মিছিল থেকে ফিরলে কেন! না ফিরলেই খুশি হতাম। মারিয়ামের চোখে টলমল করে উঠল অভিমানের অশ্রু।

মারিয়ামের চোখের জলে ধাক্কা খেল আদনান। মেয়েটির অভিমানের জায়গাটা এবার আবিষ্কার করতে পারল ও। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হাসতে হাসতে ও বলল, এটা কি তোমার মনের কথা?

আদনানের এই হাসি কাল হলো ওর জন্য। মারিয়াম এবার মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, মনের এবং মুখের দুটোরই কথা। হাতের অবশিষ্ট চাল ছড়িয়ে দিয়ে থপথপ পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল মারিয়াম।

আদনান ওর পিছু পিছু এসে বলল, কিন্তু তোমার চেহারা ভিন্ন কথা বলছে। আদনানের ঠোঁটে এখনো লেগে আছে আগের সেই রসিকতার হাসি।

ভেতরের তোলপাড় আর গুটিয়ে রাখতে পারল না মারিয়াম। ও অভিমানকাতর কণ্ঠে বলল, আবার যদি মিছিলে যাও, ফিরে এসে আমাকে পাবে না বলে দিলাম। আমি আর আমার আল্লাহ জানেন— কাল থেকে কতবার দোয়া করেছি তোমার জন্য। ধরে এল মারিয়মের কণ্ঠ। ঈগলডানার মতো ওর জোড়া ভ্রু কাঁপতে লাগল থরথর করে।

আদনানের মিছিল বিষয়ে মারিয়াম যে কতটা উৎকণ্ঠিত, এক্ষণে অনুভব করতে পারল আদনান। ও লজ্জিত কণ্ঠে বলল, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তোমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলার জন্য আমি দুঃখিত, মারিয়াম। তোমার দোয়া আমার সঙ্গে আছে, এ তো আমার সৌভাগ্য। তবে সত্যি বলতে, মিছিল যদি আবার আমাকে ডাকে, আমি ঘরে থাকতে পারব না। আমার এ অক্ষমতাটুকু ক্ষমা করতে হবে।

আমাকে নিয়ে গেলেই তো পারতে! পানির ঠিলাসহ আমাকে ফেলে রেখে দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলের মতো চলে গেছ তুমি।

তুমি মিছিলের ধকল নিতে পারতে না। তা ছাড়া মকবুল ভাটের ফাঁসি, মিছিলের বারুদ আমার চিন্তাশক্তিকে ভোঁতা বানিয়ে দিয়েছিল। আমি অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না ভেবেই জুটে গিয়েছিলাম ওদের দলে।

এত দেরি হলো কেন ফিরতে?

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

রাহাপোরা বাজার থেকে অন্য মিছিলের সাথে পেহেলগাম চলে গিয়েছিলাম।

আল্লাহর দোহাই, এরপর কোথাও গেলে আমাকে বলে যেয়ো।

আমার জন্য তুমি এমন পেরেশান হবে জানলে দ্রুতই ফিরে আসতাম।

এরপর কয়েকটা দিন মকবুল ভাটের জন্য গোটা উপত্যকা মন খারাপ করে রইল। আদনানের মনও হয়ে রইল বিষণ্ন। তবু ওই বিষণ্ন মনের এক পাশে একটি চঞ্চল চড়ুই ওড়াউড়ি করতে লাগল সারাক্ষণ। কারণে-অকারণে একটি মেয়ে যদি কোনো এক ছেলের জন্য পেরেশান হয়, ছেলেটির নিরাপত্তা কামনায় মেয়েটি যদি জায়নামাজে অশ্রুবিসর্জন দেয়, কোথাও যেতে হলে মেয়েটি যদি তাকে জানিয়ে যাওয়ার অধিকার খাটায়, তবে ছেলেটির মনের অবস্থা কী হয়, জানা ছিল না আদনানের। কিন্তু আজ মারিয়ামের সাথে কথোপকথনের পর ওর সামনে নতুন পৃথিবীর দুয়ার খুলে গেছে; খুব কাছে থেকেও এত দিন যে দুয়ার ছিল বন্ধ। মারিয়াম ওর জন্য দুশ্চিন্তা করে, মারিয়াম ওর জন্য অশ্রুসিক্ত হয়, মারিয়াম ওর জন্য অভিমানে গোলাপি হয়ে ওঠে, ব্যাপারটা ভাবতেই এক অনাঘ্রাত ফুলের সুবাসে বুক অবশ হয়ে আসে। মারিয়ামকে মনে হয় রূপকথার সেই রাজকুমারী, রাজপুত্র আর যার মাঝে কাচের দেয়াল তুলে রেখেছিল কোনো এক দুষ্ট দৈত্য। দেয়ালের এপাশ থেকে রাজকুমারীকে দেখাই যায় শুধু, স্পর্শ করা যায় না, কথাও বলা যায় না। মিছিলের ঘটনা অদৃশ্য সেই কাচের দেয়ালকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। রাজকুমার-রাজকুমারী এখন পরস্পরের খুব কাছাকাছি।

দেয়ালভাঙার আনন্দে আদনানের বুকের ভেতর চঞ্চল চড়ুই পাখিটি উড়তে থাকে, উড়তেই থাকে। মনের চড়ুই পাখির নাচন মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে পড়ে ওর দেহাবয়বেও। ও তখন সতর্ক হয়ে ওঠে। ও তখন মকবুল ভাটের কথা মনে করে। ওদের স্বাধীনতাসংগ্রামের অগ্রনায়ককে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিচারিক সনদের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। এই মাটিতে আর কোনো মকবুল ভাট আসবে কি না ভেবে প্রফুল্লতার মাঝেও বিমর্ষ হয়ে পড়ে ও।

সেদিন শেষ বিকেলে এক জঘন্য ঘটনার মুখোমুখি হয় আদনান। ওদের বাড়ির পেছনে একটুকরো নির্জন জায়গা। শীতে যেখানে টিনের চাল থেকে তুষার গড়িয়ে পড়ে আর ধানকাট মৌসুমে যেখানে পোয়াল স্তূপ করে রাখা হয়, সেই নির্জন হালটে রায়হানের সঙ্গে মারিয়ামকে দেখে রক্ত হিম হয়ে যায় আদনানের। আড়াল থেকে ও দেখে, রায়হান মারিয়ামের হাতে কিছু একটা গুঁজে দিতে চাচ্ছে আর মারিয়াম কেবলই বিরক্ত হয়ে সরে সরে যাচ্ছে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

একপর্যায়ে চিৎকার করে ওঠে মারিয়াম আর ওই চিৎকার শুনে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে আদনান। ততক্ষণে আপসে উপহার প্রদানের পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। দুজনের মাঝে তখন চলছে ধস্তাধস্তি। এমন এক দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হবে, কোনো দিন কল্পনাও করেনি আদনান। মারিয়ামের ওই অসহায় অবস্থা দেখে মাথায় রক্ত চড়ে যায় ওর। ক্রুদ্ধ বাঘের মতো ছুটে যায় ও রায়হানের কাছে এবং সর্বশক্তি দিয়ে চপেটাঘাত করে ওর গালে। অন্য সময় হলে মারামারি লেগে যেত নির্ঘাত। কিন্তু আজ রায়হান বুঝতে পারে, অন্যায়টা তারই। চূড়ান্ত রকমের বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সে। তার এ নোংরামি যদি জানাজানি হয়ে যায়, লজ্জায় পড়তে হবে। আর এ কারণেই প্রতি-আক্রমণের জন্য আজ আদনানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না সে। তবে স্থানত্যাগের আগে সে ফুঁসতে ফুঁসতে রেখে যায় এক অমোঘ বাক্য, যার প্রতিফলন আদনানের পরবর্তী জীবনে আমরা বারবার দেখে উঠব। রায়হান বলে, এই চড়ের প্রতিশোধ আমি নেব, পঞ্চাশ বছর পরে হলেও নেব, অপেক্ষায় থাকিস।

ভয়ংকর হুমকিটি রেখে চলে যায় রায়হান। একটু তফাতে মারিয়াম তখন দুহাতে মুখ লুকিয়ে ফোঁপায় আর আদনান হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে। মারিয়ামের দুঃখ ছাপিয়ে ওর কানে তখন বাজতে থাকে একটাই বাক্য— এই চড়ের প্রতিশোধ আমি নেব, পঞ্চাশ বছর পরে হলেও নেব, অপেক্ষায় থাকিস।

সাত

এবারের শীতে তুষারপাতের আধিক্যে প্রত্যাশিত সরিষাদানা ঘরে ওঠেনি আদনানদের। সরিষার ক্ষতি পোষাতে শীত শেষে তাই ধান রোপণের ধুম পড়ে গেল গুরিহাকার মাঠে মাঠে। কাশ্মীরে শীত মানেই জরা, অসারতা, অকর্মণ্যতা এবং যার অনিবার্য পরিণতি অভাব। শীতের পর তাই যেই না গ্রীষ্মের সূর্য উঁকি মারে দিগন্তে, অমনি আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে গোটা উপত্যকা। কাশ্মীরিদের প্রধান খাবার ভাত, ধানের সাথে তাদের সম্পর্ক মায়ের সাথে সন্তানের মতো। এ কারণে গ্রীষ্মের মৌসুম তারা হেলায় পার করতে চায় না।

ধান রোপণের দিন এলে দাদাজির মুদি ব্যবসা অনিয়মিত হয়ে যায়। মজুরির বিনিময়ে দরিদ্র প্রতিবেশীদের তিনি ধান রোপণের কাজে নিয়োগ

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

দেন। খরচ কমাতে নিজেও হাত লাগান ভাড়াটে চাষিদের সাথে। শুধু পুরুষেরাই নয়, সংসারের খরচ বাঁচাতে নারীরাও হাত লাগায় খেতের কাজে। হিজাব পরে, কাদাপানিতে পায়ের গোছা ডুবিয়ে, রুকুর মতো কোমর ভেঙে মাঠে মাঠে ধান রোপণ করছে কাশ্মীরি মেয়েরা— এই মৌসুমের খুব সাধারণ দৃশ্য। কাজে গতি আনতে তারা কোরাস কণ্ঠে গান ধরে :

উড়িয়ে দাও কাশ্মীরের নিশান
এ নিশান আমাদের
তরুণের বৃদ্ধের
শক্তির শান্তির
মাটি-চষা কৃষকের।

স্কুলে যাওয়ার পথে শ্রমিকদের জন্য কেটলি ভরে গাওয়া নিয়ে যায় আদনান। কাদাপানির ভেতর কাজ, শীতের আড়ষ্টতা তাড়াতে শ্রমিকেরা তাই কাপের পর কাপ গাওয়া পান করে। কেটলির মুখ খোলার সাথে সাথে জাফরান, কাঠবাদাম ও দারুচিনির সুবাসে ভরে ওঠে খেতের আল। তখন কোনো কোনো শ্রমিক নাজনীনের জাদুকরি হাতের প্রশংসায় মেতে ওঠে। দাদাজি তখন ধমক মারেন— চুপচাপ কাজ করো। এটা নূরজাহানের বানানো গাওয়া, আমার বউমার নয়।

দাদাজির ধমকে একটুও বিচলিত হয় না শ্রমিক। সে একই রকম চনমনে কণ্ঠে বলে, যেমন মা তেমন তার বেটি।

ছুটির দিনে আদনান, মারিয়াম এবং নূরজাহানও নেমে পড়ে কাজে। মাথায় করে অন্য খেত থেকে ধানের চারা বয়ে নিয়ে আসে তারা। এবার নতুন একজন সঙ্গী পাওয়ার আনন্দে খইয়ের মতো ফুটতে থাকে আদনান। গতবার ও আর নূরজাহান মিলে চারা আনা-নেওয়ার কাজ করেছিল। এই মৌসুমে ওদের সাথে যুক্ত হয়েছে মারিয়াম। সেই মারিয়াম, যাকে না বলে আদনান মিছিলে গেলে অভিমানে মুখ ফুলিয়ে থাকে। এমন একটি অভিমানকাতর মেয়ে কায়িক শ্রমের সহযাত্রী হলে ক্লান্তি স্পর্শ করে না। আদনান আগামী দিনের কথা ভাবে। যখন চারাগাছগুলো ফলবতী হয়ে নুয়ে পড়বে মাটির কোলে, তখনো কর্মচাঞ্চল্য তৈরি হবে আজকের মতো। বরং তখনকার কর্মব্যস্ততা হবে এখনকার তুলনায় অনেক বেশি। আঁটি বাঁধা পাকা ধানগাছ মাথায় করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর বিছানো নাড়ার ওপর গরু ঘুরিয়ে ধান মাড়াই করবেন দাদাজি। গরুর খুরের ক্রমাগত ঘাইয়ে বাইল থেকে আলগা হয়ে যাবে ধান। ছড়িয়ে পড়া ধান গুছিয়ে ভরে রাখা হবে কাঠের গোলায় আর পর্বতের মতো উঁচু করে পালা বানানো হবে পোয়ালের।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

শৈশবে পোয়াল পালার আড়ালে নূরজাহানের সাথে কত যে লুকোচুরি খেলেছে আদনান! একবার ওর মনে হয়— এবার শুধু নূরজাহান নয়, মারিয়ামের সাথেও সে লুকোচুরি খেলবে। পরক্ষণে ওর স্বপ্নভঙ্গ হয়। কারণ, এত দিনে ওরা লুকোচুরি খেলার বয়স পেরিয়ে এসেছে। ফেলে আসা শৈশবের জন্য আদনানের মন কেমন করে।

মারিয়াম আসার পর আদনানের রোজা এবং ঈদগুলোও খুশির দ্যুতি ছড়াতে থাকে। ঈদের মতোই উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে কাশ্মীরের রোজা। রোজা মানেই সংযম, শৃঙ্খলা এবং ত্যাগের পরীক্ষা। ঘরে ঘরে ইফতার আদান-প্রদানের সৌন্দর্যের কাছে ম্লান হয়ে যায় উপত্যকার ভুবনভোলানো সৌন্দর্য। বুঝতে শেখার পর প্রতিটি রমজানে আদনান ঘুমের ভেতর কান পেতে থাকে সেহের খানের হাঁকডাক শোনার আশায়। সেহের খান, যার প্রকৃত নাম আফজাল বেগ, সেহরির সময় যিনি এক মুখখোলা ঢোল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায় এবং ঢোলের গায়ে দ্রিম দ্রিম শব্দ তুলে চিৎকার করে লোক জাগাতে থাকেন— ওয়াক্তে সেহের...ওয়াক্তে সেহের! সেহের খান মসজিদে ঘুমান, মসজিদে খান। গুরিহাকার বিভিন্ন মহল্লা থেকে তার প্রতিদিনকার খাবার আসে। রমজান শেষে তিনি রোজাদারদের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বখশিশ পান।

মনে পড়ে, লোকটার সেহের খান নাম অদ্ভুত সংশয় তৈরি করেছিল আদনানের কিশোর মনে। দিনের বেলা লোকটার সাথে যখন দেখা হতো ওর, সবাই তাকে আফজাল বেগ বলে ডাকত। অথচ সেই মানুষটিই যখন রোজাদারদের জাগানোর উদ্দেশ্যে শেষ রাতে চিৎকার করতেন, মা আদনানের কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলতেন, সেহের খান এসে গেছে। ওঠো ওঠো। সেহরি খেয়ে নাও।

লোকটার দ্বৈত নামের সংঘাত অনেক দিন পর্যন্ত নাকাল করে রেখেছিল আদনানকে। একই মানুষ কখনো সেহের খান আবার কখনো আফজাল বেগ হন কীভাবে! ওর কিশোর মনের জিজ্ঞাসার জট শেষমেশ দাদাজি খুলে দিয়েছিলেন। রোজাদারদের জাগানোর এই দায়িত্ব বংশপরম্পরায় লাভ করেছেন আফজাল বেগ। দায়িত্বের কারণেই সেহরির সময় তিনি সেহের খান নামে প্রত্যুজ্জ্বল হয়ে ওঠেন এবং অন্য সময় আফজাল বেগ। শুধু তিনি নন, তার বাবা-দাদারাও কাশ্মীরের জনসমাজে সেহের খান নামে পরিচিত ছিলেন। দাদাজির এই ব্যাখ্যা আপ্লুত করেছিল আদনানকে। ওর মনে হয়েছিল, সেহের খানের এই হাঁকডাক ছাড়া কাশ্মীরের রোজা অপূর্ণ। রমজান মাসে মুসলিম সমাজে নতুন অনুষঙ্গের অন্তর্ভুক্তি দেখতে দেখতে বড় হয়েছে আদনান।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আদনানের মনে হয় সেহরি-ইফতার-তারাবিহর মতো সেহের খানও রমজানের একটি অনিবার্য প্রসঙ্গ।

এ বছরের রোজা বিশেষ দ্যোতনা নিয়ে হাজির হলো আদনানের জীবনে। পর্বতের মাথায় কাঁচির মতো চিকন চাঁদের আবির্ভাব অপার্থিব আনন্দ ডেকে আনল উপত্যকাজুড়ে। জামাতে প্রথম তারাবিহ পড়ে এসে মারিয়ামের কাছে সেহের খানের গল্প বলতে শুরু করল আদনান, যে গল্প কয়েক বছর আগে দাদাজি ওকে শুনিয়েছিলেন। সেহের খানের গল্প শুনে মারিয়াম জুঁই ফুলের মতো হেসে উঠল। ওর স্বর্ণকমল গালে ছলকে উঠল জোছনার আলো। ওর চোখের তারায় জ্বলতে লাগল উচ্ছ্বাসের প্রদীপ। সেহের খানের হাঁকডাক শুনবার আশায় ও প্রার্থনায় বসল, রাত যেন দ্রুত ফুরায়। এ সময় দুজনের গল্পে ভাগ বসাতে ছুটে এল নূরজাহান। সবজান্তার হাসি হেসে মারিয়ামের উদ্দেশে ও বলল, সেহের খানের কণ্ঠ মাইকের চেয়েও উঁচু। সে যখন আমাদের মহল্লায় এসে ডাকাডাকি শুরু করবে, তোমার সাধ্য নেই ঘুমিয়ে থাকার। নূরজাহানের নতুন তথ্যে মারিয়ামের কৌতূহল আরো বেড়ে যায়। ও সেহের খানসম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য জানবার জন্য কান খাড়া করে, কিন্তু তার আগেই নূরজাহান ছুটে যায় রান্নাঘরে। যাবার আগে রেখে যায় একটি বাক্য— সেহরির জন্য এখনই মাংস সেদ্ধ করে রাখতে হবে। নয়তো ভোরে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে কুলিয়ে ওঠা যাবে না। খালা ও খালাতো বোন রান্নার কাজ এগিয়ে রাখছে। এমতাবস্থায় মারিয়াম বসে থাকতে পারে না আদনানের কাছে। বিশেষত যখন ও খালার আশ্রিত। আর তাই রান্নাঘরের উদ্দেশে মারিয়ামও কদম ওঠায়। ঠিক তখন ও অনুভব করে, আদনানের পাঞ্জাবি থেকে ভুরভুর করে জুঁই ফুলের গন্ধ আসছে। কৌতূহলে আদনানের দিকে নাক বাড়িয়ে ধরার অভিনয় করে মারিয়াম। আদনান হাসতে হাসতে বলে, ইমাম সাহেব আদর করে আতর মাখিয়ে দিয়েছেন।

পঞ্চম রোজায় মসজিদে ইফতার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন দাদাজি। দুপুর থেকেই তাই ব্যস্ত নাজনীনের রান্নাঘর। ঘিয়ে ভাজা চালের গুঁড়ো দিয়ে তিনি হালুয়া বানাচ্ছেন। ভাজা চালের মোহনীয় সৌরভে ম-ম করছে পুরো বাড়ি। নূরজাহান তো একবার মায়ের কাছে হাসতে হাসতে বলেই ফেলেছে— তোমার হালুয়ার লোভে রোজা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছা করছে, আম্মুজি। মেয়ের নাফরমানি কথায় খুন্তি দিয়ে মা ওকে মারতে তেড়েছেন।

দাদাজি বাজারে গেছেন খেজুর ও আপেল কিনতে। সঙ্গে নিয়ে গেছেন রায়হানকে। আদনান 'বাবরি বিউল' শরবতের বন্দোবস্ত করছে। কাশ্মীরি ভাষায় বিউল মানে বীজ। বাবরি বিউলে যে বীজ দেওয়া হয়, তা মূলত

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তুলসীর। পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর এই বীজ তোকমাদানার মতো ফুলে ওঠে। মোগল সম্রাট বাবরের শাহি শরবতের তালিকায় এই বীজ ছিল। সেখান থেকেই এর নাম বাবরি বিউল। জ্বালানো দুধ, চিনি, এলাচ, জাফরান ও নারকেলের গুঁড়োর ভেতর ভিজিয়ে রাখা তুলসীর বীজ ছেড়ে দিলেই হয়ে যায় এই স্বাস্থ্যকর শরবত। ইফতারের মেনুতে বাবরি বিউল রাখতে নিষেধ করেছিলেন বাবা। এটা যেমন ব্যয়বহুল, তেমনি এর সকল উপকরণ জোগাড় করাও সময়সাপেক্ষ। তাই তো বাবার অনাগ্রহ। কিন্তু আদনান শুরু থেকেই গোঁ ধরে বসে ছিল। ও এখন কলেজের ছাত্র। যথেষ্ট বড় হয়েছে। সংসারে ওর সিদ্ধান্ত তাই গ্রহণ করতে হবে। বছরে একবারই তো মসজিদে ইফতার দেওয়ার সুযোগ আসে। এই সুযোগে সাধ্যের সবটুকু দিয়ে আপ্যায়ন করতে ও প্রস্তুত আছে।

আসরের পর মসজিদের মাইকে গজল বাজতে লাগল। তারাবিহর জন্য অনন্তনাগ মাদ্রাসা থেকে নতুন হাফেজ এসেছেন। গজল তিনিই গাচ্ছেন। মাঝখানে ইমাম সাহেবের দরদি কণ্ঠে দরুদের সুর চড়তে শোনা গেল। গজল এবং দরুদের মায়াবী সুর জানিয়ে দিচ্ছে এখন রমজান মাস। চারদিকে সংযমের অপূর্ব সৌরভ। শরবত গোলাতে ব্যস্ত আদনানের কাছে এসে মারিয়াম আক্ষেপ নিয়ে বলল, সারা বছর যদি রোজা হতো! সংযমের এই সৌরভ ও হারাতে চায় না।

দাদাজানের সাথে ইফতারের সরঞ্জাম মসজিদে বয়ে নিয়ে গেল আদনান ও রায়হান। বাবা নির্বিবাদী মানুষ। ছেলেমেয়েদের মাধ্যমে যে কাজ হয়ে যায়, সেই কাজে তিনি হাত লাগান না। একেবারে শেষ মুহূর্তে, ইমাম সাহেব যখন সবাইকে নিয়ে মোনাজাতে হাত তুলেছেন, ঠিক তখন মসজিদের ইফতারে শামিল হলেন বাবা। বাড়িতে নাজনীন, নূরজাহান ও মারিয়াম মাথায় ওড়না পেঁচিয়ে বসে রইল ইফতারের সামনে, আজান শোনার অপেক্ষায়।

নামাজের পর নতুন এক সংবাদ উত্তপ্ত করে তুলল মুসল্লিদের। ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা, শেখ আবদুল্লাহর পুত্র ফারুক আবদুল্লাহ কংগ্রেস সরকারের সাথে অশুভ আঁতাত গড়ে তুলেছেন। শেখ আবদুল্লাহ মারা গেছেন ১৯৮২ সালে। মৃত্যুর আগে স্থাপন করে গেছেন নির্লজ্জ স্বজনপ্রীতির নজির। রাজনীতিতে অসম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অপরিপক্ব এবং অদূরদর্শী পুত্র ফারুক আবদুল্লাহকে করে গেছেন উত্তরাধিকার মনোনীত। দিল্লির সাথে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের কারণে শেখ আবদুল্লাহ সম্ভবত কাশ্মীরকে পৈতৃক সম্পত্তি ভাবতে শুরু করেছিলেন। তাই তো শেষনিশ্বাস ত্যাগের পূর্বে উপত্যকার শাসনের রাশ নিজের পরিবারের হাতে অর্পণ করে গেছেন।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

দিল্লির সাথে পিতা শেখ আবদুল্লাহর সুসম্পর্ক থাকলেও ফারুক আবদুল্লাহ শুরুতে সেই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকার ফারুক আবদুল্লাহর প্রতি ভয়ংকর রুষ্ট হয়ে ওঠে। তার কারণ, ১৯৮৩-এর নির্বাচনের আগে ফারুক আবদুল্লাহ কংগ্রেসবিরোধী সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ সময় কংগ্রেসবিরোধী অনেক সমাবেশে তিনি যোগ দেন এবং বক্তৃতা রাখেন। নির্বাচনে ফারুক আবদুল্লাহর ন্যাশনাল কনফারেন্স ভালো ফলাফল করে বটে, কিন্তু এই সাফল্য তাকে দিল্লির শত্রুতে পরিণত করে। ইন্দিরা গান্ধী ফারুক আবদুল্লাহকে জাতীয়তাবাদবিরোধী, সাম্প্রদায়িক, পাকিস্তানের সমর্থক ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করে। শুধু তা-ই নয়, ১৯৮৪ সালের ২ জুলাই রাজ্যপাল জগমোহনের মাধ্যমে ফারুক আবদুল্লাহ সরকারের পতন ঘটানো হয়। এই ঘটনায় উপত্যকার মানুষেরা মুসলিমবিদ্বেষী জগমোহনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এবং মজলুম ফারুক আবদুল্লাহর প্রতি সহানুভূতি জানায়। এ সময় কাশ্মীরিদের যে ভালোবাসা ফারুক আবদুল্লাহ পেয়েছিলেন, সেই ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করতে পারলেন না তিনি। রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু নেই— এই বাণীকে আরো একবার সত্য প্রমাণ করতে ফারুক আবদুল্লাহ কংগ্রেসের সাথে আঁতাত গড়ে তুললেন। এর সুফল তিনি পেলেন হাতেনাতেই। জম্মু-কাশ্মীর থেকে জগমোহনের, অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসান হলো এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন ফারুক আবদুল্লাহ। নেতার এই পদক্ষেপ ও তোষণনীতি খোদ ন্যাশনাল কনফারেন্সের অনেক কর্মীই ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু ফারুক আবদুল্লাহর যুক্তি ছিল ভিন্ন। রাজ্যের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করতে তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন নিয়েই এগোতে হবে। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তিনি স্বীকার করে নিলেন, কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক অধিকার ও উন্নয়ন নির্ভর করছে কেন্দ্রের কাছে তার নতিস্বীকারের মাধ্যমে। আর এই নতিস্বীকারটাই করতে চায় না কাশ্মীরিরা। যার পরিপ্রেক্ষিতে আজ সন্ধ্যায় আদনানের জন্মগ্রাম গুরিহাকার রোজাদার মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা। রোজার পাঁচ দিনে সংযমের যে ইমারত একটু একটু করে তারা নির্মাণ করেছিলেন, একটি খবর একমুহূর্তে ধসিয়ে দিল সেই ইমারতের দেয়াল। ইফতারে আদনানের বানানো শরবত তাদের যতটা প্রশান্তি দিয়েছিল, ইফতারের পরের সংবাদ তাদের ততটাই উত্তপ্ত করে তুলল। ফারুক আবদুল্লাহর ওপর ক্ষোভ উদ্গিরণ করতে করতে বিক্ষত হৃদয় নিয়ে তারা ঘরে ফিরল।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

রাজনীতির নতুন মেরুকরণ শঙ্কিত করল মারিয়ামকে। স্বাধিকার ও স্বাধীনতার চেতনা মারিয়ামের ভেতর পূর্ণ মাত্রায় থাকলেও রাজনীতিমনস্ক মেয়ে সে নয়। শৈশবে বাবা-মা হারিয়ে যাকে অন্যের বাড়ি আশ্রিত থাকতে হয়, রাজনৈতিক চেতনা তার জন্য বিলাসিতা। এ কারণেই কাশ্মীরের জাতীয় রাজনীতির উত্থান-পতন মারিয়ামকে খুব বেশি তাড়িত করে না। তবু রাজনীতির নতুন মেরুকরণ যে ওকে শঙ্কিত করে তুলল, তার কারণ আদনান। রাজনীতি নিয়ে ওর মাথাব্যথা না থাকলেও আদনানকে নিয়ে ওর দুর্ভাবনার অন্ত নেই। যদি আবার সে মিছিলে গিয়ে হারিয়ে যায়!

আদনান ওর খালাতো ভাই-ই শুধু নয়, এই বাড়িতে আদনান ওর অবলম্বন। এ বাড়ির টুকরো টুকরো গল্প ও স্মৃতি অ্যালবামে সাজালে আমরা দেখতে পাব— এত দিনে আদনানের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে মারিয়াম। বাবা-মা মরা এই মেয়েটি যেসব আহ্লাদ-আবদার খালা-খালুকে করতে পারে না, সেসব কথা অনায়াসে ও আদনানকে জানায়। প্রতিবছর বাবা-মার মৃত্যুদিবসে আদনানই ওকে নিয়ে যায় খোশরাগপোরায়, শৈশবে যে জায়গাটা ওকে নিরাবলম্ব বানিয়ে দিয়েছে। মাঝে তো একদিন দেখতেও গিয়েছিল নিজের জন্মগ্রাম, আদনানের সাথে। মানবশূন্য বিধ্বস্ত ঘরের খুঁটি ধরে সেদিন অনেক কেঁদেছিল মারিয়াম। চোখের পানি মুছতে মুছতে ও দেখতে বেরিয়েছিল বেহাত হওয়া ওদের আপেলবাগান। পানি ছুঁয়ে সেই হ্রদকে ও ভালোবাসা জানিয়েছিল, যে হ্রদের ধারে গ্রাম্য বালিকাদের সাথে ও লুকোচুরি খেলত। ফেলে আসা শৈশবকে করতলে নিয়ে দেখার এই সুযোগ হয়তো হতো না কোনো দিন, যদি না আদনান আসত ওর জীবনে। কোনো কোনো জোছনারাতে সবাই ঘুমিয়ে গেলে কম্বল ছেড়ে উঠোনে নেমে আসে মারিয়াম। জ্বলজ্বলে চাঁদের দিকে চেয়ে ও অন্তর্গত সংলাপ আওড়ায়— মারিয়াম, তুমি কি ভালোবাসো আদনানকে!

মারিয়াম চেয়েছিল রমজান মাসটা যেন না ফুরায়; কিন্তু চোখের পলকে অতীত হয়ে গেল রোজার প্রথম কুড়ি দিন। শেষ দশকে বেড়ে গেল কাশ্মীরিদের ইবাদত ও রাত্রি জাগরণ। বিশেষত প্রত্যেক বেজোড় রাতে শবে কদর তালাশকারীদের জন্য সারা রাত খোলা রইল মসজিদের দরজা। তারাবিহর পর কাওয়ালির ঢঙে গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকল কোরাস কণ্ঠের দরুদ পাঠ। দরুদের সেই পবিত্র সুর মসজিদকে পরিব্যাপ্ত করে ধ্বনিত হতে লাগল গুরিহাকার পথে-প্রান্তরে। এক রাতে কৌতূহলবশত নূরজাহানের সাথে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল মারিয়াম। পথের কিনারে দাঁড়িয়ে ও তন্ময় হয়ে শুনছিল ইয়া নবী সালামু আলাইকা। ওর ভালো লাগা বেড়ে গেল তখন,

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

যখন অনুভব করল এই সুরের মাঝে আদনানের কণ্ঠও মিশে আছে একাকার হয়ে। মুসল্লিদের সাথে মারিয়ামও গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠল দরুদ। ওর বুকটা তখন মদিনার খেজুরবাগান হয়ে গেল। নবীজির ভালোবাসা ছাড়া ওই বুকে যেন কোনো কিছুর লেশমাত্র নেই। একদিন ও মুসল্লিদের সাথে হাত তুলল খোদার দরবারে। মোনাজাতে বাবা-মার কথা মনে পড়তেই ওর দুচোখে অশ্রুর ঝরনা নামল। বাবা-মাকে ছাড়াই কেটে গেল আরো একটি রমজান! মায়ের কোমল হাতের স্পর্শ আর কোনো দিন ওর ঘুম ভাঙাবে না সেহরিতে।

মারিয়ামের চোখের জল শুকানোর আগেই ঈদের আমেজ শুরু হয়ে গেল কাশ্মীরে। রমজানের সংযম শেষে ঈদের খুশি গড়িয়ে পড়তে লাগল কাশ্মীরের পাহাড়ে-পর্বতে, চিনারের শাখায়, পাইনবনের পাতায় পাতায়। আদনানদের বাড়ি থেকে দেখার দূরত্বে পর্বতের ঢালুতে গুরিহাকার ঈদগাহ মাঠ। বছরে দুবার এই মাঠেই ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। মুসল্লিরা যখন নামাজে দাঁড়ায়, মাঠ দক্ষিণ থেকে উত্তরে খানিকটা ঢালু থাকায়, দূর থেকে মনে হয় ঢেউয়ের তোড়ে কাত হয়ে যাওয়া নৌকার যাত্রী। মাঠের পশ্চিমে খিলানবিশিষ্ট মেহরাব ঘর। সাথে তিনটা সিঁড়ি। এই সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব ঈদের খুতবা দেন। আদনান শৈশব থেকে দেখছে, আখরোটগাছের দুটো শাখা সব সময় রুকুর মতো ঝুঁকে থাকে মেহরাবের ওপর। যেন আকাশ থেকে নেমে আসা জিবরাইলের দুটো ডানা। আখরোটগাছের ওই চিরায়ত ডানা ছাড়া ওদের ঈদগাহ যেন কল্পনা করা যায় না।

ঈদের নামাজের পর আদনানের কলেজের বন্ধুরা এল বেড়াতে। নাজনীন বিখ্যাত কাশ্মীরি খাবার ওয়াজওয়ান রান্না করেছিলেন। বন্ধুরা পেটপুরে ওয়াজওয়ান খেয়ে বসার ঘরে লবণ-চায়ের আড্ডা বসাল। ঈদের পর কলেজ খুলে যাবে, কলেজের গল্প ছাড়াও ওদের আড্ডার বড় জায়গাজুড়ে রইল ইংল্যান্ড ভারত ওয়ানডে ম্যাচ। গত পরশু ইংল্যান্ডের কাছে সাত ইউকেটে হেরেছে ভারত। ভারতের এই পরাজয় ওদের ঈদের খুশিকে দ্বিগুণ করে তুলেছে। এত খুশির মাঝেও আদনানের কানের কাছে এসে মারিয়ামের কান্নার সংবাদ দিয়ে গেল নূরজাহান। ঈদের দিনে মারিয়াম কেন কাঁদে! মারিয়ামের কান্না অস্থির করে তুলল আদনানকে। বন্ধুদের বিদায় করে ও ছুটে গেল সেই ঘরে, যে ঘরের সোফার কুশনে মুখ গুঁজে কাঁদছিল মারিয়াম। নূরজাহান বসে ছিল ওর পাশে। মারিয়ামের মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল ও।

কী হয়েছে? কাঁদছ কেন? আদনান এগিয়ে এল মারিয়ামের দিকে।

নূরজাহান বলল, খালা-খালুর কথা মনে পড়ছে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আদনান একটু সময় নিয়ে বলল, আগের বাবা-মা হারিয়ে তুমি তো নতুন বাবা-মা পেয়েছ। কষ্ট কিসের তোমার! এবার ওঠো তো, আমাদের ঈদগাহ দেখাতে নিয়ে যাব তোমাকে। মারিয়ামের হাত ধরে মৃদু টান দিল আদনান। এই প্রথম বেখেয়ালে মারিয়ামের হাত ধরা আদনানের। আর ঠিক তখনই এ ঘরে ঢুকল রায়হান। মারিয়ামের হাত ধরার ওই দৃশ্য দেখে ভ্রু কুঁচকে গেল রায়হানের। দুচোখে বিরক্তি আর ক্রোধের ছায়া নিয়ে ও সরে গেল দরজা থেকে। আদনান যখন মারিয়ামকে নিয়ে বের হলো, কাঠবাদামগাছের নিচে দাঁড়িয়ে মনে মনে দোয়া করতে লাগল নূরজাহান— মারিয়াম, ভাইয়াজির সাথে তোমার এই পথচলা যেন চিরকালের ফ্রেমে বন্দী হয়ে যায়। তোমার দুঃখ বোঝার মতো হৃদয় একমাত্র ভাইয়াজিরই আছে।

আট

হজরত উল্লাহ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাদাজির আহত হওয়ার সংবাদ পরিবেশন করলে এ বাড়ির সকালটা বিষণ্ন হয়ে ওঠে। অথচ তিন মাস ধরে এই দিনটির জন্যই তীব্র তুমুল অপেক্ষায় ছিলেন দাদাজি। যদিও প্রতীক্ষিত এই দিনটি রক্ত ঝরাতে পারে, অনুমিত ছিল; বিশেষত, আজ সকালের ভোরের সূর্যটা সময়ের পরও রক্তিম দেখালে দাদাজি স্বগতোক্তি করেছিলেন— আজকের দিনটা সূর্যের মতোই রক্তিম হতে চলেছে। তবু, অপ্রত্যাশিত নয় জেনেও, এ বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটার আহত হওয়ার সংবাদ সবার মুখমণ্ডল পাণ্ডুর বানিয়ে দেয়। নাজনীনের হাত থেকে পড়ে যায় কাঁসার বাসন। তিনি চিৎকার করে বলেন, একা যেতে বারবার নিষেধ করলাম, তবু তিনি যাবেনই। আদনানের সব রাগ গিয়ে পড়ে ফারুক আবদুল্লাহর ওপর। তার জন্যই আজকের এই দুর্দশা।

১৯৮৭ সালের ২৩ মার্চ বিধানসভা নির্বাচনের দিন ধার্য হলে ক্ষোভের লু হাওয়া বয়ে গিয়েছিল গোটা উপত্যকাজুড়ে। এই নির্বাচনে রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস আর ফারুক আবদুল্লাহর ন্যাশনাল কনফারেন্স ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফারুক আবদুল্লাহ আগেই কাশ্মীরিদের নিকট বিশ্বাসঘাতক উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। এবার কংগ্রেসের সাথে তার দহরম-মহরম জনতার ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। নির্বাচনে ফারুক আবদুল্লাহর বিরোধিতা করতে সম্পূর্ণ নতুন এক দলের আবির্ভাব ঘটে। সেই দলটির নাম মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট। ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেস

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

জোটকে পরাজিত করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে এই দলটি। একদল শিক্ষিত যুবক, অশিক্ষিত শ্রমিক ও কৃষক ফারুক আবদুল্লাহর বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে নতুন এই ফ্রন্ট গড়ে তোলে। এরা উপত্যকা থেকে দুর্নীতির অবসান চায়। এরা অর্থনৈতিক অবক্ষয় রোধ করতে চায়। এরা পরিবারতন্ত্র থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করতে চায়। বিগত দশকগুলোতে দিল্লি থেকে পাঠানো প্রায় সত্তর হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে একদল অসৎ আমলা, দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ী। নতুন এই দলটি এসব দুর্নীতিবাজের মুখে ঝামা ঘষতে চায়।

উপত্যকায় নতুনের পতাকা উড়তে দেখে হারানো যৌবন ফিরে আসে আবদুল লতিফের দেহে। মনের বেলাভূমিতেও কি আছড়ে পড়ে না সাত সাগরের ঢেউ? যে উদ্যম আর উদ্দীপনা নিয়ে একদা তিনি প্রতিবাদী মিছিলে শামিল হতেন, বারুদকণ্ঠের স্লোগানে কাঁপন ধরাতেন জালিমের বুকে; বহুকাল পর, জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে বিপ্লবের উপলক্ষ পুনর্বার ফিরে আসায় তিনি খোদাকে ধন্যবাদ জানান। অচিরেই তিনি ভিড়ে যান সেই সব মানুষের সারিতে, যারা দিনরাত একাকার করে মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছে।

আবদুল লতিফের বড় পাওয়া, পরিশ্রম আর একনিষ্ঠতা দিয়ে তিনি অল্প দিনে নিজ এলাকার নির্বাচনী প্রার্থীর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। সেই প্রার্থীর নাম নওয়াব আলী। নওয়াব আলীর সাথে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘোরেন, জনতাকে বোঝান কেন মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্টের ক্ষমতায় আসা জরুরি। ন্যাশনাল কনফারেন্স বিক্রি হয়ে গেছে দুশমনের কাছে। এমতাবস্থায় কাশ্মীরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তি লাভের জন্য মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্টের কোনো বিকল্প নেই। আবদুল লতিফ সারা দিন জনসংযোগ করেন আর সারা রাত মিটিং করেন নওয়াব আলীর বাড়িতে। নির্বাচনী এই ডামাডোলের ভেতর তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে আদনানের কথা। ছেলেটা এবার কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছে। ক্যাম্পাস হোস্টেলে থাকে। দুমাস পরপর বাড়িতে আসে। এই সময় আদনান হাতের কাছে থাকলে কাজেকর্মে সুবিধা পেতেন তিনি। ব্যস্ততায় ইদানীং দোকানে সময় দিতে পারেন না। আরো এক মাস আগে থেকেই তার দোকানে ঝাঁপ নামানো। রায়হান ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর স্থানীয় এক কলেজে ডিগ্রি ভর্তি হয়েছে। বাড়িতেই থাকে। মাঝে মাঝে দোকানে বসলে কী এমন ক্ষতি হয়! না, তিনি বসবেন না। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বেড়াবেন। খদ্দের ধরে রাখতে বাধ্য হয়ে নূরজাহান আর মারিয়াম তাই ঝাঁপ তুলে বসে থাকে মাঝে মাঝে।

নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসে, উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা তত প্রবল হয়। ন্যাশনাল কনফারেন্সের কেউ কেউ মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্টকে, যেহেতু এর নামের মধ্যেই যুক্ত আছে মুসলিম শব্দটি, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দল হিসেবে আখ্যা দিতে শুরু করে। আবদুল লতিফ প্রায়ই এই লোকগুলোর সাথে বাক্‌যুদ্ধে লিপ্ত হন। একদিন তো ন্যাশনাল কনফারেন্সের পাঁড় সমর্থক, স্কুলশিক্ষক হাশমত উল্লাহর সাথে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে যায়। আবদুল লতিফ সেদিন সাইকেল চালিয়ে নওয়াব আলীর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য—নওয়াব ভাইয়ের সাথে রেশিপোরা অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো। গুছিয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। রায়হানকে দোকানে বসবার কথা বলতেই সে ঘাড় কাত করে হনহনিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অমনি এই ঘাড়ত্যাড়া নাতির সামনে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। কেন সে বাড়ির কোনো কাজে সাহায্য করে না! কেন সে দিনরাত গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়! রায়হান খটমট করে বলেছিল, কাজ করতে তার ভালো লাগে না। দাদাজির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। তিনি চড় মেরে দিয়েছিলেন রায়হানের গালে। অমনি ওর ফরসা গালে বসে গিয়েছিল আঙুলের ছাপ।

রাস্তায় নেমেও উপশম হয়নি ঘরের রাগ। মার্চের পয়লা তারিখ সকালেও চারদিকে ঘন কুয়াশার আবরণ। কুয়াশাঢাকা দূরের পর্বতগুলো ছানিপড়া চোখের মতো ধূসর। এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি রাস্তায় দ্রুত প্যাডেল মারছিলেন আবদুল লতিফ। পরিশ্রান্ত মানুষের মতো তার নাক দিয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে গরম শ্বাস বের হচ্ছিল। শামসুদ্দিনের চায়ের দোকান অতিক্রম করতে করতে তিনি দেখলেন, কম্বলে আবৃত হাশমত উল্লাহ মাচায় বসে আয়েশি ঢঙে চা খাচ্ছে। দোকানটা ফারুক আবদুল্লাহর লোকেদের আখড়া। এই দোকানে সকাল-সন্ধ্যা ন্যাশনাল কনফারেন্সের কর্মীদের আড্ডা বসে। যদিও সংখ্যায় তারা নগণ্য। আবদুল লতিফকে ছুটতে দেখে খোঁচা দিলেন হাশমত উল্লাহ—মৌলবাদীর দৌড় মুসলিম ফ্রন্ট পর্যন্ত। বলেই সুড়ুৎ করে চায়ে চুমুক দিলেন তিনি।

কথাটা স্পষ্ট কানে এসেছে আবদুল লতিফের। অন্য দিন হলে তিনি এড়িয়ে যেতেন। নির্বাচনের আগে বাক্‌যুদ্ধ হবেই। এসব গায়ে মাখলেই বরং দলের ইমেজ ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু আজকের দিনটা সাধারণ কোনো দিন নয়। আজ বাড়ি থেকেই তিনি মগজভরতি ক্রোধ নিয়ে বের হয়েছেন। হাশমত উল্লাহর ওই খোঁচা তার বুকের বাঁ পাশে বিদ্ধ হলো বিষাক্ত তির হয়ে। সঙ্গে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

সঙ্গে তিনি সাইকেলের ব্রেক কষলেন। সিটে বসা অবস্থায় পায়ের ভরে সাইকেলটাকে নিয়ে গেলেন হাশমত উল্লাহর সামনে। ক্রোধে তার কোঁচকানো কপালের শিরা দপদপ করছে। তিনি মারমুখী ভঙ্গিতে বললেন, মৌলবাদী বলছ কাকে? একবার আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছ, গাদ্দার?

আমাকে গাদ্দার বলো, সাহস তো কম না তোমার! হাশমত উল্লাহও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

আমাকে মৌলবাদী বলো, তোমার সাহস তো কম না।

মৌলবাদীকে মৌলবাদী বলতে সাহসের দরকার হয় না। হাশমত উল্লাহ চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিলেন।

আমি মৌলবাদী?

মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্টের হয়ে যারা ভোট করছে, সবাই মৌলবাদী। কাশ্মীরের প্রয়াত নেতা শেখ আবদুল্লাহ জীবনভর ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করে গেছেন। আমরা এখন তার ছেলের পক্ষে আছি। অথচ ইসলামি সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে নিয়ে তোমরা জোট বেঁধেছ।

আবদুল লতিফ সাইকেল থেকে নেমে এবার মুখোমুখি হলেন হাশমত উল্লাহর। বললেন, হ্যাঁ, তোমার অভিযোগ সত্য। ইসলামি দলগুলো এক হয়ে জোট বেঁধেছে। কিন্তু আমাদের সাথে শুধু ইসলামি দলের লোকই নেই, কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী অনেক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষও আছে আমাদের জোটে। এমনকি আবদুল গনি লোন, যিনি একসময় কংগ্রেসের নেতা ছিলেন, তিনিও আমাদের জোটের প্রার্থী। হাশমত উল্লাহ, চোখ থেকে রঙিন চশমাটা খোলো। একবার বোঝার চেষ্টা করো, কেন মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট গড়ে উঠল! এই মাটি ও মানুষের সাথে তোমাদের নেতার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে গড়ে উঠেছে মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট। ফারুক আবদুল্লাহ যদি কংগ্রেস ত্যাগ করত, আমরা তাকে বরণ করে নিতাম। দুধ আর গোবর কখনো এক পাত্রে থাকতে পারে না। কথাটা বলেই আবার সাইকেলে চড়ে বসলেন আবদুল লতিফ। হাশমত উল্লাহকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি প্যাডেল মারতে শুরু করলেন। খানিক দূর যাওয়ার পর তার মনে হলো, আরো কিছু কথা শোনানো দরকার ছিল হাশমত উল্লাহকে। মাত্রাছাড়া রাগের কারণে গুছিয়ে সব কথা তিনি বলতে পারেননি। কাশ্মীরে ইসলামি সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের পেছনে যতটা না দায় ইসলামি দলের, তার চেয়ে বেশি দায় ভারত সরকারের একচোখা নীতির। কোনো সম্প্রদায়কে যখন ক্রমাগত পেষণ করা হয়, স্তব্ধ করা হয় রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরকে, অর্থনৈতিক অধিকার থেকেও করা হয় বঞ্চিত, তখন অস্তিত্বের স্বার্থেই সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে জোটবদ্ধতা তৈরি

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

হয়। আবদুল লতিফ তার ফেলে আসা যৌবনের রক্তের দিনগুলোর কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন আর হাহুতাশ করেন। কী ভয়ানক লাঞ্ছনার ভেতর দিয়ে জারিত হয়েছে তার বালকবেলা! হায়! তিনি যদি জানতেন, সামনে যে আগুনের দিন আসছে, সেই দিনের বিশাল অগ্নিগহ্বরে স্রেফ বিলীন হয়ে যাবে তার নিপীড়িত যৌবনদিন!

ইতিহাসের কালো অধ্যায় হয়ে রইল ১৯৮৭ সালের ২৩ মার্চের নির্বাচন। মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা ভিড়তেই পারল না ভোটকেন্দ্রের আশপাশে। নির্বাচনের নামে নির্লজ্জ প্রহসনের অবতারণা করল কংগ্রেস-ন্যাশনাল কনফারেন্স জোট। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে ফারুক আবদুল্লাহর সমর্থকেরা দখল করে রাখল ভোটকেন্দ্র। সাধারণ জনতাকে বুথে ঢুকতে দেওয়া হলো না। ভোট গণনার সময় রাজ্য পুলিশ তাড়িয়ে দিল মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের। আবদুল লতিফের মতো অসংখ্য কর্মীর হৃদয় খানখান করে মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্টের মাত্র চারটি আসনে জয় দেখানো হলো। বলরাজ পুরির মতো নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক প্রহসনের এই নির্বাচন সম্পর্কে মন্তব্য করলেন— এই নির্বাচন সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজ্যের মানুষের ক্ষোভের নির্গম পথকে রুদ্ধ করেছে।

আবদুল গনি লোন, যিনি মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে এই নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন, এবং 'প্রাক্তন কংগ্রেসি' যার আরেকটি পরিচয়, তিনি বললেন, মানুষকে যদি ভোট দিতে না দেওয়া হয়, তবে তাদের যাবতীয় ক্ষোভ ভারতবিরোধী মানসিকতার মধ্যে প্রকাশিত হবে।

শ্রীনগরের এক আইনজীবী ভোট দিতে না পারার বেদনা থেকে বললেন, আমি নিয়মিত নামাজ পড়ি না। কিন্তু আমার ভোটাধিকার যদি কেড়ে নেওয়া হয়, তবে আমি ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হব।

২৭ মার্চ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ফারুক আবদুল্লাহ। শাসক হিসেবে ফারুক আবদুল্লাহ ছিলেন অদক্ষ, অযোগ্য এবং অদূরদর্শী। তার মুখ্যমন্ত্রিত্ব চূড়ান্ত রকমের প্রশাসনিক অপদার্থতা এবং অত্যাচারের নিদর্শন হয়ে রইল। নির্বাচনের আগে দেওয়া তার উন্নয়নের গালভরা প্রতিশ্রুতি রসিকতায় পর্যবসিত হলো। রাজ্যের প্রতি উদাসীন তিনি গলফ খেলে আর বিদেশ সফর করে সময় পার করতে লাগলেন। আর এ তো জানা কথা— যার মাধ্যমে জনতার চাওয়া-পাওয়া ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে না, জনতা তার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠবেই। কাশ্মীরিরাও ফুঁসতে লাগল ফারুক আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে। কিন্তু অপরিণামদর্শী এই শাসক উপশমের বদলে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

জনতার ক্ষোভ আরো বাড়িয়ে তুললেন বেশ কিছু হিংসাত্মক ও বিস্ফোরক মন্তব্যের মাধ্যমে। এখানে তার কিছু বুদ্ধিহীন মন্তব্যের উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না : 'যেসব মানুষ ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করতে চাইছে, আমি তাদের জ্যান্ত কবর দেব', 'আমার রাজনৈতিক বিরোধীদের আমি পা ভেঙে দিতে পারি', 'আমি লক্ষ লক্ষ মানুষকে জেলে বন্দী করে রাখতে পারি, কারণ, আমার পেছনে ভারত সরকারের মদদ আছে', 'আমি বন্দীদের দিল্লি পাঠিয়ে দেব, সেখানকার অসহ্য গরমে তাদের চর্বি গলে যাবে', 'আমি জাতীয় স্বার্থবিরোধী রাজনীতিবিদদের মেরে পাকিস্তানে তাড়িয়ে দেব'।

মুখ্যমন্ত্রীর এই রকম অসংখ্য মন্তব্যের ঘাইয়ে উত্তাল হয়ে উঠল উপত্যকা। কিন্তু দুর্ভাগ্য কাশ্মীরিদের, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উদ্‌গিরণের নিরাপদ কোনো পথ খোলা থাকল না তাদের সামনে। যারাই অপদার্থ এই প্রশাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল, জেলে বন্দী করে পাশবিক নিপীড়ন চালানো হলো তাদের ওপর। ইয়াসিন মালিক, নামটা মনে রাখুন পাঠক, কাশ্মীরের আগামী দিনের রাজনৈতিক ইতিহাসে যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন, নির্বাচনের পরপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হলো সত্য কথা উচ্চারণ করবার অপরাধে এবং তার ওপর চালানো হলো সীমাহীন নিপীড়ন। 'ইন্ডিয়া টুডে'র এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, গ্রেপ্তারের পরপরই সরকারি কর্তৃপক্ষ আমাকে 'পাকিস্তানি বেজন্মা' আখ্যা দেয়। আমি তাদের বলি, আমি কেবল ভোট দেওয়ার অধিকারটুকু চাই। কিন্তু আমার সে মৌলিক অধিকার চুরি করে নেওয়া হয়েছে। আমি পাকিস্তানের সমর্থক নই; কিন্তু ভারতের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছি।

পীর মোহাম্মদ ইউসুফ, শ্রীনগর কেন্দ্র থেকে যিনি মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা হলো দীর্ঘ ৯ মাস। তার অপরাধ— প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস-ন্যাশনাল কনফারেন্স জোটের প্রার্থী থেকে তিনি বিপুল ভোটে এগিয়ে ছিলেন।

নির্বাচনের আগে-পরের টালমাটাল সেই দিনগুলোতে আসফাক ওয়ানি নামের এক মেধাবী তরুণ অথবা মেধাবী তরুণের ঘটনা তুমুল অভিঘাত তুলল কাশ্মীর উপত্যকায়। রেজাল্ট এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বিশুদ্ধতা সত্ত্বেও তার মেডিকেল কলেজের ভর্তিপ্রক্রিয়া আটকে দেওয়া হলো। আসফাক ওয়ানির অপরাধ— তার বাবা সরকারি কর্তৃপক্ষের ঘুষের ক্ষুধার্ত উদর পূর্ণ করতে পারেনি। কর্তৃপক্ষের চাওয়া ছিল একটি মারুতি গাড়ি। যে মানুষটি পাবলিক বাসের ভাড়া মেটাতে হিমশিম খান, তিনি কীভাবে আস্ত

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

একটি মারুতি গাড়ি উপহার দেবেন কর্তৃপক্ষকে! তিনি ঘুষ দিতে ব্যর্থ হলেন আর ব্যর্থ হলো আসফাক ওয়ানির ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন। কাশ্মীরের আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা জেদি তরুণ আসফাক ওয়ানি কর্তৃপক্ষের নির্লজ্জ এই আচরণে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে, যার পরিণতিতে ভোটের দিন তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। কয়েক দিন পর কল্পিত এক অপরাধের ভিত্তিতে সরকার তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। কল্পিত এই অপরাধটির সংঘটন তারিখ দেখানো হলো ৪ এপ্রিল। অথচ ওই দিন সে পুলিশ হেফাজতে বন্দী। কোনো ধরনের মামলা না চালিয়ে আসফাককে নির্জন সেলে বন্দী করে রাখা হলো নয় মাস। নয় মাস পর আসফাক ওয়ানি যখন মুক্তি পেল, তার সারা গায়ে সিগারেটের ছেঁকার দাগ। নয় মাসের পাশবিক নির্যাতনের ভার বইবার শক্তি ছিল না সুঠামদেহী খেলোয়াড় আসফাক ওয়ানির। রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার আসফাক ওয়ানি তিন বছর পর ত্যাগ করল পৃথিবীর মায়া। আসফাক ওয়ানি চলে গেল বড্ড অসময়ে, কিন্তু জীবিত কাশ্মীরিদের জন্য সে রেখে গেল প্রতিবাদের এক রক্তাক্ত উদাহরণ।

এতক্ষণ যাদের কথা বলা হলো, তাদের প্রত্যেকে ছিলেন ইতিহাসের মনোযোগ পাওয়া ভাগ্যবান মানুষ। নির্যাতন সইলেও ইতিহাসের বিবরণীর দৌলতে তারা গণমানুষের সহানুভূতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু গুরিহাকার আবদুল লতিফ, নির্বাচনী ব্যস্ততা যার এক মাসের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, সেই তিনি ২৩ মার্চ সকালে পুলিশের লাঠির বাড়ি খেয়ে রক্তাক্ত মাথায় পড়ে রইলেন ভোটকেন্দ্রের সিঁড়িতে, মুদিদোকানদার বলে ইতিহাস তার প্রতি মনোযোগ দিল না। কেনই-বা দেবে! ইতিহাস তো রচিত হয় রাজরাজড়াদের জন্য। আবদুল লতিফ পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ কোনো অধিবাসী নন। তার রক্ত, এমনকি তার জীবন, ইতিহাসের কাছে মূল্যহীন। ইতিহাসের পরিসংখ্যানে তিনি সংখ্যার অতিরিক্ত কিছু নন। আর এ কারণে আবদুল লতিফ প্রসঙ্গে ইতিহাস নীরব। কিন্তু এই বই, যা আপনি পড়ে চলেছেন এই মুহূর্তে, তা যেহেতু কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয়, তাই অনিবার্য কারণেই এই বইয়ের পাতায় পাতায় আবদুল লতিফের প্রসঙ্গ উদ্‌যাপিত হয়েছে। সেই আবদুল লতিফ, উত্তেজনায় যিনি বাড়ির সবাইকে রেখে, বউমার বারণ উপেক্ষা করে, ভোর থাকতেই ছুটে গিয়েছিলেন ভোটকেন্দ্রে, একাকী। প্রচারণার দিনগুলোতে জনতার চোখেমুখে যে আবেগ আর উচ্ছ্বাসের দীপ্তি তিনি দেখেছিলেন, ভেবেছিলেন, মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্টের ক্ষমতাপ্রাপ্তি মুহূর্তের ব্যাপারমাত্র। কিন্তু হায়! ভোটকেন্দ্রের কাছাকাছি পৌঁছতেই তার এত দিনের আকাঙ্ক্ষা ও আত্মবিশ্বাস অলীক স্বপ্নে পর্যবসিত হলো। অশ্রুপল্লবিত চোখে তিনি দেখতে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পেলেন— তার স্বপ্নের ভোটকেন্দ্র সেনাবাহিনী দখল করে নিয়েছে। চারদিকে আজরাইলের নখের মতো উদ্ধত বন্দুকের নল। উর্দিপরা মানুষের বুটের মচমচ শব্দে স্তব্ধ ভোটের মাঠ। শব্দও যে কখনো কখনো স্তব্ধতার জন্ম দিতে পারে, এই দিনটি না এলে জানা হতো না আবদুল লতিফের। স্বপ্নভঙ্গ চোখে তিনি চারপাশে তাকাতে লাগালেন। ভোট দিতে না-পারা মানুষগুলোর চোখের মণিতে তিনি ক্ষোভমিশ্রিত হতাশা ও ভীতি দেখতে পেলেন। কেউ একজন দুমড়ে যাওয়া কণ্ঠে তার কানের কাছে ফিসফিস করল— আমাদের সকল পরিশ্রম শেষ হয়ে গেল। কাউকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের ব্যালটের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হলো, এবার আমরা বুলেট হাতে তুলে নেব।

আবদুল লতিফ হঠাৎই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ভোটারাধিকার ফিরে পাবার কর্মযজ্ঞে এক মাস যার দোকান বন্ধ, এই অনাচার এত সহজে তিনি মেনে নিতে পারেন না। শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি ছুটে গেলেন কেন্দ্রের দিকে। সিঁড়ির ওপর রাজ্য পুলিশের সাথে তার উত্তপ্ত তর্কাতর্কি হলো। একটু পর দূর থেকে তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা দেখল, নিরীহ আবদুল লতিফের মাথা বরাবর উঠে যাচ্ছে পুলিশের লাঠি। কয়েকজন চিৎকার করে ছুটে গেল আবদুল লতিফের কাছে। তার আগেই শীতের ঝরা পাতার মতো সিঁড়ির ওপর পড়ে গেল আবদুল লতিফের সংজ্ঞাহীন দেহ।

নির্বাচন উপলক্ষে ছুটি পেয়েছিল আদনান। ভোট দেওয়ার জন্য ও শ্রীনগর থেকে বাড়ি এসেছিল দুদিন আগে। যদিও পত্রিকাগুলো আশার বাণী শোনাচ্ছিল না, তবু এই দিনটি পরিবারকে দেওয়ার জন্য জন্য ও হোস্টেল ত্যাগ করেছিল। সাথে মারিয়ামকে দেখার দুর্নিবার আকর্ষণ তো ছিলই বুকপকেটে লুকোনো।

তিন মাস পর চেনা উঠোনে পা রেখে কেঁপে উঠেছিল আদনানের বুক। এই প্রথম লাগাতার তিন মাস ওর বাড়ির বাইরে থাকা। তিন মাস আগে উচ্চশিক্ষার জন্য কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেলে আদনান বিষণ্ন হয়ে উঠেছিল আর মারিয়ামের চোখে নেমেছিল কান্নার প্লাবন। এই ঘর, এই বাড়ি, এই কাঠবাদামের মায়া আর আপেলবাগানের সৌরভ ছেড়ে আদনান কীভাবে দূরে থাকবে! চেনা সবুজ পর্বত, জানালা খুললেই যে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, ওই পর্বতটিকে সঙ্গে নেওয়া যাবে না? মা-বাবা, ভাইবোন, দাদাজি আর মারিয়ামের সম্মিলনে ভূস্বর্গের বুকে যে আলাদা একটুকরো স্বর্গ গড়ে উঠেছে, এই বেহেশতের হাতছানি আদনান উপেক্ষা করে কীভাবে!

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

যাবার আগের দিন ডিসেম্বরের কনকনে শীতবিকেলে আরাধনার ভঙ্গিতে শিশনাগ খালের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল আদনান ও মারিয়াম। বিচ্ছেদের বেদনায় বরফঢাকা পর্বতের মতো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল দুজনের শ্বাসপ্রশ্বাস। শিশনাগ খালের কুলকুল ধ্বনি এই তীব্র নৈঃশব্দ্যের মাঝেও মিষ্টি একটি সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল আদনানদের খেলার মাঠ। সেখানে ক্রিকেট খেলছিল নতুন প্রজন্মের বাড়তে থাকা কিশোরেরা। বড় হওয়ার পরিক্রমায় যে মাঠের স্বত্ব হারিয়ে ফেলেছে আদনান। মন আগেই খারাপ ছিল। মুঠো থেকে খসে যাওয়া শৈশবের ওই সবুজ চিহ্ন ওকে আরো বিপন্ন করে তুলল। মারিয়াম ওর পিরহানের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিল টুকটুকে লাল রঙের উলের মাফলার। কুশিকাটা দিয়ে গত কয়েক দিন ধরে একটু একটু করে মাফলারটা ও বুনেছিল আদনানের জন্য। নৈঃশব্দ্য ভাঙতে মারিয়াম মাফলারটা বের করে পরিয়ে দিল আদনানের গলায়। আর ফুঁপিয়ে উঠে বলল, শ্রীনগরে অনেক গোলমাল হয়। সাবধানে থাকবে। আর প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি লিখবে।

কথা দিলেও পৃথিবীর সকল উদাসীন প্রেমিকের মতোই কথা রাখতে পারেনি আদনান। এক সপ্তার কথা থাকলেও প্রায়ই ওর দুই চিঠির মাঝখানে দশ দিনের দূরত্ব তৈরি হয়ে যেত। প্রত্যুত্তরে মারিয়ামের চিঠির গা বেয়ে টপকে পড়ত শুধু অভিমানের কান্না।

বুকের ভেতর জন্মস্থান ছেড়ে যাওয়ার হাহাকার ও বিষণ্নতা কিছুদিন জেগে থাকলেও ধীরে ধীরে ক্যাম্পাসের নতুন পরিবেশ ও বন্ধুদের ভিড়ে মিশে গিয়েছিল আদনান। গ্রামে বেড়ে ওঠা আদনানের কল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের কোনো ধারণাই ছিল না। নতুন এই জীবনের সাথে গ্রামে রেখে আসা জীবনের কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছিল না ও। এখানকার জীবন চঞ্চল, গতিময়, উচ্ছৃঙ্খল এবং কলহাস্যে ভরপুর। ক্যানটিনে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রাজনৈতিক আলাপ, ক্যারিয়ারের ভাবনা অথবা দুর্ভাবনা, নারীঘটিত রোমাঞ্চের সংলাপ— এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিন। কিন্তু শত ব্যস্ততার পরও রাতে বালিশে যখন মাথা রাখত আদনান, ওর ভাবনায় হানা দিত মারিয়াম। সবুজে পল্লবিত একটি মেয়ে যদি দুচোখ ভরা প্রতীক্ষা নিয়ে মালবেরির ছায়ায় কোনো ছেলের জন্য পথ চেয়ে বসে থাকে, সেই ছেলের জীবনে কোনো দুঃখই থাকতে পারে না।

ভোটের দুদিন আগে, ২১ তারিখ সন্ধ্যায় উঠোনে পা রাখতেই কাঠবাদামগাছের নিচে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখে আদনান। শুরুতে ও গরু ভেবে চমকে ওঠে। পরক্ষণে মনে হয়, এ তো মারিয়াম, যার অদৃশ্য

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

প্রতিকৃতি সঙ্গে নিয়ে ও ভার্সিটিতে পড়তে গিয়েছিল। মারিয়াম কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে? চিঠিতে আদনান লিখেছিল— ২১ তারিখ বিকেলে ও বাড়ি আসবে। বিকেল থেকেই কি মারিয়াম দাঁড়িয়ে আছে গাছের নিচে?

আদনানকে দেখে লিডার নদীর তরঙ্গ বয়ে যায় মারিয়ামের শিরায় শিরায়। হঠাৎ ও নবীন বাছুরের মতো লাফিয়ে উঠে ছুটে যায় ঘরের দিকে আর চিৎকার করে ডাকতে থাকে নাজনীনকে— খালাজান! ও খালাজান! ভাইয়াজি এসেছে।

আদনানের আগমনী সংবাদে চুপচাপ বাড়িটা মুহূর্তের মধ্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। নূরজাহান ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ভাইয়াকে। নতুন আত্মীয়র মতো হাত ধরে নিয়ে যায় ঘরের মধ্যে। নাজনীন পাশে বসে পুত্রের মাথায় কতক্ষণ বোলাতে থাকেন হাত। পৃথিবীর চিরায়ত স্নেহময়ী মায়েদের মতো ছেলের হোস্টেলের খাবারের বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করেন। এই একটি জিজ্ঞাসায় দেশকাল, ভাষা-সংস্কৃতি আর কাঁটাতারের বিভেদ ছিন্নভিন্ন করে ফেলে নারী। এখানে সকল যুগের সকল বর্ণের নারী অবতীর্ণ হয় অভিন্ন ভূমিকায়। নাজনীন তার প্রথম ভূমিকা সম্পন্ন করবার পর দ্বিতীয় ভূমিকা পালনার্থে প্রবেশ করেন রান্নাঘরে, চায়ের বন্দোবস্ত করতে। ফয়জুল্লাহ ছেলের পড়াশোনার খোঁজখবর নেন। সে ক্যাম্পাস পলিটিকসে জড়াচ্ছে কি না, আকারে-ইঙ্গিতে সেটাও জানতে চান। বাবার প্রশ্নের জবাবে আদনান বিজ্ঞের মতো বলে, আমরা যদি পলিটিকস নিয়ন্ত্রণ না করি, একসময় পলিটিকস আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করবে। দাদাজি নির্বাচনী প্রচারণার কাজে বাইরে ছিলেন, নয়তো অনুমান করা যায়, নাতির দর্শনের সাথে তিনি ঐকমত্য পোষণ করতেন। চাই কি উচ্ছ্বাসে নাতিকে জড়িয়েও ধরতে পারতেন। আদনানের মুখের দার্শনিকসুলভ উক্তি দাদাজির কাছে প্রত্যাশিত হলেও অন্যরা ওই ভারী কথায় অবাক হয়ে যায়। নাজনীন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে থেকে আবার ঢুকে যান তার চেনা পৃথিবীতে। সকলে অবাক হলেও এ বাড়ির একটি মানুষ শঙ্কিত হয়ে ওঠে আদনানের ভবিষ্যৎ চিন্তায়। সেই মানুষটি মারিয়াম। মিছিলের উন্মাদনায় যে কিশোর একদা ঘর ভুলেছিল, রাজনীতির দুর্মর আকর্ষণে সেই মানুষটি আজ প্রেয়সীকে ভুলতে বসলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। মারিয়াম পায়ের নিচের মাটিতে কম্পন অনুভব করে। জানালার পর্দা খামচে ধরে রোধ করে পতনের ধাক্কা। কিন্তু ভোটের দিন সকালে দাদাজির আহত হওয়ার সংবাদে আদনান যখন ছুটে যায় পুলিশ ও আর্মিতে ঘেরা ভোটকেন্দ্রের দিকে, পতনের ধাক্কা সেদিন আর সামলাতে পারে না মারিয়াম। সংকোচ ভুলে আদনানকে থামাতে গিয়ে গেটের মুখে ও আছাড় খেয়ে পড়ে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

দুর্ঘটনার উত্তেজনায় সেদিন আছাড় খাওয়ার দৃশ্যটা সকলের চোখ এড়িয়ে গেলেও তিন দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া দাদাজি পরাজিত সৈনিকের মতো ঘরে ফিরলে ফয়জুল্লাহর কানের কাছে ফিসফিস করেন নাজনীন— মারিয়াম সেদিন আছাড় খেল কেন! আছাড়টা নূরজাহান খেলে স্বাভাবিক ছিল। আদনান ওর সহোদর। কিন্তু মারিয়াম কেন আছাড় খাবে!

সংসারের প্রতি উদাসীন থাকলেও ফয়জুল্লাহর অন্তর্চোখ যে সর্বদা ছড়িয়ে থাকে এ বাড়ির কোনায় কোনায়, এদিন আরেকবার তা প্রমাণের ফুরসত এল। তিনি স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, ওরা পরস্পরকে পছন্দ করে।

নাজনীন বিস্ময়ে চোখ উল্টে বললেন, তুমি টের পেয়েছ অথচ আমি ধরতেই পারলাম না!

তোমাকে আরেকটা খবর দিই। আমাদের পুত্র রায়হান এক দিনও ওর দাদাকে দেখতে হাসপাতালে যায়নি। কেন জানো? রাজনৈতিক বিরোধ। রায়হান ন্যাশনাল কনফারেন্সের ছেলেদের সাথে ওঠাবসা করে।

ইয়াল্লাহ বলে সোফার ওপর বসে পড়েন নাজনীন। আদনান মারিয়ামের বৃত্তান্ত তাকে বিস্মিত করেছে বটে, কিন্তু শঙ্কিত করেনি। মনে মনে খুশিই হয়েছেন এতিম মেয়েটার উপযুক্ত আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে। কিন্তু রায়হানের ইতিবৃত্ত তাকে শঙ্কিত করে তুলল। ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে পারিবারিক এই বিভাজনের অভিশাপ দীর্ঘদিন বয়ে বেড়াতে হবে।

নয়

মাথার ক্ষত দ্রুত সেরে উঠলেও হৃদয়ের ওপর বঞ্চনার যে সুগভীর দাগ পড়েছিল আবদুল লতিফের, সেই দাগ মুছতে অনেক দিন লেগে গেল। ফয়জুল্লাহ জগৎ সম্পর্কে বাহ্যত উদাসীন। আদনান হোস্টেলে। রায়হান ঘোষণা দিয়ে শামিল হয়েছে প্রতিপক্ষের শিবিরে। এমতাবস্থায় কালো রঙের রেডিওটা ছাড়া আবদুল লতিফের কথা বলার কোনো সঙ্গী নেই। চারদিকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর আত্মবিক্রয়ের অজস্র নোংরামির ভেতর দাদাজির মন পড়ে থাকে আদনানের কাছে। দুর্দিনে ছেলেটা যদি পাশে থাকত, অবসরে কথা বলে আহত আত্মাটাকে শান্ত রাখা যেত। মাঝে মাঝে নূরজাহান ও মারিয়াম এসে পাশে বসে। আত্মজার মতো কপালে হাত রাখে আবদুল লতিফের। আবদুল লতিফ আবেশে চোখ মুদে ফেলেন। মুদিত চোখের সামনে তার নেচে ওঠে হারিয়ে ফেলা মায়ের মুখ, হালিমা ছিল যার নাম। তিনিও শিশু

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আবদুল লতিফের কপালে একই কায়দায় স্নেহের হাত রাখতেন। পৃথিবীর আসা-যাওয়ার চিরন্তন খেলায় নিরুদ্দেশ হয়েছেন হালিমা। তার শূন্যস্থান পূরণ করতে মারিয়ামদের মতো নতুন নতুন মানবফুলের আগমন ঘটেছে ধরায়। মেয়ে দুটোর মুখের দিকে চেয়ে চোখে জল আসে আবদুল লতিফের। দুটোরই বাড়বাড়ন্ত শরীর, লিডার নদীর তরঙ্গের মতো প্রতিদিনই একটু একটু করে সোমত্ত হয়ে উঠছে। ওদের দেখে কোথায় চোখ জুড়াবে, তা না আবদুল লতিফের দুর্ভাবনা বেড়ে যায়। এই ভয়ংকর সময়ে মেয়েদের নারী হয়ে ওঠা যে কতটা শঙ্কার, আবদুল লতিফের চেয়ে ভালো আর কে জানে!

কথা দূরে থাক, আজকাল রায়হানের সাথে দেখাই হয় না দাদাজির। বাড়ির অন্যদের সাথে কি হয়? পাড়ায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের নতুন ক্লাব উঠেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে রায়হান ক্লাবে যায়। ফেরে আবার রাত নামলে, ঘুমের প্রয়োজনে। ঘুমের প্রয়োজনটুকু না থাকলে হয়তো সে ঘরেও ফিরত না। সারা দিন ক্লাবের ছেলেদের সাথে সে সিগারেট ফোঁকে আর ক্যারম খেলে। কোনো কোনো দিন স্থানীয় পাতি নেতার 'হাতা' হয়ে কাউকে শাসাতে যায়। কারো হাত-পা ভেঙে আসে। ছোটরা তাকে দেখলে ভয়ে দূরে ছিটকে যায়। হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে ঢোঁক গিলে সালাম দেয়। ঘেন্নায় ফয়জুল্লাহ কথা বলেন না ছেলের সাথে। নাজনীন উপলক্ষ পেলেই হাউমাউ করে কাঁদেন। আবদুল লতিফ উদাস চোখে চেয়ে থাকেন ওর শূন্য বিছানার দিকে। নূরজাহান ভাইকে ঘরে ফেরাবার ব্যর্থ কসরত করে যায়। আর মারিয়াম চায়— রায়হান যেন ঘরে না ফেরে। যে এক জোড়া কুৎসিত চোখ নিয়ে চলাফেরা করে রায়হান, ওই চোখ যতক্ষণ দূরে থাকে ততক্ষণই স্বস্তি।

একদিন ন্যাশনাল কনফারেন্সের কয়েকজন পান্ডা এল বাড়িতে। সঙ্গে এক উঠতি নেতা। নূরজাহান ও মারিয়াম বাড়িতে ছিল না। নতুন কলেজে উঠেছে ওরা। নবীন উত্তেজনায় সময়ের আগেই বেরিয়ে গেছে কলেজে। ফয়জুল্লাহ স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। দাদাজি রেডিওর নব ঘোরাচ্ছিলেন আর নাজনীন রান্নাঘর সামলাচ্ছিলেন। এমন সময় উঠোনে মানুষের কোলাহল। নাজনীন উঁকি মেরে দেখে স্বামীকে খবর দিলেন। ছেলেগুলোকে তিনি চেনেন না। ফয়জুল্লাহ দ্রুত খাবার শেষ করে উঠোনে নেমে এলেন। ওরা এসেছে এই পরিবারটির জন্য বিশেষ এক উপদেশ নিয়ে। উপদেশটি এই— ন্যাশনাল কনফারেন্সের বাইরে ভিন্ন কোনো দলকে এই উপত্যকার মানুষ সমর্থন করতে পারবে না। মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে নির্বাচনে। অতএব, পরাজিত এই দলটির মায়া যত দ্রুত ভুলতে পারবে উপত্যকাবাসী, ততই তাদের জন্য মঙ্গল। এই

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

উপদেশ উপত্যকাবাসীর জন্য যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য এই বাড়ির অধিবাসীদের জন্যও।

সন্তানের বয়সী ছেলেগুলোর প্রচ্ছন্ন হুমকি ও আস্ফালনের মুখে অপমানে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন ফয়জুল্লাহ। এমন দিনও যে আসবে, কখনো কি ভেবেছিলেন তিনি? তার মাথা ঘুরতে লাগল। তার পাকস্থলীর ভেতর গোলাতে লাগল। পেটের নাড়িভুঁড়ি যেন পাক খেয়ে এখনই বের হয়ে আসবে। বারান্দার দেয়াল ধরে তিনি পতনের ধাক্কা সামলালেন। ছেলেগুলোর অশুভ ছায়া অপসারিত হতেই স্বামীর কাছে ছুটে এলেন নাজনীন। স্বামীর হাত ধরে বসাতে যাবেন, ঠিক তখনই গেটের ফাঁকে আটকে গেল তার চোখ। রায়হান। ছেলেগুলো যখন বাড়ির ভেতর এসেছিল, রায়হান দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। ছেলেগুলো যখন প্রস্থান করল, রায়হান শামিল হলো ওদের সাথে। তার মানে ছোকরাগুলোর এই প্রচ্ছন্ন হুমকির পেছনে রায়হানের সমর্থন আছে। একবার মনে হলো স্বামীকে বলবেন। পরক্ষণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন তিনি। এমনিতেই মানুষটা ভেঙে পড়েছেন। পুত্রের এই চূড়ান্ত অধঃপতনের সংবাদ শুনলে তাকে সামলানোই দায় হয়ে যাবে।

ছেলেগুলোর স্পর্ধা এতটাই অপমানিত করল ফয়জুল্লাহকে, দুঃখে-কষ্টে সেদিন আর স্কুলেই গেলেন না তিনি। শুধু যে অপমান করল, তা কিন্তু নয়; বিদ্রোহীও করে তুলল। যার নমুনা পাওয়া গেল ফয়জুল্লাহর পরবর্তী কর্মকাণ্ডে। কাঁপতে কাঁপতে কাগজ-কলম টেনে নিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছেলের কাছে চিঠি লিখতে বসলেন। চিঠিতে পুত্রের প্রতি পিতার একটাই উপদেশ— পুত্র আপন বক্ষে রাজনীতির যে প্রজ্ঞা ধারণ করে চলেছে, অসতর্কতায় প্রজ্ঞার সেই আলো যেন কখনো নির্বাপিত না হয়। বদমাশ এই ছেলেগুলোর ঔদ্ধত্য চূর্ণ করতে দরকার ভিন্ন কোনো রাজনৈতিক দলের উত্থান। আদনান কি সেই দলের সারথি হতে পারবে? চিঠির শেষ বাক্যটি লিখে ফয়জুল্লাহ তখনই ছুটলেন পোস্ট অফিসে। নাজনীন বাধা দিয়ে বললেন, আজই কেন পোস্ট করতে হবে! নূরজাহানদের কলেজের সাথে পোস্ট অফিস। ওদের হাতে দিলে ওরা পোস্ট করে দেবে। কিন্তু স্ত্রীর কোনো কথাই কানে তুললেন না ফয়জুল্লাহ। নিজ হাতে চিঠিখানা পোস্ট করে এসে তবেই তিনি শান্ত হলেন।

বাড়ি থেকে বাবার নামে কোনো খাম আসে না সাধারণত। মায়ের হয়ে নূরজাহান ভাইয়ার নামে চিঠি লেখে আর নিয়ম করে লেখে মারিয়াম। সেই চিঠিগুলো গতানুগতিক, পুনরাবৃত্তিময়। কেমন আছ, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে, খাওয়াদাওয়া ঠিকঠাক করছ তো, শ্রীনগরের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ইত্যাদি। আর যা কিছু গতানুগতিক, পুনরাবৃত্তিময়; তা আনন্দিত করলেও উত্তেজিত করে না। দুদিন পর প্রথমবারের মতো প্রেরকের ঘরে বাবার নাম লেখা চিঠি আদনানকে উত্তেজিত ও সন্দিগ্ধ করে তোলে। বাবা তো চিঠি লেখেন না। তবে কি বিশেষ কিছু ঘটল বাড়িতে! দ্রুত এবং অভ্যস্ত হাতে ও যখন চিঠির ভাঁজ খুলতে থাকে, ঠিক তখনই কাশ্মীরের জেলখানায় এক রোমহর্ষ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বীজ বপিত হয়ে যায়। জেলখানায় বন্দী পাঁচ যুবক মকবুল ভাটের রেখে যাওয়া আমানত 'জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট' বা জেকেএলএফ নামক সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করার সংকল্প করেন। সেই পাঁচ যুবক হলেন ইয়াসিন মালিক, আসফাক ওয়ানি, আবদুল হামিদ শেখ, ইজাজ আহমেদ ও জাভেদ আহমেদ মির। সাতাশির প্রহসনের নির্বাচনের পর তারা বুঝে গিয়েছিলেন, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের জন্য যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন তারা করে আসছেন, সরকারের উদাসীনতা ও সদিচ্ছার অভাবে ব্যর্থ হতে চলেছে তা। সরকারি হিংসাকে এখন জনতার প্রতিহিংসা দ্বারা মোকাবিলা করা ছাড়া কোনো গতি নেই। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য তারা পাকিস্তাননিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে গমন করবেন এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফিরে এসে স্বাধীনতার জন্য করবেন সশস্ত্র সংগ্রাম। ঝড়ের প্রথম আভাস পাওয়া গেল ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে। ফারুক আবদুল্লাহ সরকারের অপশাসন নাগরিক সুবিধাগুলোকে সংকুচিত করে ফেলেছিল। বিশেষত, উপত্যকার সর্বত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ চরমভাবে ব্যাহত হতে লাগল। আগে থেকে যারা বিদ্যুৎ-সেবা পেয়ে আসছিল, তাদের অনেকে বিদ্যুৎ-সেবা থেকে বঞ্চিত হতে লাগল। ফলে, ফারুক আবদুল্লাহ সরকার রাজ্যে বিদ্যুতের দাম বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিল। ১০ জুন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্ত বন্‌ধ্ পালিত হলো শ্রীনগরে। উপত্যকাবাসী বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিল। পুলিশ নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অসংখ্য বিক্ষোভকারীকে হত্যা করল। এই হত্যাকাণ্ড শোকে স্তব্ধ করে দিল রাজ্যবাসীকে। প্রবীণদের তখন মনে পড়ল হরি সিংয়ের শাসনামলের কথা। এত ঠুনকো কারণে হরি সিং কি কখনো কাশ্মীরিদের রক্ত ঝরিয়েছেন? তারা হিসাব মেলাতে ব্যর্থ হলো। নাগরিকদের পক্ষ থেকে ফারুক আবদুল্লাহর কাছে জানানো হলো এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তের দাবি। কিন্তু রাজ্য সরকার তদন্তের দাবি নাকচ করে দিয়ে বলল, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ একদল জাতীয়তাবাদবিরোধী পাকিস্তানপন্থীর কাজ। অতএব, এই হত্যাকাণ্ড বৈধ।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ইয়াসিন মালিকের নেতৃত্বাধীন জেকেএলএফ নিখুঁত চোখে অবলোকন করছিল সকল পরিস্থিতি। যখন এতগুলো মানুষের বুকের তাজা রক্ত ফারুক আবদুল্লাহর হাতে বৈধতা পেয়ে গেল, তখন আর চুপ থাকলে পারল না সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ এই সংগঠনটি। জুলাই মাসে শ্রীনগরের জনবহুল অঞ্চলে প্রথমবারের মতো বোমা বিস্ফোরণ ঘটাল জেলখানায় পাঁচ তরুণের হাতে নবপ্রাণ পাওয়া জেকেএলএফ। পত্রিকাগুলো জানাল— এই বিস্ফোরণ কাশ্মীরের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম সংকেত। পর্যবেক্ষকেরা বললেন, এই বিস্ফোরণের মাধ্যমে উপত্যকায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আগমনবার্তা সরবে ঘোষিত হয়ে গেল।

বিস্ফোরণের ঘটনা উপত্যকাবাসীকে কৌতূহলী ও উৎসাহী করে তুলল। ভোট দিতে না পারার ক্ষত ও ক্ষোভের আগুন তখনো তাদের বুকের ভেতর ধিকধিক করে জ্বলছিল। মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহর গোঁয়ার্তুমি ও দুর্নীতি তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এমন সময় এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা তাদের ক্ষোভ উপশমে টোটকার কাজ করল। তারা জানে না কে বা কারা ঘটিয়েছে এই বিস্ফোরণ। তবে এটুকু তারা বুঝে গেছে, যারাই ঘটাক, তারা যে সরকারবিরোধী লোক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর যা কিছু সরকারকে বিপদ ও বেকায়দায় ফেলে, হোক তা একটিমাত্র বিস্ফোরণ, তাতেই খুশি উপত্যকাবাসী।

কাশ্মীরের অন্য সব অঞ্চলের মতো গুরিহাকার চায়ের দোকানগুলো মুখর হয়ে উঠল বিস্ফোরণের গল্পে। কে বা কারা ঘটাল, কেন ঘটাল, তাদের মতলব কী, নানা প্রশ্নে জমজমাট হয়ে উঠল দোকানের মাচাগুলো। তারা আকাঙ্ক্ষা করতে লাগল, এমন ঘটনা যেন বারবার ঘটে। বিস্ফোরণের ঘটনা গুরিহাকার সকলকে উদ্দীপিত করলেও উদ্দীপ্ত হতে পারল না মারিয়াম। কারণ— আদনান। যে শহরে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে, সেই শহরে আদনান থাকে। আর তাই গুরিহাকার ঘরে ঘরে যখন সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ঘটনার আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে, দোকানে দোকানে নিঃশেষ হচ্ছে চায়ের কাপ, মারিয়াম তখন সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। ডাক্তার বাশারত চাচার বাড়ির দৃষ্টিনন্দন দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে। কতক্ষণ ইতস্তত করে ও কড়া নাড়ল দরজার। চাচিজান ওকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন— আরে মারিয়াম যে! এসো এসো।

মারিয়াম ভেতরে ঢুকল না। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে খুব সংকুচিত কণ্ঠে বলল, চাচিজান, একটু টেলিফোন করা যাবে?

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

এই মহল্লার একমাত্র টেলিফোনটি বাশারত চাচার। আদনান প্রথম যখন শ্রীনগরে পড়তে যায়, মারিয়াম ওর খালার সাথে এসেছিল বাশারত চাচার বাড়িতে, টেলিফোন করতে। ক্যাম্পাস হোস্টেলের রিসেপশনে টেলিফোন করে আদনানকে ডেকে নিয়েছিলেন নাজনীন। সেদিন নাজনীনসহ নূরজাহান ও মারিয়ামও কথা বলেছিল আদনানের সাথে। নম্বরটা সঙ্গেই ছিল মারিয়ামের। বাশারাত চাচির হাতে নম্বর লেখা কাগজটা বাড়িয়ে ধরে মারিয়াম বলল, শ্রীনগর।

চাচিজান ওর হাত ধরে মেহমানখানায় নিয়ে গেলেন। কুশনের ওপর বসিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, একটা টেলিফোনই তো করবে। তাতেই এত সংকোচ। বসো। আমি চা করে আনছি। চা খেয়ে টেলিফোন করবে। খুব জরুরি টেলিফোন নয় তো! কথা শেষ না করেই তিনি রান্নাঘরে চলে গেলেন। মারিয়াম বাধা দেওয়ার ফুরসতটুকুও পেল না। বাশারাত চাচা তখন বাড়িতে নেই, ডিসপেনসারিতে। তাদের তিন বছরের বাদামি চোখের ছেলেটি কৌতূহলী চোখে উঁকি মারতে লাগল পাশের ঘর থেকে। একটু পর মারিয়ামের প্রশ্রয় পেয়ে সে ইতস্তত পায়ে চলে এল এ ঘরে। ছেলেটি এবার অদ্ভুত এক মজার খেলায় মেতে উঠল মারিয়ামের সাথে। একেকবার সে মারিয়ামের হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছুটে যেতে লাগল মায়ের কাছে। প্রত্যেকবার যাওয়ার আগে সে ছড়িয়ে দিতে লাগল বেহেশতি হাসি। জবাবে মারিয়ামও হাসতে লাগল মুখ টিপে। একবার খেলার ছলে ও ধরে ফেলল ছেলেটির হাত। আর অমনি আম্মুজি বলে চিৎকার করে উঠল সে। মারিয়াম তখন গাল টিপে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিল।

চা খেয়ে আদনানের সাথে কথা বলল মারিয়াম। চায়ের আর্দ্রতায় গলা ভেজা থাকলেও আদনান যখন জানাল, বিস্ফোরণের দুই ঘণ্টা আগেও সে দুর্ঘটনাস্থলে বন্ধুদের সাথে চা খাচ্ছিল, ভয়ে মারিয়ামের গলা শুকিয়ে গেল। ও নিচু স্বরে বারবার একই অনুরোধ করতে লাগল— কথা দাও হোস্টেলের বাইরে যাবে না।

এই অনুরোধ রাখা সম্ভব নয়, তবু মেয়েটার উপর্যুপরি অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আদনান কথা দিল, সে আর হোস্টেল ছেড়ে বাইরে যাবে না।

কথা আদনান না রাখার জন্যই দিয়েছিল। আর তাই পরের মাসে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পাওয়া ছুটিতে ও হোস্টেল ছেড়ে গুরিহাকায় চলে এল। সবার সাথে কুশল বিনিময়ের পর সুযোগ বুঝে আকর্ণবিস্তৃত হাসিসমেত ও মারিয়ামকে বলল, হোস্টেল ছেড়ে না বেরোলে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আজ তোমার কাছেই আসতে পারতাম না। অতএব, আমাকে ওয়াদা ভাঙতেই হতো।

পরদিন মারিয়াম একপ্রকার জোর করেই আদনানকে নিয়ে গেল জুরিমঞ্জে, সুফি দেওয়ান শাহর মাজারে। চুলের ফিতার মতো আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ মাড়িয়ে পর্বতের খাঁজে দেওয়ান শাহর মাজার, সেখান থেকে পেহেলগামের লিডার নদীকে মনে হয় সবুজ বনে ক্রমশ হারিয়ে যাওয়া জ্যান্ত অজগর। দাদাজির কাছে শুনেছে মারিয়াম, সম্রাট আকবরের আমলে দেওয়ান শাহ ইরান থেকে এসেছিলেন কাশ্মীরে, ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে। পরে এক কাশ্মীরি মেয়েকে বিয়ে করে এখানেই থিতু হন তিনি। জুরিমঞ্জে স্বামী-স্ত্রী শুয়ে আছেন পাশাপাশি। তাদের কবর ঘিরে গড়ে উঠেছে বিশাল মাজার। দ্বিতীয় বন্ধনীর স্টাইলে বানানো কনক্রিটের পুরোনো গেট। গেট পেরোলেই রুকুর মতো ঝুঁকে থাকা একটি ফারগাছ। তারপরই মাজারের মূল দালান। দালানের ওপরের দিকে জাফরি বসানো ঘুলঘুলি। ঘুলঘুলি দিয়ে সব সময় সুগন্ধি ধোঁয়া বের হয়। লোবান-আগরবাতির গন্ধে বড় কমনীয় লাগে জায়গাটি।

এই অঞ্চলের পাহাড়ে-পর্বতে দেওয়ান শাহকে ঘিরে রটিত আছে অনেক কিংবদন্তি। তিনি নাকি আজ্ঞাবহ এক জিনের সাহায্যে রাতারাতি ইরান থেকে চলে এসেছিলেন কাশ্মীরে। তার বিয়ের আসরেও নাকি উপস্থিত ছিল অসংখ্য আরব্য জিন। রুকুর মতো ঝুঁকে থাকা ফারগাছটি, গেট পেরোলে যার ওপর দৃষ্টি পড়বেই, আদতে গাছটি ছিল নাকি এক দুষ্ট লোক। দেওয়ান শাহর স্ত্রীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাতের কারণে সে চলনশক্তিরহিত বৃক্ষে পরিণত হয়। কৃতকর্মের কারণে গাছ হওয়ার পরও সে ক্ষমার ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে আছে। স্থানীয়রা বলে, যত দিন পৃথিবী থাকবে, তত দিন থাকবে ফারগাছটিও এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত সে ক্ষমা চেয়ে যাবে দেওয়ান শাহর কাছে।

প্রতিদিন শত শত মানতকারী আসে জিয়ারত করতে। কেউ মাজারের গ্রিলে মানতের সুতা বাঁধে, কেউ চুমু খায় সিঁড়িতে, কেউবা কবরের পাটাতনে কপাল ঠেকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ফারগাছের কিংবদন্তি যাদের জানা, তারা ফেরার সময় গাছটির দিকে থুতু নিক্ষেপ করে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

মারিয়াম প্রথমবার এসেছিল দাদাজির সাথে, বাবা-মার জন্য দোয়া করতে। কঙ্কর ছড়ানো গ্রাম্য পথে তিন চাকার ভ্যানই ভরসা। মারিয়ামের পীড়াপীড়িতে আদনান ঠিক করল একটা ভ্যান। শেষ মুহূর্তে সঙ্গী হলো নূরজাহান। মারিয়ামের আজকের মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্য আদনানের নিরাপত্তা। শ্রীনগর দিনকে দিন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। মিছিল, মিটিং, পিকেটিং, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, গোলাগুলি নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে গেছে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

গ্রীষ্মকালীন রাজধানীর। আর এই রাজধানীর পেটের ভেতর থাকে আদনান। মারিয়াম তাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না কিছুতে। মায়ের সূত্রে প্রাপ্ত সোনার লকেট ছিল মারিয়ামের গলায়। জিয়ারত শেষে ফেরার পথে ও গোপনে লকেটটা ছেড়ে এল মাজারের দান বাক্সে। মনে মনে বলল, মায়ের স্মৃতির বদৌলতে হলেও আমার প্রিয়জনকে তুমি ভালো রেখো।

মারিয়াম যখন বিড়বিড় করে দোয়া করছে, তখনো জানে না ফেরার পথে এক রোমহর্ষ বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। ওদের ফিরতি ভ্যানের চোখে ঈদগাহ মাঠ ভেসে উঠতেই আনকোরা এক দৃশ্যের মুখোমুখি হলো ওরা। ঈদগাহ মাঠে এত লোকের সমাগম হয়েছে, যেন ঈদের জামাতের চেয়েও বড় কোনো ধর্মীয় সমাবেশ। অথচ যাওয়ার পথে চরতে থাকা কয়েকটি ভেড়া ব্যতীত আর কিছু ছিল না মাঠে। বিস্ময় আদনানকে নির্বিকার বসে থাকতে দিল না। ও লাফ দিয়ে নামল চলন্ত ভ্যান থেকে। মারিয়াম ও নূরজাহানের বাদামি চোখে ফুটে উঠল ভয়। ইদানীং এমন হয়েছে, কোথাও ভিড় দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে। এই বুঝি কোনো লাশ, মৃত্যুসংবাদ!

জনাকীর্ণ ভিড়ের মুখে থেমে গেল ভ্যান। নূরজাহান ও মারিয়াম এসে দাঁড়াল আদনানের পাশে। শুধু গুরিহাকাই নয়, আশপাশের সব গাঁয়ের মানুষ জড়ো হয়েছে এখানে। অন্তত অনেক অচেনা মুখ দেখে তা-ই মনে হলো আদনানের। স্টেডিয়ামের মতো মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রেখে বৃত্ত রচনা করেছে তারা। লোকমুখে শোনার চেয়ে ঘটনা স্বচক্ষে দেখার প্রতিই আগ্রহ আদনানের। আর তাই দুই বোনকে নিয়ে উঁচু পাথরের ওপর উঠে দাঁড়াল ও। বৃত্তের মাঝখানে ঢোলা আলখাল্লা পরিহিত দশ বিদ্রোহী। মুখোশে ঢাকা তাদের মুখ। সকলের হাতে ভারী কালাশনিকভ। তারা খুব উৎফুল্ল ভঙ্গিতে যুদ্ধের কৌশল ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করছে। বিদ্রোহীদের যুদ্ধকৌশলে এতটাই আপ্লুত জনতা, তারা ক্রমাগত হততালি দিয়ে যাচ্ছে। কুচকাওয়াজ শেষে এক বিদ্রোহী মুখোশ খুলে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। তার শ্মশ্রুমণ্ডিত অভিজাত মুখাবয়ব, বারুদকণ্ঠের বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং ভাষার কারুকাজ এমন প্রভাব বিস্তার করল, মুহূর্তে স্তব্ধতা জেঁকে বসল ময়দানে। বক্তৃতায় তিনি ভারতবিরোধিতা এবং পাকিস্তানপ্রীতির ওপর জোর দিতে লাগলেন। বক্তৃতার পর একজন পরিবেশন করলেন সামরিক সংগীত। সংগীতের বিপ্লবী বাণী কান ভেদ করে জনতার কলিজায় বিদ্ধ হতে লাগল। আদনান চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখল, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে সকলে। এমনকি মারিয়াম, যে কিনা সর্বদা আদনানকে ঘরে রাখতে উদ্‌গ্রীব, তার চোয়ালও শক্ত হয়ে উঠেছে বিপ্লবের অভিঘাতে। ভিড়ের সুযোগে আদনান মারিয়ামের হাত ধরল, চোখে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

রাখল চোখ। এই অমিত তেজ যত দিন থাকবে কাশ্মীরি তরুণীদের চোয়ালে, তত দিন কেউ এই জাতিকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

দলটির নেতা, যিনি একটু আগে অনলবর্ষী বক্তৃতা প্রদান করলেন, তিনি এবার উত্তোলন করলেন পাকিস্তানি পতাকা। আর তার সঙ্গীরা, কালাশনিকভ উঁচিয়ে, আকাশপানে ছুড়তে লাগল ফাঁকা গুলি। গুলি থামতেই যুবনেতা চিৎকার করে বললেন, আজ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। কুচকাওয়াজ, রণসংগীত ও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করলাম। আর আগামীকাল আমাদের কালো দিবস। কালো দিবস বন্‌ধের দিন। এদিন গাড়িঘোড়া চলবে না, দোকানপাট খুলবে না, ছাত্রছাত্রীরা পড়তে যাবে না। সকলে যে যার জায়গা থেকে কালো দিবসের প্রতি ঘৃণা জানিয়ে আমাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

জনতা চিৎকার করে বলতে লাগল, আমরা তোমাদের সাথে আছি। খোদা তোমাদের চিরজীবী করুন। তোমরা কাশ্মীরের সূর্যসন্তান। এতক্ষণ পরে আদনানের খেয়াল হলো আজ আগস্ট মাসের ১৪ তারিখ, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস আর আগামীকাল ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস ভারতের। ওর আর সন্দেহ রইল না, এই যুবকগুলো আজাদ কাশ্মীর থেকে আসা গেরিলা। এরা কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করে পাকিস্তানের সাথে জুড়তে চায়। পরক্ষণে খটকা লাগে আদনানের— ভারতবিরোধিতা কেন সব সময় পাকিস্তানপ্রীতিতে পর্যবসিত হয়! তাহলে কাশ্মীরের স্বাতন্ত্র্য রইল কোথায়! দুই বৃহৎ শক্তির মাঝখানে কাশ্মীর কি আলাদাভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না? ও আত্মপ্রবোধ দেয়, ভারতের মতো পরাশক্তির মোকাবিলায় পাকিস্তানের সাহায্যের বিকল্পও তো কিছু নেই।

ফেরার পথে বাবা-মা ও দাদাজির সাথে দেখা হয় ওদের। তারাও খুব আগ্রহ নিয়ে এসেছেন কুচকাওয়াজ দেখতে। সম্ভবত গুরিহাকার প্রতিটি ঘর থেকেই আজ বেরিয়ে এসেছে মানুষ। দাদাজির কণ্ঠে আজ আনন্দের খই ফুটছে। চলতে চলতে তিনি শিশুদের মতো উচ্ছ্বাস নিয়ে নাতি-নাতনিকে কালাশনিকভের ক্ষমতা ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে বিস্ময়কর সব তথ্য পেশ করতে থাকেন।

বিদ্রোহীদের উসকানিতে এবারের স্বাধীনতা দিবসটি কাশ্মীরিরা কালো দিবস হিসেবে পালন করল। বিদ্রোহীদের সাথে সংহতি জানাতে ফয়জুল্লাহ এদিন আর ছাত্র পড়াতে গেলেন না স্কুলে। মারিয়াম ও নূরজাহান কলেজ বাদ দিয়ে বসে রইল ঘরে। নাজনীন কেটলিভরতি লবণ-চা করে আনলে সকলে বাবার ঘরে এসে বসল। ফয়জুল্লাহর কপালে দুশ্চিন্তার কুঞ্চিত রেখা নজর

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

রাখল চোখ। এই অমিত তেজ যত দিন থাকবে কাশ্মীরি তরুণীদের চোয়ালে, তত দিন কেউ এই জাতিকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

দলটির নেতা, যিনি একটু আগে অনলবর্ষী বক্তৃতা প্রদান করলেন, তিনি এবার উত্তোলন করলেন পাকিস্তানি পতাকা। আর তার সঙ্গীরা, কালাশনিকভ উঁচিয়ে, আকাশপানে ছুড়তে লাগল ফাঁকা গুলি। গুলি থামতেই যুবনেতা চিৎকার করে বললেন, আজ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। কুচকাওয়াজ, রণসংগীত ও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করলাম। আর আগামীকাল আমাদের কালো দিবস। কালো দিবস বন্‌ধের দিন। এদিন গাড়িঘোড়া চলবে না, দোকানপাট খুলবে না, ছাত্রছাত্রীরা পড়তে যাবে না। সকলে যে যার জায়গা থেকে কালো দিবসের প্রতি ঘৃণা জানিয়ে আমাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

জনতা চিৎকার করে বলতে লাগল, আমরা তোমাদের সাথে আছি। খোদা তোমাদের চিরজীবী করুন। তোমরা কাশ্মীরের সূর্যসন্তান। এতক্ষণ পরে আদনানের খেয়াল হলো আজ আগস্ট মাসের ১৪ তারিখ, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস আর আগামীকাল ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস ভারতের। ওর আর সন্দেহ রইল না, এই যুবকগুলো আজাদ কাশ্মীর থেকে আসা গেরিলা। এরা কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করে পাকিস্তানের সাথে জুড়তে চায়। পরক্ষণে খটকা লাগে আদনানের— ভারতবিরোধিতা কেন সব সময় পাকিস্তানপ্রীতিতে পর্যবসিত হয়! তাহলে কাশ্মীরের স্বাতন্ত্র্য রইল কোথায়! দুই বৃহৎ শক্তির মাঝখানে কাশ্মীর কি আলাদাভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না? ও আত্মপ্রবোধ দেয়, ভারতের মতো পরাশক্তির মোকাবিলায় পাকিস্তানের সাহায্যের বিকল্পও তো কিছু নেই।

ফেরার পথে বাবা-মা ও দাদাজির সাথে দেখা হয় ওদের। তারাও খুব আগ্রহ নিয়ে এসেছেন কুচকাওয়াজ দেখতে। সম্ভবত গুরিহাকার প্রতিটি ঘর থেকেই আজ বেরিয়ে এসেছে মানুষ। দাদাজির কণ্ঠে আজ আনন্দের খই ফুটছে। চলতে চলতে তিনি শিশুদের মতো উচ্ছ্বাস নিয়ে নাতি-নাতনিকে কালাশনিকভের ক্ষমতা ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে বিস্ময়কর সব তথ্য পেশ করতে থাকেন।

বিদ্রোহীদের উসকানিতে এবারের স্বাধীনতা দিবসটি কাশ্মীরিরা কালো দিবস হিসেবে পালন করল। বিদ্রোহীদের সাথে সংহতি জানাতে ফয়জুল্লাহ এদিন আর ছাত্র পড়াতে গেলেন না স্কুলে। মারিয়াম ও নূরজাহান কলেজ বাদ দিয়ে বসে রইল ঘরে। নাজনীন কেটলিভরতি লবণ-চা করে আনলে সকলে বাবার ঘরে এসে বসল। ফয়জুল্লাহর কপালে দুশ্চিন্তার কুঞ্চিত রেখা নজর

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

এড়াল না কারো। চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিয়ে জলদগম্ভীর কণ্ঠে ফয়জুল্লাহ বললেন, সামনের দিনগুলো ভয়ংকর হতে যাচ্ছে।

কেমন ভয়ংকর, আব্বুজি? জিজ্ঞেস করল নূরজাহান।

এমন ভয়ংকর, যা আমরা কল্পনাও করতে পারছি না। ফয়জুল্লাহর বলবার ভঙ্গিটা সাপের চোখের মতো শীতল, যা প্রত্যেককে শিউরে উঠতে বাধ্য করল।

আদনান বিজ্ঞের মতো বলল, খারাপ দিনের জন্য ভারত সরকারের দমননীতিই দায়ী থাকবে। বিশেষত এই দশকের ঘটনারাজি— ইন্দিরা গান্ধীর হিন্দুত্ববাদের কাছে আত্মসমর্পণ, কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদীদের পাকিস্তানি চর হিসেবে চিহ্নিত করবার প্রয়াস, কুখ্যাত ৩৫৬ ধারার প্রয়োগ, রাজ্যপাল হিসেবে জগমোহনের জনবিরোধী নীতি, কংগ্রেসের সাথে ফারুক আবদুল্লাহর আঁতাত, প্রহসনের নির্বাচন, বিরোধী দলের ওপর দমন-পীড়ন, রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড, জনগণের কণ্ঠস্বর রোধের সামরিক প্রচেষ্টা— এতগুলো অপঘটনা যখন এক দশকে ঘটে যায়, তখন সেই জনপদের বিদ্রোহ ঠেকাবার সাধ্য কারো নেই।

সন্তানের ভিন্নদৃষ্টি, পড়াশোনা, চিন্তা করার ক্ষমতা এবং গুছিয়ে বলবার প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন ফয়জুল্লাহ। প্রসন্ন চোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন আদনানের দিকে। ছেলেটা তার রাজনৈতিক চিন্তার উত্তরসূরি হতে যাচ্ছে, সন্দেহ নেই।

আমি আমার সন্তানদের নিয়ে ভয় পাচ্ছি। স্বাধীনভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অতিরিক্ত কিছু চাইনি কোনো দিন। ফুঁপিয়ে উঠলেন নাজনীন।

আম্মুজি, স্বাধীনতার স্বপ্ন কাশ্মীরিদের শিরায় শিরায়। এই মুহূর্তে আপনি কী বললেন খেয়াল করেছেন? আপনি শুধু খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কথা বলেননি, বলেছেন স্বাধীনভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কথা। তার মানে আপনি শুধু পশুর মতো খেয়ে-পরে বাঁচতে চান না, খাওয়া-পরাও চান, সাথে চান স্বাধীনতাও। আর এই স্বাধীনতার জন্যই ইতিমধ্যে অনেক কাশ্মীরি তরুণ ঘর ছেড়েছে। নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে তারা আজাদ কাশ্মীরে গেছে ট্রেনিং নিতে। সামনের দিনগুলোতে যাওয়ার এই মিছিল আরো দীর্ঘ হবে বলেই আমার ধারণা। পাকিস্তানের অস্ত্রসহায়তা নিয়ে এরা সশস্ত্র বিপ্লব করতে চায়, ফাইট দিতে চায় ভারতের বিরুদ্ধে। চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়াল আদনান। এ সময় হঠাৎ পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন দাদাজি। তিনি হাঁপাচ্ছেন। হাঁপাচ্ছে তার কালো রঙের বিখ্যাত রেডিওটাও। নাজনীন ব্যস্ত হয়ে বললেন, কী হয়েছে, আব্বুজি? আপনাকে অস্থির লাগছে কেন?

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আবদুল লতিফ ঢোঁক গিলে হড়বড় করে যা বললেন, তা আদনানের কথাকেই সত্যায়ন করল। একটু আগে ভয়েস অব ইন্ডিয়া প্রচার করেছে রোমহর্ষক এক সংবাদ। রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল পাকিস্তান সীমান্তে খুঁজে পেয়েছে অনেকগুলো ভয়ংকর ক্যাম্প, যেখানে আঠারো থেকে ত্রিশ বছর বয়সী যুবকেরা পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। প্রশিক্ষণ চলাকালে উনত্রিশ যুবককে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশ। মুহূর্তে পাণ্ডুর হয়ে গেল সকলের মুখ। আদনান বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের ঘুষি বসিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল— প্রশাসন এখন আরো সতর্ক হয়ে যাবে।

নাজনীন আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন, আল্লাহ, ছেলেগুলোকে তুমি সহি-সালামতে রেখো। এরপর বুকের ওপর হাত রেখে পরম ভক্তি নিয়ে বললেন, হে নবী, তুমি ছেলেগুলোর সঙ্গে থেকো। অদেখা, অচেনা, অনাত্মীয় সেই ছেলেগুলোর জন্য তিনি যে সময় নিয়ে দোয়া করবেন, শোক প্রকাশ করবেন, তার ফুরসত পাওয়া গেল না। তার আগেই যমদূতের মতো বাড়ির ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল পুলিশ। উঠোনে পুলিশি ইউনিফর্ম দেখেই বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠল নাজনীনের। এরা কি আদনানকেও ধরতে এসেছে! তিনি ছেলের ডান হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললেন, তুমি বাইরে যাবে না। খবরদার!

কিন্তু আদনানকে আটকে রাখা গেল না। বাবা-ছেলে দুজন ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মারিয়াম ও নূরজাহান দাঁড়িয়ে রইল দরজা ধরে। নাজনীন সশব্দে আয়াতুল কুরসি পড়তে লাগলেন। মারিয়াম তিন কুল পড়ে উঠোনের দিতে মুখ বাড়িয়ে ফুঁ দিতে লাগল। ফয়জুল্লাহ দুচোখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে বললেন, আপনারা?

আপনিই ফয়জুল্লাহ মাস্টার?

জি, আমিই।

পুলিশ অফিসার কোনো ভূমিকায় না গিয়ে সরাসরি বললেন, একজন শিক্ষক হয়েও ভারত প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা দিবসে আপনি কেন স্কুলে যাননি? কেন ঘরে বসে আছেন? আর আমাদের কাছে অভিযোগ আছে, এ বাড়ির দুই মেয়েও আজ কলেজে যায়নি। কাদের খুশি করতে আপনারা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বর্জন করতে চান?

নীরবতা নেমে এল আঙিনায়। হৃদয়ে না থাকলেও কাগজে-কলমে কাশ্মীর ভারতের অংশ। আর তাই ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করতে কাশ্মীরিরা আইনত বাধ্য। ফলে আইন ভঙ্গকারী ফয়জুল্লাহ মাস্টারের মুখে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তাৎক্ষণিক কোনো কথা জোগাল না। ওদিকে পুলিশ অফিসার ভ্রুতে কুঞ্চন তুলে তখনো তাকিয়ে আছেন গৃহকর্তার দিকে। এ সময় দৃশ্যপটে উপস্থিত হলো মারিয়াম। কপালের ওপর ওড়না টেনে নিয়ে ও বলল, স্বাধীনতা দিবসের ছুটি পেয়ে এ বাড়ির বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছেলে শ্রীনগর থেকে বাড়িতে এসেছে। দুদিন পরই তাকে আবার হোস্টেলে ফিরে যেতে হবে। তাকে যথাযথ সময় দেওয়ার জন্যই আমরা কেউ কলেজে যাইনি। একই কারণে খালুজানও স্কুলে যাননি।

অফিসার বাঁ হাতের তালুতে রুলের বাড়ি মারতে মারতে একটা চক্কর দিয়ে এলেন গেটের কাছ থেকে। তারপর সরু গলায় বললেন, তা বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছেলেটা কে? তুমি? অফিসার আদনানের দিকে মুখ ভেংচি করে তাকালেন।

আদনান শক্ত চোয়ালে বলল, হ্যাঁ, আমি।

তুমি দেখি দেশের আইনকানুনের চেয়েও বড় হয়ে গেছ। তোমার জন্য তোমার পরিবার দেশের আইন লঙ্ঘন করছে। কাল কি ঈদগাহ মাঠে গিয়েছিলে?

কাল আমি দেওয়ান শাহর মাজারে গিয়েছিলাম। আদনান অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দিল।

মাজারে কী?

প্রার্থনা করতে গিয়েছিলাম।

তা মাজারে যাও আর বাজারে যাও, এই মুহূর্তে তোমাদের সবাইকে স্কুলমাঠে যেতে হবে। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে আমরা স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করব।

কিন্তু আমি ওই স্কুলের ছাত্র নই।

তোমার বাবা ওই স্কুলের শিক্ষক। কথা বাড়িয়ো না বেয়াড়া যুবক। এতক্ষণে তোমার বাবাকে গ্রেপ্তার করিনি, এটাই তোমাদের সৌভাগ্য।

নাজনীন ছুটে এলেন আদনানের সামনে। অনুনয় করলেন চুপ থাকার আর আদেশ দিলেন স্কুলে যাবার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবার সাথে আদনান এবং আদনানের সঙ্গে মারিয়াম ও নূরজাহান স্কুলে গেল। পুলিশ বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে প্রত্যেক কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতিদের বাধ্য করল স্কুলে সমবেত হতে। গতকাল যে মানুষগুলো স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ও বাঁধভাঙা উল্লাসে হাজির হয়েছিল ঈদগাহ মাঠে, বিদ্রোহীদের কুচকাওয়াজ উদ্‌যাপন করতে, আজ তারাই একই আদলের ভিন্ন গোষ্ঠীর উৎসবে উপস্থিত হয়ে সাপের মতো ফুঁসতে লাগল। এই ক্ষোভ যে একদিন আগুনের লাভা হয়ে পৃথিবীর স্বর্গকে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে, আমাদের গল্প সেই অগ্নিপথের দিকেই এগোচ্ছে।

দশ

বিদ্যুৎবিহীন ঘরে জানুয়ারির হাড়কাঁপানো শীতে স্থির হয়ে আছে মোমবাতির শিখা। টিনের চালে তুষারপাতের শব্দকে মনে হচ্ছে আজরাইলের পদধ্বনি। অন্য দিন এ সময় নাজনীনের পোষা মোরগ-মুরগির সাড়া পাওয়া যায়। কী ভেবে আজ ওরা স্তব্ধ। দুশ্চিন্তা নূরজাহানকে কাংড়ি জ্বালাতে ভুলিয়ে দিয়েছে। মোমবাতির ম্লান আলোয় বৃত্ত রচনা করে বসে আছে কয়েক জোড়া নির্ঘুম চোখের উৎকণ্ঠিত মানুষ। নাজনীনের চেহারায় থমকে আছে ইতিহাসের বুকখোলা জানালা। সে জানালায় দেখা যাচ্ছে রক্তনদীর স্রোত। নূরজাহানের বারবার মনে পড়ছে দাদাজির উক্তি— আগামীর সূর্যের রং রক্তের মতো লাল হবে।

শ্রীনগর থেকে অনেক দূরের গ্রাম গুরিহাকা। তবু পাহাড়-পর্বত আর সবুজের ঝরনা পেরিয়ে ক্ষণে ক্ষণে কত রকম দুঃসংবাদই না আছড়ে পড়ছে এখানে। কানের কাছ থেকে একমুহূর্তের জন্যও রেডিও সরাচ্ছেন না দাদাজি। বিবিসি ওয়ার্ল্ড একটু আগে প্রচার করেছে ভয়ংকর এক খবর। লালচকের কাছে গাউকাদাল সেতুর ওপর সংঘটিত হয়েছে ন্যক্কারজনক গণহত্যা। হতাহতের সংখ্যা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে এই হত্যাকাণ্ড যে কাশ্মীরের অতীত ইতিহাসের সকল রেকর্ড ভেঙে ফেলবে, সংবাদ পাঠকের কম্পিত কণ্ঠস্বর বলে দিচ্ছে তা। আঁতকে উঠলেন ফয়জুল্লাহ। জনতার ধৈর্য ও সংযমের অবশিষ্ট বাঁধটুকু এবারই বুঝি ধসে গেল পুরোপুরি। এরপর কাশ্মীরি তরুণেরা দলে দলে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে দ্রোহে-বিদ্রোহে ফুঁসে উঠলে তাদের আর দোষ দেওয়া যাবে না। আদনান ও মারিয়ামের জন্য বুক ধড়ফড় করে ফয়জুল্লাহর। এমন দিনে কেন যে ওদের বেরোতে দিলেন তিনি!

ঘটনার পরোক্ষ সূত্রপাত তিন বছর আগে। সাতাশির নির্বাচনে শাসকের কূটচালের কাছে জনতার প্রতারিত হওয়ার পর উত্তপ্ত হতে শুরু করে পরিবেশ। এরপর দিন যত গড়িয়েছে, ভয়ংকর থেকে ভয়ংকর হয়েছে উপত্যকার রাজনৈতিক অবস্থা। ভি পি সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকার দিল্লির মসনদে আরোহণের পরপরই আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক ঘটনা ঘটে যায় কাশ্মীরে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুফতি মুহাম্মাদ সৈয়দের কন্যা ডাক্তার

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

রুবিয়াকে গ্রেপ্তার করে বিদ্রোহীরা। বিদ্রোহীদের একটাই দাবি— ভারতের জেলখানায় বন্দী পাঁচ নেতাকে মুক্তি দিতে হবে। তবেই মুক্তি পাবে রুবিয়া। ভারত সরকার তড়িঘড়ি করে বিদ্রোহীদের সাথে সমঝোতায় বসে এবং পাঁচ বন্দীকে মুক্তি দেয়। বিদ্রোহীরাও তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দেয় মন্ত্রীকন্যা রুবিয়াকে। মুক্ত হয়ে রুবিয়া স্বীকার করেন— বন্দী অবস্থায় তিনি জঙ্গিদের কাছ থেকে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ পেয়েছেন। এই ঘটনা কার্যত ভারত সরকারের কপালে কলঙ্কের তিলক পরিয়ে দেয়। কলঙ্ক মুছতে এবং বিদ্রোহীদের দমন করতে প্রতিশোধপরায়ণ ভারত সরকার ঘটনার এক মাসের মাথায় মুসলিমবিদ্বেষী হিসেবে খ্যাত জগমোহনকে পুনরায় কাশ্মীরের রাজ্যপাল মনোনীত করে। কাশ্মীরিদের জাতীয়তাবাদী চেতনা কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ও সহনশীলতা ছিল না জগমোহনের। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, কেবল বন্দুকের নলই পারে আজাদির স্বপ্নে বিভোর এই বেয়াড়া জাতিকে দমিয়ে রাখতে। দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসে তিনি কাশ্মীরকে বৃশ্চিকদের উপত্যকা আখ্যা দেন। থিতু হওয়ার আগেই সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স ও সীমান্তরক্ষীদের সহায়তায় তিনি বৃশ্চিক নিধনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কতটা ক্রোধ আর প্রস্তুতি নিয়ে তিনি কাশ্মীর এসেছিলেন, অনুমান করা যায় একটি দিনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। শপথ নেওয়ার পরদিনই তার নির্দেশে নিরাপত্তা বাহিনী শ্রীনগরের বাড়ি বাড়ি তল্লাশি শুরু করে। জঙ্গি ধরার নামে এক রাতে তিন শতাধিক নাগরিককে গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকানো হয়। অনেককে জুতা পরার সময়টুকু পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। অনেককে তুলে আনা হয় খাবারের দস্তরখান থেকে। বেশ কয়েক জায়গায় লুণ্ঠিত হয় কাশ্মীরি তরুণীর পবিত্র ইজ্জত।

জগমোহন ভেবেছিলেন, বল প্রয়োগ করলেই সন্ত্রস্ত হয়ে চুপসে যাবে কাশ্মীরিরা। কিন্তু তিনি কাশ্মীরিদের শিরায় শিরায় বয়ে চলা আত্মমর্যাদাবোধের রক্তনাট্য পড়তে ব্যর্থ হলেন। ফলে যা হবার তা-ই হলো। হাজার হাজার কাশ্মীরি জনতা নেমে এল রাজপথে, প্রতিবাদের স্লোগান কণ্ঠে ধারণ করে। আর এমন দিনেই মারিয়ামকে নিয়ে খোশরাগপোরার উদ্দেশে ঘর ছেড়েছে আদনান, যেখানে হারিয়ে গেছে মারিয়ামের বাবা-মা, আদনানের খালা-খালু। যদিও বাড়ির সকলে নিষেধ করছিল আগের দিন থেকেই। কিন্তু ভদ্র ছেলে আদনান এই একটি জায়গায় কারো বাধা-বারণ মানে না। মারিয়ামের এতিম হওয়ার দুঃখের কাছে পৃথিবীর সকল বিপন্নতা ও বিপর্যয় তুচ্ছ। আদনানের এই মনোভাবের খবর রাখে বলেই ওকে ঘরে আটকে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

রাখতে কেউ জবরদস্তি করেনি। কিন্তু পরিস্থিতি এতটা ঘোলাটে হয়ে উঠবে জানলে আর যা-ই হোক, নাজনীন ওদের যেতে দিতেন না। তিনি ফুঁপিয়ে উঠে বলেন, আল্লাহ, আমার ছেলে-মেয়ে দুটোকে তুমি নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে দাও।

দমবন্ধ পরিস্থিতির ভেতর রাত ১১টা বেজে যায়, গাউকাদাল সেতুর ওপর গণগত্যার খবর রটে, তবু ঘরে ফেরে না আদনান-মারিয়াম। নাজনীনের ওপর তখন উন্মাদনা ভর করে। তিনি হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে চিৎকার করে স্বামীর উদ্দেশে বলেন, উপত্যকার এমন অবস্থায় ছেলেটা এখনো ঘরে ফিরল না অথচ বাবা হয়ে তুমি ঘরে বসে থাকবে? রাস্তায় গিয়ে একটু দেখলেও তো পারো!

এই নিশুতি রাতে, বাতাসে যখন বারুদের গন্ধ, ফয়জুল্লাহ জানেন, এই বিশাল উপত্যকার পথে-প্রান্তরে সন্তানকে খুঁজতে বেরোনো বৃথা, তবু এক দুঃখিনী মায়ের তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনার পরশ বোলাতে তিনি অবনত মস্তকে টর্চলাইট হাতে রাস্তায় বের হন। শেষ মুহূর্তে বাবার হাতের ভ্রাম্যমাণ কাংড়ি ধরিয়ে দেয় নূরজাহান। এই ঠান্ডায় কাংড়ি ছাড়া বাইরে বেরোলে বাবা স্রেফ বরফ হয়ে যাবেন। এমন দুঃসময়ে, যখন সকলের চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে, তখন কন্যার এই সাংসারিক বিদ্যা বাবার অশান্ত মনকে খানিকটা হালকা করে তোলে।

একাকী তুষার মাড়িয়ে রাহাপোরা বাজারের দিকে যেতে যেতে ফয়জুল্লাহর মনে পড়ে রায়হানের কথা। এই দুর্দিনে ছেলেটা পাশে থাকলে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। ছেলের প্রতি বিরক্তির বিবমিষায় ছেয়ে যায় তার মন। দুশ্চিন্তায় সকলের প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, ছেলেটা তখন পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। বিচিত্র পৃথিবীর বিস্ময়কর সব নিয়মকানুন। নয়তো রায়হানের মতো ছেলে তার ঘরে কেন আসবে!

ভুতুড়ে অন্ধকারে বাজারের সব দোকান বন্ধ। জুলফিকারের যে চায়ের দোকান সর্বদা মুখর থাকে মানুষের কোলাহলে, আজ তা পরিত্যক্ত ঘরের মতো লাগছে। সেখানে ছুটে বেড়াচ্ছে কয়েকটি ইঁদুর। দোকানের ছাউনির নিচে, চুলোর পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে একটি কুকুর, শীতে কাঁপছে থরথর। কম্পমান কুকুর দেখে মুহূর্তে ফয়জুল্লাহর শীতানুভূতি ফিরে আসে। বুঝতে পারেন, পিরহানের ভেতর দিয়ে তার শরীরে কুটকুট করে হুল ফোটাচ্ছে অজস্র শীতপোকা। ফয়জুল্লাহ চায়ের দোকানের ছাউনির নিচে মাচার ওপর বসে পা ঝুলিয়ে দেন। টর্চ বগলে নিয়ে তিনি দুই হাতের তালু কাংড়িতে ছাঁকেন। ঝাড়া দিয়ে উলের টুপি থেকে তুষার বিদায় করেন। দু-

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

একটা তুষারকণা কুকুরের গায়ে পড়লে সে ঘুমের ঘোরে কুঁইকুঁই করে ডেকে ওঠে। শ্রীনগরের বেশ কয়েক জায়গায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। মারিয়ামের জন্য ফয়জুল্লাহর বুক দুরুদুরু করে। আল্লাহ না করুক, মেয়েটা যদি অমন কোনো শয়তানের খপ্পরে পড়ে যায়! হে মাবুদ, তুমি ওদের হেফাজত করো— বিড়বিড় করেন তিনি।

পেহেলমাগ টু অনন্তনাগ হাইওয়ে থেকে যে রাস্তাটা বাজারের দিকে এসেছে, ফয়জুল্লাহ ওই রাস্তায় কারো ছায়া দেখতে পান। আদনান কি এল তবে? কিন্তু মারিয়াম কোথায়? ও কি তবে সত্যি সত্যি কোনো শয়তানের খপ্পরে পড়েছে? ফয়জুল্লাহ তড়াক করে উঠে দাঁড়ান। ছুটে যান সেদিকে, যেখানে তিনি মানবছায়া দেখেছেন। কিন্তু কাছে যেতেই সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যায় ভোজবাজির মতো। ফয়জুল্লাহ বুঝতে পারেন, স্মৃতিভ্রম হচ্ছে তার। যা ঘটছে না, তা তিনি দেখতে পাচ্ছেন। স্মৃতির সেই বিভ্রমতা সঙ্গী বানিয়ে সারা রাত তিনি কুকুরের সাথে বসে থাকেন জুলফিকারের চায়ের দোকানে। পরদিন কাশ্মীরে এক বিষণ্ন সূর্যের উদয় হয়। বাজার মসজিদের ইমাম ডানে-বাঁয়ে সালাম শেষে পেছনে ফিরে দেখেন, আজকের ফজরের মুসল্লি সর্বসাকুল্যে তিনজন। তাদের মধ্যে একজন আবার ফয়জুল্লাহ মাস্টার, যার মহল্লা ভিন্ন। অমনি তার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। তিনি ফয়জুল্লাহর কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় জিজ্ঞেস করেন, ওরা এখনো ফেরেনি?

বেলা বাড়লেও কর্মচঞ্চল রাহাপোরা বাজার জ্বরতপ্ত ভেড়ার মতো ঝিম মেরে থাকে। চায়ের তেষ্টায় ফজরের পরপরই যে মানুষগুলো ছুটে আসে জুলফিকারের দোকানে, নামাজের মতো আজ তারা চায়ের কাপেও অনুপস্থিত। রাখালেরা আজ গরু নিয়ে চারণভূমিতে যেতে ভুলে যায়। পেহেলগামের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া সকালের প্রথম বাসের চাকা যাত্রীসংকটে থেমে থাকে। নিদ্রামগ্ন পাইনগাছ চোখ মেলে তাকায় অথচ কাশ্মীরি রমণীদের রান্নাঘরে কাসার পাত্রের টুংটাং শব্দ ধ্বনিত হয় না। দুপুর নাগাদ গ্রামের মোড়ে মোড়ে একেকটা রেডিও ঘিরে ছোট ছোট জটলা দেখা যায়। তাদের চেহারায় ভয়ের ছবি। একটা রেডিওর ওপর কয়েকজনের কান। তারা কথা বলে ফিসফিস করে। যেন লালচকে ব্যবহৃত বুলেট উড়ে আসবে এখানেও।

পরদিন বিকেলে বিধ্বস্ত চেহারায় আদনান যখন পা রাখে গুরিহাকায়, ফয়জুল্লাহর রাতের সেই বিভ্রমতাই সত্যি হয়। মারিয়াম ফেরেনি। সন্ধ্যার সূর্যাস্তের মতো একা ঘরে ফিরেছে আদনান। দিনে দিনে মেয়েটির প্রতি এমন মায়া জন্মে গেছে— তার অনুপস্থিতি ফয়জুল্লাহর অস্তিত্বের শিকড় ধরে টান

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

দেয়। ছেলের কাঁধে ঝাঁকুনি মেরে সরু গলায় তিনি জিজ্ঞেস করেন, মারিয়াম কোথায়, মারিয়াম!

ঈদগাহ মাঠের আখরোটগাছের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আদনান। নীরবতার শতাব্দীপ্রাচীন শীতল পাথর চেপে ধরে তার কণ্ঠ। অবরুদ্ধ ওই কণ্ঠে আজ কোনো ভাষা নেই। তার চোখের সামনে ভাসছে কেবল গাউকাদাল সেতুর ভয়ংকর সেই দৃশ্য, যেখান থেকে ও হারিয়ে ফেলেছে জীবনের স্পন্দন মারিয়ামকে।

নাজনীনের মাতৃচোখ। তাই তো মারিয়ামের খবর নিতে ছুটে এসে তার চোখ পড়ে পুত্রের বাহুর ওপর। ওই বাহুর ভেতর কী যেন লুকাচ্ছে আদনান। বাহুতে মায়ের হস্তস্পর্শ পড়তেই ককিয়ে ওঠে আদনান। শার্টের হাতা সরাতেই ভেসে ওঠে ব্যান্ডেজ। অমনি চিৎকার করে ওঠেন নাজনীন, কী হয়েছে হাতে?

আদনানের বাহুর ক্ষত ক্ষণকালের জন্য মারিয়ামের শোক ভুলিয়ে দেয়। নূরজাহান দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনে। নাজনীন গরম ন্যাকড়ার সেঁক দিতে থাকেন ক্ষতে। ফয়জুল্লাহ বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন বারান্দায়। বাড়ির লোকদের আদনান কিছুতেই বোঝাতে পারে না— আঘাত গুরুতর নয়। রাইফেলের সামান্য এক গুলি চামড়া ছুলে বেরিয়ে গেছে। শ্রীনগর থেকে সে ডাক্তার দেখিয়ে এসেছে। এখন ঝুঁকিমুক্ত। এই মুহূর্তে বাহুর ক্ষতের চেয়ে মারিয়ামের জন্য শোকাহত হওয়া বেশি জরুরি। আহত হলেও সে ফিরতে পেরেছে। মারিয়াম যে ফেরেইনি ঘরে।

ভাইয়ের কথা শেষ হওয়ামাত্র চিৎকার করে কেঁদে ওঠে নূরজাহান। মারিয়াম তার সখী, তার বোন। সেই মেয়েটির জীবনপ্রভাতে এ কোন রাত্রি নেমে এল!

সে রাতে এই বাড়িতে ঘুম নামে না কারো চোখে। একটি মেয়ে বাবা-মার কবর জিয়ারত করতে গিয়ে আর ফিরল না ঘরে, সে জীবিত না মৃত, জানা হলো না তা-ও, তার লাশের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না পথে, এর চেয়ে বেদনার খবর আর কী হতে পারে! আদনানের বুকের ওপর তুষারাবৃত আস্ত একটি পর্বত চেপে বসে থাকে সারা রাত। গাউকাদাল সেতু থেকে ছিটকে পড়ার পর কতক্ষণ সে সংজ্ঞাহীন ছিল, মনেও করতে পারে না এখন। তবে মনে পড়ে, কনকনে ঠান্ডায় সুনসান এক নীরবতার ভেতর তার ভেঙেছিল ঘুম। চারপাশে ছড়ানো শক্ত নুড়িপাথর, লাশের স্তূপ, একটু দূরে কুলকুল রবে বয়ে চলা জলের শব্দ। মুখের ওপর জমাট বাঁধা কুয়াশার আবরণ, তাতে ভিজে ওঠা উলের টুপি। বরফঠান্ডায় আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রক্তক্ষরণ।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তখন ঠান্ডার বিরুদ্ধে টিকে থাকাই ছিল আসল চ্যালেঞ্জ। লাশ ডিঙিয়ে, পাথরের টিবি মাড়িয়ে, নদীর পাড় বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে অন্ধকারের আয়নায় আচমকা ভেসে উঠেছিল মারিয়ামের মুখ। তখন একে একে মনে পড়ে যায় সব। এক অগ্নিগর্ভ দিনে খোশরাগপোরা থেকে খালা-খালুর কবর জিয়ারত করে বাড়ি ফিরছিল ওরা। লালচকের কাছে এসে মিছিল ওদের টেনে নিয়েছিল গাউকাদাল সেতুর ওপর। লাল হিজাবের পটভূমিকায় মারিয়ামের উদ্দীপ্ত ফরসা মুখের ওপর মশালের ছায়া ওকে বানিয়ে দিয়েছিল সত্যিকারের যোদ্ধা। মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে ছুড়ে দিয়ে ও দীপ্ত কণ্ঠে স্লোগান তুলছিল— আজাদি! আজাদি! তারপর রাইফেলের দ্রিমদ্রিম শব্দ। হায় মারিয়াম, কোথায় তুমি!

মারিয়ামকে ডাকতে ডাকতে আদনান ছুটে গিয়েছিল সেতুর কাছে। রাতের একটি প্রহর যে কেটে গেছে ইতিমধ্যে, বুঝতে পারে না আদনান। ও ভাবে, মারিয়াম বুঝিবা এখনো সেতুর ওপরেই আছে, আদনানের অপেক্ষায়। কিন্তু হায়, তার প্রিয় কাঠের সেতুটিকে সে এক দিকে কাত হয়ে নদীতে ঝুলতে দেখে। যেন এক মালবেরিগাছ ঝড়ের কবলে পড়ে অস্তিত্ব হারানোর উপক্রম।

কাঁদতে ভুলে গিয়েছিল আদনান। ভূস্বর্গের অপরূপ শ্যামলিমার মাঝেও সে শ্বাস নেওয়ার মতো বিশুদ্ধ বাতাস খুঁজে পাচ্ছিল না। চারপাশে বারুদ আর রক্তের গন্ধ। তার কেবলই দম বন্ধ হয়ে আসে। তার পৃথিবী কবরের মতো ছোট হয়ে আসে। মারিয়ামের অজস্র সুখস্মৃতি ঝিলামের জল হয়ে ওর হৃদয় বেলাভূমিতে আছড়ে আছড়ে পড়ে। তখন ওর দুগাল বেয়ে দরদর করে অশ্রু নামে। মারিয়াম যদি হারিয়ে যায়, চিরকালের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, আদনান বাঁচবে কার জন্য! হঠাৎ কোত্থেকে এক পাগলের আবির্ভাব ঘটে। জায়গাটা ভালো নয়, পালাও পালাও— বলতে বলতে সে খসে পড়া তারকার মতো অদৃশ্য হয়ে যায়। আদনান সংবিতে আসে। মারিয়ামকে খুঁজে পেতে হলে তাকে বাঁচতে হবে। গ্রেপ্তার এড়াতে হবে। হতে হবে সুস্থ। সাবধানী চোখে সে চারপাশে তাকায়। জনশূন্য পথ। পিচঢালা রাস্তায় ছোপ ছোপ রক্তের আলপনা। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো মিছিলকারীদের স্যান্ডেল। বাড়ির কথা মনে পড়ে। দাদাজি নিশ্চয়ই এখনো কানে রেডিও ধরে বসে আছেন। গাউকাদাল সেতুর এই সহিংসতার খবর শুনে না জানি বাবা-মা কেমন দুশ্চিন্তা করছেন!

হঠাৎ কুয়াশা সেঁধিয়ে রাস্তার ওপর সাইরেনের শব্দ এবং সার্চলাইটের চোখধাঁধানো আলো এসে পড়লে আদনানের বুক ধড়ফড় করে ওঠে। এক

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

অনাস্বাদিত ভীতির বিমূঢ়তা মুহূর্তের জন্য ওকে কর্তব্যহীন বানিয়ে দেয়। বৈদ্যুতিক থামের মতো কতক্ষণ ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার ওপর। যখন ওর মুখের ওপর সার্চলাইটের আলো পড়তে যাবে, তখন ওর আড়ষ্টতা কেটে যায়। পথের ধারে একটি ফারগাছের ঝোপ। আদনান তড়িৎবেগে নিজেকে গড়িয়ে দেয় ফারগাছের আড়ালে। ঠিক তখনই আজরাইলের মতো সেতুর মুখে এসে দাঁড়ায় একটি পুলিশ জিপ। আদনান আয়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ নেয়। তাকে গ্রেপ্তার এড়াতে হবে। মারিয়ামের জন্য হলেও তাকে মুক্ত থাকতে হবে। কাঠবাদামের তলে, এক শান্ত নিটোল ঝরনার ধারে তাদের যে সংসার পাতার স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। কয়েকজন পুলিশ জিপ থেকে নেমে ঘুরে ঘুরে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে। সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে একটুক্ষণ পর তারা ফিরে যায়। প্যাট্রল ডিউটি। আদনান বুঝে নেয়— এই পথে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নতুন কোনো বাহিনী আসবে না। মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে ও যখন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে যাবে, ঠিক তখন ফারগাছের গোড়ায় দুমড়ানো-মুচড়ানো একটুকরো কাপড়ের অস্তিত্ব খুঁজে পায় ও। কৌতূহলে কাপড়টি হাতে নিতে নিতে তা হয়ে যায় লাল রঙের এক হিজাব। নিথর হিজাবটি মানবস্পর্শ পেতেই ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে রাখা আতরের গন্ধ ছড়িয়ে দেয় বাতাসে। বিবশ হয়ে যায় আদনান। নিশ্বাসের দূরত্বে নতমুখো মারিয়াম যেন দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, বিভাসিত সৌন্দর্য নিয়ে। তার শরীর থেকে ভুরভুর করে বেরিয়ে আসছে আতরের সুবাস। ফারগাছকে মারিয়াম ভেবে ক্ষণকালের জন্য আত্মলীন হয় আদনান। হিজাবটি মুঠোয় পুরে তাতে নাক ডুবিয়ে গন্ধ নিতে নিতে ও হারিয়ে যায় ভিন্ন কোনো লোকে; যেখানে বারুদের গন্ধ নেই, বুলেটের শব্দ নেই, আছে কেবল শিশনাগ খালের উদ্দাম নৃত্যের কল্লোল, যে কল্লোলে মিশে আছে মারিয়ামের হাসির ঝংকার। আদনান বিড়বিড় করে— মারিয়াম, আবার কবে আমরা পাথরে মুখোমুখি বসে শিশনাগে পা ডুবিয়ে জল ছিটাব! ছবির মতো সেই অপার্থিব দৃশ্যের আর কি জন্ম হবে কাশ্মীরে?

আদনানের সমস্ত অস্তিত্বজুড়ে সাইক্লোন বয়ে যায়— যখন ও দেখে, ফারগাছের গোড়ায় বুট আর ধস্তাধস্তির চিহ্ন, নোয়ানো ঘাস, উৎপাটিত মাটি। গুলিবিদ্ধ বক যেভাবে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মাটিতে পড়ে যায়, আদনানও যেন এক শরবিদ্ধ পাখি, সে থপ করে বসে পড়ে মাটিতে, নোয়ানো ঘাসের ওপর। ওর শরীর থেকে খসে যায় শীতের পালক, ও হারিয়ে ফেলে ব্যথার সকল অনুভূতি। ওর মাথার ওপর ঝুলে থাকে রাত্রির নিবিড়তা। দূরে হুক্কাহুয়া রবে ডাকে একদল ক্ষুধার্ত শিয়াল। শিয়াল কেন ডাকে? মারিয়ামের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

চূড়ান্ত সর্বনাশ কি তবে রচিত হয়ে গেছে! সেই রাতে, লাশের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে পা গলিয়ে আদনান মারিয়ামকে খুঁজতে থাকে। প্রতিটি উপুড় হওয়া লাশের মুখ ঘুরিয়ে ও খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোনো লাশের শরীরে ও মারিয়ামের মুখটি খুঁজে পায় না। আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে— মারিয়াম! নিবিড় অন্ধকারে ওর কণ্ঠস্বর দূরে বহু দূরে ছড়িয়ে যায়, কিন্তু মারিয়াম সাড়া দেয় না।

বিধ্বস্ত দেহমনে শহরের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে আদনান বুঝে যায়, শ্রীনগর এক বিভীষিকাময় রাতের কবলে পড়েছে। শহরজুড়ে দুর্গতদের আর্তনাদ, বারুদের গন্ধ আর বুক হিম করা সাঁজোয়া যানের শব্দ— ভূস্বর্গ যেন এক যুদ্ধবিধ্বস্ত নগরী। বাহুতে রক্তের দাগ আর হৃদয়ে প্রেয়সী হারানোর ক্ষত নিয়ে পুলিশের চোখ বাঁচিয়ে চোরাগলি পথ পেরিয়ে আদনান হাজির হয় ওর ক্যাম্পাসে। ক্যাম্পাস তখন সাপের ফণা। হলের ছেলেমেয়েরা বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষোভ করছে কয়েকটি গেটে। এখানে ওখানে জ্বলছে আগুন। পুরো ক্যাম্পাসজুড়েই তুমুল উত্তেজনা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, মিছিল। নতুন করে স্লোগান দেওয়ার শক্তি ছিল না আদনানের গলায়। ভিড় ঠেলে নিজ হলের সাতাত্তর নম্বর রুমের দরজায় করাঘাত করতে গিয়ে ও টের পেল, যন্ত্রণায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে শরীর। ক্ষতস্থানের ব্যথা তো আছেই, সেতু থেকে ছিটকে পড়ার ব্যথাও ছড়িয়ে আছে সারা শরীরে।

রক্তের দাগ দেখে বন্ধুদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে যায়। অস্বাভাবিক দ্রুততায় ক্যাম্পাস মেডিকেলের এক নবীন ডাক্তার ধরে আনে তারা। ব্যান্ডেজ বেঁধে ডাক্তার দুটো ইনজেকশন পুশ করলে ব্যথা কিছুটা কমে, কিন্তু হৃদয়ের চোরানদীতে রক্তের যে স্রোত বইছে অনর্গল, তার কি উপশম আছে? আদনানের বিশ্রাম দরকার। ঘুমে ওর চোখ বুজে আসে। ক্লান্তিতে ভেঙে আসে ঘাড়। কিন্তু বন্ধুরা ওকে বিশ্রাম নিতে দেয় না। বিশ্রামের জন্য আস্ত জীবন পড়ে আছে। আজকের রাত বিক্ষোভের। আজকের রাত প্রতিবাদের। আদনানকে কাঁধে তুলে বন্ধুরা ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে মিছিল বের করে— আদনানের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না।

স্লোগানের ঝংকারে শূন্যে ভাসতে ভাসতে আদনান ঘুমিয়ে পড়ে। চারপাশে উজ্জীবিত বন্ধুদের চেহারাকে ঘুমের আবেশে মনে হয় মারিয়ামের সজল মুখ, লাল হিজাবে অপ্সরী। এলোমেলো নানা স্বপ্নের কুহক ঠেলে পরদিন সকালে ক্যাম্পাস হলে নিজের বিছানায় ঘুম ভাঙে আদনানের। গুমোট সকালে নাশতা খেতে খেতে বন্ধু আতিকুল্লাহকে খুলে বলে সব— কীভাবে ও গাউকাদাল সেতুতে আক্রান্ত হলো এবং হারিয়ে ফেলল মারিয়ামকে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আতিকুল্লাহ সমবেদনার হাত রাখে বন্ধুর কাঁধে। সান্ত্বনা দেয়, আমরা অবশ্যই মারিয়ামকে খুঁজে বের করব।

দুই বন্ধু সারা দিন চষে ফেরে শ্রীনগরের বাসস্ট্যান্ড, থানা, হাসপাতাল, ভিড়ের প্রতিটি মোড়, এমনকি লাশকাটা ঘর পর্যন্ত। কিন্তু মারিয়ামকে পাওয়া যায় না কোথাও। খোঁজাখুঁজির ফাঁকে বাড়িতে কয়েকবার ফোন করার চেষ্টা করে আদনান। কিন্তু গতকাল থেকেই গোটা নগরজুড়ে টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন। বাড়ির জন্য নতুন দুর্ভাবনা তৈরি হয়। আদনান নিরাপদে আছে— এই সাংবাদটুকু পৌছানো না গেলে ওদের খুঁজতে বাবা অথবা দাদা পথে বেরিয়ে পড়বেন। তাতে জন্ম হবে নতুন বিপদের। আদনানকে তাই ফিরতেই হয় ঘরে। ফেরার আগে বন্ধু আতিকুল্লাহর কাছে রেখে যায় একটি প্রত্যয়। মারিয়ামকে খুঁজতে শিগগিরই সে শ্রীনগর ফিরবে।

আদনানের মুখে গত এক দিনের ইতিবৃত্ত শুনে বাড়ির মানুষগুলো তুষারপাতের মতো নীরব হয়ে যায়। কেবল নাজনীন ওড়নায় মুখচাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন— হায় রে দুর্ভাগা মেয়ে! এ কোন কপাল নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলি!

এগারো

একদিন ভোরবেলা শহরের দেয়ালে দেয়ালে নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তির পোস্টার দেখতে দেখতে এবং পড়তে পড়তে কাজে যায় শ্রীনগরবাসী। মারিয়াম বেগ নামের এক তরুণী ২১ জানুয়ারি গাউকাদাল সেতুর গণহত্যার দিন থেকে নিখোঁজ। তার সন্ধান যদি কেউ দিতে পারেন, একটি পরিবার সন্তান হারানোর বেদনা থেকে পরিত্রাণ পাবে। পোস্টারে মেয়েটির সাদাকালো একটি ছবিও ছাপা হয়েছে। শ্রীনগরবাসী চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যায় কোনো এক দেয়াল অথবা বৈদ্যুতিক থামের সামনে, তারপর বিড়বিড় করে পড়ে পোস্টারের লেখাগুলো এবং ছবি দেখে চেনার চেষ্টা করে মেয়েটিকে তারা কোথাও দেখেছে কি না। কিন্তু তাদের সবারই কপাল কুঁচকে থাকে, কারণ, তাদের কেউই মেয়েটিকে কোথাও দেখেনি। না তারা আগে থেকে চিনত, না তারা নিখোঁজ হওয়ার পর কোথাও দেখেছে।

পুলিশ যদি মেরে গুম করে ফেলে, তাকে আর কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে বলুন— এক-দুজন প্রৌঢ় ফিসফিস করতে করতে হজরতবাল মসজিদের সামনের রাস্তাটা পেরিয়ে যায়। এক বৃদ্ধা একটি পোস্টারের সামনে কতক্ষণ

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর মারিয়ামের মুখের ওপর হাত বুলিয়ে হু হু করে কেঁদে ওঠে। বৃদ্ধাও নিশ্চয়ই হারিয়ে যাওয়া নাতনি খুঁজতে পথে বেরিয়ে অচেনা নাতনির নিখোঁজ সংবাদে ভারাক্রান্ত হয়ে কাঁদতে বসেছে। কান্নাই কি তবে উপত্যকাবাসীর নিয়তি!

আদনান যেদিন গ্রামের কলেজ থেকে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাচ্ছিল, সেদিন ওর হাতে পাসপোর্ট সাইজের সাদাকালো একটি ছবি গুঁজে দিয়েছিল মারিয়াম। শাহাদত আঙুলে ওড়নার প্রান্ত পেঁচাতে পেঁচাতে সিক্ত কণ্ঠে বলেছিল, যখন আমায় মনে পড়বে, ছবির মারিয়াম তোমায় সঙ্গ দেবে। আদনান বড় খুশি হয়ে উঠেছিল ছবিটি পেয়ে। ফিসফিস করে বলেছিল, দূরে থাকলেও তুমি আমার চোখের আড়াল হবে না। মনখারাপের দিনে সঙ্গ দিতে যত্নে রাখা ছবিটি যে একদিন নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তির পোস্টারে ব্যবহৃত হবে, কোনো দিন কি ভেবেছিল আদনান!

ক্যাম্পাসের খেলার মাঠের প্রান্তে সারিবদ্ধ চিনারগাছের পাতার ফাঁকে কুয়াশার আস্তরণ। সেই কুয়াশা-বৃষ্টির মাঝে খালি মাথায় দাঁড়িয়ে গত রাতের কথা ভাবছিল আদনান। আতিকুল্লাহ সঙ্গ না দিলে এক রাত্তিরে কিছুতেই ও লুকিয়ে ছাপিয়ে পোস্টারগুলো সাঁটাতে পারত না। ভাগ্যিস আতিকুল্লাহর মতো কর্মচঞ্চল, তারুণ্যদীপ্ত, সাহসী এক বন্ধু ওকে জুটিয়ে দিয়েছে সময়। যে সময়টা মরুভূমির বালুর মতো উত্তপ্ত। যে সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত তার আগের মুহূর্তটির চেয়ে উদ্বিগ্নময়। প্রিয় শহর শ্রীনগরের জন্য মন খারাপ হয় আদনানের। মোড়ে মোড়ে চেকপোস্ট, বালুর বস্তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা অজগরের জিহ্বার মতো বন্দুকের নল। কনভয়ের চাকায় উৎপন্ন ধুলোয় বিপন্ন টিউলিপবাগান, জাফরানের নিসর্গ। প্রতিটি শহরে এবং গ্রামে হু হু করে গড়ে উঠছে মিলিটারি-প্যারামিলিটারি ক্যাম্প। অটোমেটিক এবং সেমি অটোমেটিক মেশিনগানের ট্রিগারের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে সৈন্যদের নিশপিশ আঙুল। তারপরও কাশ্মীরের প্রাচীরে প্রাচীরে উৎকীর্ণ হচ্ছে সংক্ষুব্ধ স্লোগান : 'বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ'। কোনো কোনো দেয়ালে খচিত হচ্ছে আরেক স্লোগান : 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আমাদের জন্মগত অধিকার'। এই সব প্রতিবাদ, বিক্ষোভ এবং দেয়াললিখনের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড। ঝিলামের ঠান্ডা জলে প্রতিদিনই ভেসে উঠছে অজ্ঞাতনামা লাশের বিকৃত দেহ। বিবিসি ওয়ার্ল্ডের সংবাদ পাঠকের কণ্ঠ ক্রমেই শঙ্কিত ও সরু হয়ে উঠছে। প্রতিদিন কতই-বা আর মৃত্যুর সংবাদ পাঠ করা যায়! এত সব বিপন্নতার মাঝেও সূর্যের কিরণের মতো কোথাও কোথাও আচমকা ঝিলিক দিয়ে উঠছে বিদ্রোহীদের কালাশনিকভের দ্যুতি। এই তো সেদিন,

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ঝিলামে ভেসে ওঠা এক অজ্ঞাতনামার লাশ শনাক্ত করে হলে ফিরছিল আদনান। কয়েক দিনের অস্বস্তিকর বৃষ্টি শেষে সূর্যের আলোধোয়া সেই সকালটা অন্য রকম ছিল। রাজবাগ মোড় পার হতেই সবুজ রঙের একই রকম পোশাকের একদল তরুণের সামনে পড়ে গেল ও। খুব দ্রুতপায়ে রাস্তা পার হচ্ছিল তরুণেরা। সকলে দীর্ঘদেহী এবং উদ্দীপ্ত। আলগা কাপড়ে বাঁধা মুখের একাংশ। প্রত্যেকের কাঁধে ঝুলছে রাইফেল। বুকের সাথে যুক্ত ব্যাজে লেখা জেকেএলএফ। তাদের কারো কারো বয়স আদনানের চেয়েও কম। আদনানের শিরদাঁড়া বেয়ে রক্তের শীতল স্রোত বয়ে গেল ওদের দেখে। এই প্রথম জেকেএলএফের জীবন্ত সদস্যদের স্বচক্ষে দেখে ওঠা ওর। অল্পবয়সী এই ছেলেগুলোই একদল সুপ্রশিক্ষিত দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। কী ভয়ংকর ব্যাপার! মুহূর্তে জটলা তৈরি হলো রাস্তায়। পথচারীরা থমকে দাঁড়াল। একটি বাস এবং দুটো ট্যাক্সি রাস্তার ওপর ব্রেক কষে থেমে গেল আচমকা। বাসের জানালায় উঁকি মারল যাত্রীদের উচ্ছ্বসিত মুখ। সোনারোদের সেই সকালে চোখেমুখে দুর্নিবার কৌতূহল নিয়ে পথচারীরা দেখতে লাগল গেরিলাদের পদযাত্রা। তাদের অধিকাংশের চেহারায় লিডার নদীর ফেনিল ঢেউয়ের নৃত্য। আজ সার্থক তাদের চোখ। যেন এই জীবনে আনন্দময় আর কিছু না দেখলেও তাদের চলবে। কেউ কেউ হাত নাড়িয়ে তাদের অভিবাদন জানাল। বাসের জানালায় চুলখোলা এক তরুণী মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে বলল, তোমরা চিরজীবী হও। আমাদের নবীজি তোমাদের সাথে আছেন। বাতাসের ঝাপটায় তরুণীর বাদামি চুলের গোছা জানালার বাইরে আছড়ে পড়ল। সকালের সোনারোদে তার মুখের গোলাপি আভা ছড়াতে লাগল পাইনবনের সৌরভ। গেরিলাদের এক সদস্য হাত নেড়ে মেয়েটির অভিবাদনের প্রত্যুত্তর করল। হঠাৎ সামনের রাস্তায় হুইসেল শোনা গেলে ঝুপঝাপ পাশের গলিতে হারিয়ে গেল গেরিলাদলটি। আর মেয়েটি অভ্যস্ত চঞ্চলতায় বাসের ভেতর টেনে নিল মাথা। ফটাফট বন্ধ হয়ে গেল বাসের সব কাচের জানালা। টহলরত প্যারামিলিটারির গাড়িটি যখন দৃশ্যমান হলো, রাজবাগ মোড়টি ততক্ষণে আগের মতো কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাস-ট্যাক্সি ছুটছে। পথচারীরা চলছে। দোকানির সাথে দরদাম করছে খদ্দের। অনন্তনাগগামী একটি বাসের হেলপার অনন্তনাগ অনন্তনাগ বলে চিৎকার করছে।

রাজবাগ মোড়ের জীবন দ্রুতলয়ে আগের পোশাক পরে নিলেও বদলকৃত সেই পোশাকে ঢুকতে পারে না আদনান। প্যারামিলিটারির ভয়ংকর হুইসেলও ভাঙতে পারে না ওর ঘোর। আনমনা আদনানের সামনে তখনো যেন হেঁটে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

যাচ্ছে জেকেএলএফের অমিততেজি সদস্যরা আর মারিয়াম বাসের জানালায় মুখ বের করে তাদের অমরত্বের সনদ দিচ্ছে। এমন যদি হতো, আদনান দেশমাতৃকার জন্য যুদ্ধে যাচ্ছে আর পিরহান পরানোর মতো মারিয়াম ওর কাঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছে রাইফেল— সেই দিন কি আসবে কখনো! হায় মারিয়াম, তুমি যদি না থাকো, তবে কার জন্য যুদ্ধে যাব আর কারই-বা উদ্দাম হেঁটে চলার জন্য স্বাধীন করব এই মাটি! কী ভেবে আদনান ওই গলির দিকে ছুটে যায়, যে গলি ঈগলডানার ন্যায় গেরিলাদের লুকিয়ে ফেলেছে আপন পালকের ভেতর। কিন্তু গলিতে একপাল ভেড়ার বিষণ্ন হেঁটে যাওয়া ছাড়া ও অন্য কাউকে খুঁজে পায় না। আনমনা আদনান রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েই থাকে। যখন ওর মগ্নতা ভাঙে, ততক্ষণে এক প্যারামিলিটারির বন্দুকের নল ওর কপাল বরাবর উঠে এসেছে।

হ্যান্ডস আপ।

বন্দুকের নল এবং সৈন্যের কর্কশ উচ্চারণের মুখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায় আদনান। কতক্ষণ ওর মুখে কোনো কথা সরে না। চারপাশ দেখে নিয়ে ও দুই হাত ওপরে তোলে।

নাম কী তোমার?

আদনান। ঢোঁক গেলে ও।

বাড়ি কোথায়?

গুরিহাকা।

জেলা?

পেহেলগাম।

তো শ্রীনগরে কী করো?

পড়তে এসেছি।

কোথায় পড়ো?

কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আইডি কার্ড দেখাও।

অভ্যস্ত ভঙ্গিতে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আইডি কার্ড বের করতে গিয়ে বুক হিম হয়ে যায় আদনানের। ভুলক্রমে মানিব্যাগ হলে রেখে এসেছে। আসলে ঝিলামের জলে আরো একটি লাশের ভেসে ওঠার সংবাদ এতটাই অস্থির করেছিল, মানিব্যাগ ছাড়াই ও বেরিয়ে পড়েছিল বাইরে। ইদানীং নতুন এক দায়িত্ব অনিবার্য করে নিয়েছে ও। ঝিলামে নতুন কোনো লাশের খবর পেলেই ছুটে যায় সেখানে। ভিড়ের ভেতর দুরুদুরু বুকে খানিক তফাত থেকে লাশটি শনাক্ত করার চেষ্টা করে। এমনও তো হতে পারে, অভাগা মারিয়াম

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

অনেক দিন ডুবে থাকার পর সূর্যের আলো গায়ে মাখতে ভেসে উঠেছে। মাঝে মাঝে নিজের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় আদনান। একটি রাত কীভাবে লন্ডভন্ড করে দিল ওর সাজানো স্বপ্ন! পৃথিবীতে অনেক রকম কলঙ্ক আছে। প্রেমিকার লাশের জন্য বেঁচে থাকার মতো কলঙ্ক আর কিছুতে কি আছে?

মরুপথে উট হারানোর বিপন্নতা নিয়ে আদনান আইডি কার্ড খোঁজে। সব পকেট তন্ন তন্ন করে খোঁজে। কিন্তু শীতের সকালে ওর কপালে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম বলে দেয়— প্রেয়সীর লাশ খুঁজতে এসে ও বেঁচে থাকার সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ ওর শার্টের কলার ধরে হ্যাঁচকা টান মারে সৈন্যটি। শালা সন্ত্রাসী! গাড়িতে ওঠ! স্যার, আমাদের ইনফরমার ভুল তথ্য দেয়নি। এই শয়তানটা পাকিস্তানি চর। সৈন্যটি গাড়িতে থাকা অফিসারের দিকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করে বলে কথাটা।

আমি পাকিস্তানি চর না। পাকিস্তানি রাজনীতিকে আমি ঘৃণা করি। চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাতে চায় আদনান। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় ও এতটাই অসাড় হয়ে গেছে, ওর কণ্ঠে কোনো বাক্য ধ্বনিত হয় না। ও বুঝতে পারে, ভাগ্য যে অন্তিম অনিবার্যতা লিখে রেখেছে ললাটে, তা অত্যাসন্ন। তখন ওর ধূসর মস্তিষ্কের ওপর বেগুনি রঙের প্রচ্ছায়া পড়ে। দুপাশে বয়ে যাওয়া রাস্তা, রাস্তা ধরে গড়ে ওঠা হরেক দোকানের সারি, তেলে ভাজা স্ট্রিট ফুডের মায়াবী গন্ধ— সবকিছুকে মনে হয় জাফরানের খেত। জাফরানের থোকা থোকা বেগুনি ফুলের প্লাবনে ঝুড়ি হাতে কেশর তোলায় ব্যস্ত কিষানি মারিয়াম। বেগুনি রঙের সমুদ্রে অবগাহন করতে আদনানকে ডাকছে কিষানিটি। সম্মোহিত আদনান বেগুনি রঙের সমুদ্রের দিকে এগোতে গেলে গাড়ি থেকে আরো দুজন সৈন্য বন্দুক হাতে ছুটে আসে। ঠিক তখন দৈবলোকের ওপার হতে তিনটি বুলেট এসে বিদ্ধ হয় তিন সৈন্যের বুকে। তাদের বুক থেকে ছলকে ওঠে জাফরানের কেশরের মতো টকটকা লাল রক্ত। বুলেটের শিসকাটা শব্দ আদনানের মস্তিষ্ক থেকে জাফরানখেতের প্রহেলিকা দূর করে দেয়। সদ্য স্টার্ট নেওয়া বাসের মতো ওর শরীর তীব্রভাবে ঝাঁকুনি খায় ভয়ে। কতক্ষণ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আপন জায়গায়। ওর চোখের সামনে তড়পাতে তড়পাতে মারা যায় তিনটি মূল্যবান সৈন্য, আক্রমণ প্রতিহত করতে গাড়ির অবশিষ্ট সৈন্যরা প্রস্তুতি নেয় যুদ্ধের, অথচ আদনান তখনো ঘোরগ্রস্ত। আজ যা কিছু ঘটছে, সব যেন স্বপ্নলোকের গল্প। আধা সেকেন্ড পর ঘোর ভাঙলে আদনান বুঝে যায়, জায়গাটি এখন আর রাজবাগ মোড় নয়, এটি রণক্ষেত্র। এখান থেকে যত দ্রুত সরে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল। ভাবতেই, একবার আল্লাহকে ডেকে নিয়ে দৌড় শুরু করে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আদনান। বুঝতে পারে, পেছন থেকে ছুটে আসা একটি বুলেট ওর ভবলীলা সাঙ্গ করতে যথেষ্ট। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, গাড়ি থেকে কোনো বুলেট ছুটে আসে না। আসলে নিরস্ত্র আদনানের চেয়ে অদৃশ্য অস্ত্রধারীরা তখন সৈন্যদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা তখন ব্যস্ত বুলেটের উৎস অনুসন্ধানে। আর তাই বুলেটের খুব কাছ থেকেও এ যাত্রা বেঁচে যায় আদনানের প্রাণ। রাস্তা পেরিয়ে একটি দরজির দোকানের সামনে যেতেই হঠাৎ আকাশকাঁপানো বিকট শব্দ হয়। ও পেছন ফিরে দেখে প্যারামিলিটারির গাড়িটি সহসা আগুনের গোলা। গোলাটি শূন্যে উঠে আছাড় খেয়ে পড়ছে আর সৈন্যদের ছিন্নভিন্ন দেহ কাবাব হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে পুরো বাজারে। তার পরপরই সবকিছু স্তব্ধ।

ক্যাম্পাসের খেলার মাঠ থেকে আদনান কয়েক কদম সামনে এগোয়। সেই বিচ্ছিন্ন কবজির কথা ও ভুলতে পারে না, রাজবাগ মোড়ের রণক্ষেত্রে যে কবজিটি ওর মুখের ওপর আছড়ে পড়েছিল। একমুহূর্তের ওই রোমহর্ষ ঘটনার কবলে পড়ে আদনান রাতারাতি বড় হয়ে গেছে যেন। যার আহত হওয়ার দূরত্বে আস্ত একটি গাড়ি বিস্ফোরিত হয় এবং ছিন্নভিন্ন লাশের একটি অঙ্গ ছিটকে এসে যার মুখের ওপর পড়ে, তার বড় না হয়ে উপায়ই থাকে না। হঠাৎ বড় হওয়ার দুঃসাহস পুঁজি করে বন্ধু আতিকুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে কারফিউয়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে তাই ও নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তির পোস্টার সাঁটাতে পেরেছে গেল রাতে।

আদনানের জুতার নিচে লকলকে সবুজ ঘাসের মখমল। ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু শিশির। চুলের ডগায়ও শিশিরের কুহক। ওর ফরসা গাল বেয়ে চুইয়ে পড়ছে ভোরের নামাজের আলো। ও জানে না আর কত দিন মারিয়াম দখল করে রাখবে ওর প্রার্থনা। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে আতিকুল্লাহ। চোখেমুখে উত্তেজনা নিয়ে বলে, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আর আমি সারা ক্যাম্পাস তোমাকে খুঁজে মরছি।

কোথায় যাবে? ঝিলামের তীরে নতুন কোনো লাশ? নিয়তির প্রতি বিদ্রূপ করেই যেন কথাটা বলে আদনান।

হজরতবাল মসজিদ চত্বরে হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী জনতা জড়ো হয়েছে। তারা স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা করতে একটু পরই নুরুদ্দীন সুফির দরগাহর উদ্দেশে যাত্রা করবে। আমরাও শামিল হব সেই অভিযাত্রিক দলে। চলো চলো।

নুরুদ্দীন সুফির প্রসঙ্গ আসতেই ভক্তিতে মুখ আনত হয়ে আসে আদনানের। শ্রীনগর থেকে পশ্চিমে এক ঘণ্টার দূরত্বে চারার শহরে নুরুদ্দীন সুফির দরগাহ। নুরুদ্দীন সুফি মাতৃগর্ভ থেকে এমন এক অদ্ভুত জীবনদর্শন

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

নিয়ে এসেছিলেন, শৈশবে তাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করা হলে তিনি আলিফের অতিরিক্ত কোনো হরফ পড়তে অস্বীকৃতি জানান। ওস্তাদজির কাছে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, আল্লাহ এক; তাই এক আলিফের অতিরিক্ত ভিন্ন কিছু শেখার প্রয়োজন তার নেই। যৌবনে সমাজ-সংসার ত্যাগ করে দীর্ঘ ১২ বছর তিনি নির্জন গুহায় ইবাদতে মগ্ন থাকেন। এ সময় ইরান থেকে আসা সুফি মির মোহম্মদ হামদানির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। হামদানির কাছে তিনি ইসলাম ও ইসলামের নবীর জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত পাঠ গ্রহণ করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর ঘটনা সেটি। তখন ইসলামের প্রত্যুজ্জ্বল দীপশিখা হাতে মধ্য এশিয়া থেকে দলে দলে সুফিরা আসছেন ভারতবর্ষে, ছড়িয়ে পড়ছেন গ্রাম-গঞ্জ-শহরে। তাদের দেখাদেখি নুরুদ্দীন সুফিও বেরিয়ে পড়েন কাশ্মীরের পথে-প্রান্তরে। অন্যান্য ভিনদেশি দরবেশদের তুলনায় নুরুদ্দীন সুফি অতি সহজে মিশে যেতে থাকেন মানুষের মাঝে। কারণ, তিনি স্থানীয়। তার ধর্মপ্রচারের মাধ্যম স্থানীয় ভাষা, লোকাচার ও সংস্কৃতি। ফলে, অল্প দিনের ব্যবধানে তিনি কাশ্মীরের প্রভাবশালী, জনপ্রিয় এবং কিংবদন্তি সুফিতে পরিণত হন। মৃত্যুর পর তার লাশ বহনের খাটিয়া ধরতে প্রাসাদ থেকে নেমে আসেন কাশ্মীরের তৎকালীন শাসক জয়নুল আবেদিন। জীবনের অন্তিম কয়েকটি বছর যে শহরে তিনি অতিবাহিত করেন, সেই চারার শহরে তাকে দাফন করা হয় এবং তার স্মৃতির সম্মানে সেখানে বানানো হয় একটি দরগাহ, যা চারার-ই-শরিফ নামে পরিচিত। চারার-ই-শরিফের মতো অসংখ্য মাজারের পাবিত্রিক আবহ বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোটা কাশ্মীর উপত্যকা। কাশ্মীরিদের রক্তের মধ্যে যে অধ্যাত্মবাদ, মরমি চেতনা, পরম সহিষ্ণুতা ছড়িয়ে আছে, তা এই সুফিদের প্রভাবেই। হাজার বছরের পথপরিক্রমায় ইরান, তুরান, আরব থেকে আসা, সংসার ভোলা এই সব দরবেশের সংস্পর্শে এসেই কাশ্মীরিরা অর্জন করেছে সুফি চৈতন্যের অনন্য পরশমণি। যে পরশমণির খোঁজে আদনান সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ে পথে। জানা-অজানা দরগাহ সামনে করে হাত তুলে মগ্ন হয় প্রার্থনায়। আজ যখন অমন একটি সম্মিলিত প্রার্থনার সুযোগ আসে, যার উপলক্ষ আবার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, এমন সুযোগ কিছুতে হাতছাড়া করে না আদনান।

মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে কাফনাবৃত কয়েকজন যুবক। তাদের সাদা পোশাক থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে আলোর অপার্থিব দ্যুতি। যেন কোনো এক দরগাহর কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা জীবন্ত পুণ্যাত্মা। যুবকদের প্রতিটি পদক্ষেপ, স্লোগান, অঙ্গভঙ্গি মুগ্ধতা বাড়ায় আদনানের। বন্ধু আতিকুল্লাহকে নিয়ে ও এগিয়ে যায় সামনের সারিতে। সাদার মাঝে ওদের রঙিন পোশাক

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বেখাপ্পা দেখালে আফসোস হয় আদনানের। আগে থেকে জানলে এক প্রস্থ কাফনের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারত ও। তাতে মিছিলের নেতৃত্ব দেওয়া যুবকদের ভেতর সহজে মিশে যেতে পারত। কাফনবিষয়ক আফসোসের ভেতরই এক প্রৌঢ় কোত্থেকে এক বোঁচকা কাফন নিয়ে হাজির। বোঁচকাটা উঁচু করে ধরে প্রৌঢ় উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলেন, যারা সামনের দিকে আছ, কাফনের কাপড় পরে নাও। জীবনে অনেক কাফন বিক্রি করেছি। এগুলো আজাদির জন্য উৎসর্গিত।

প্রৌঢ়ের আহ্বান লুফে নেয় আদনান ও আতিকুল্লাহ। দুজন দুই খণ্ড কাফন পরে নব-উদ্যমে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেয়। পেছন ফিরে ওরা দেখে, ওদের মতো হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় পথে বেরিয়ে এসেছে। সামনের মোড়টা পার হয়ে ওরা জানতে পারে, কাশ্মীরের প্রতিটি অঞ্চলই আজ নিকটবর্তী দরগাহর উদ্দেশে মিছিল বের করেছে। মিছিল শেষে দরগাহে গিয়ে তারা স্বাধীনতার জন্য দোয়া করবে।

শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে গাছপালায় আচ্ছাদিত গ্রাম্য সজীবতার মধ্যে ঢুকতেই অভূতপূর্ব এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় মিছিলটি। গ্রামের নারী এবং শিশু, যারা মিছিলে অংশ নিতে পারেনি, তারা মানবফটকের মতো করে পথের দুপাশে সার ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কারো হাতে পানির পেয়ালা, কারো হাতে খাবারের পাত্র, কারো হাতে ফুলের ডালি। তরুণীরা চাল ও চিনির সহযোগে তৈরি সাদা শিরনি তুলে দিচ্ছে মিছিলকারীদের মুখে, যা কেবল বিয়ের অনুষ্ঠানে বরযাত্রীর জন্য প্রস্তুত করা হয়। কিশোরীরা কেশরবিযুক্ত জাফরান ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দিচ্ছে পথে। অনেক মা কোলের শিশুকে সামনে বাড়িয়ে বলছে, আমাদের সন্তানকে আজাদির জন্য উৎসর্গ করলাম। এরা বড় হতে হতে যদি কাশ্মীর স্বাধীন না হয়, তবে এরাও যুদ্ধে যাবে। অনেক বোন তাদের ছোট ভাইয়ের চিবুক স্পর্শ করে বলছে, আমরা আমাদের ভাইদের বড় করছি আজাদির জন্য। এরা বড় হতে হতে যদি কাশ্মীর স্বাধীন না হয়, তবে এরাও যাবে যুদ্ধে।

আজাদির জন্য পাগলপারা এই জাতির ভালোবাসার নজরানা দেখে চোখে জল এসে যায় আদনানের। ও চোখ মুছে ফিসফিস করে বন্ধু আতিকুল্লাহকে বলে, আজকের মিছিল কাশ্মীরের হৃদয়কে নতুন করে চিনিয়ে দিল। এরপরও যদি এই জাতি পরাধীনতার নাগপাশে বন্দী থাকে, তবে তা হবে ইতিহাসের বেদনাবিধুর ঘটনা।

নুরুদ্দীন সুফির দরগাহর সামনে গিয়ে শেষ হলো মিছিলের অভিযাত্রা। সম্পূর্ণ কাঠের অবকাঠামোয় তৈরি নুরুদ্দীন সুফির নান্দনিক মাজার। কাঠের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

জানালা, ছাদ এবং দেয়ালে উৎকীর্ণ দৃষ্টিনন্দন ক্যালিগ্রাফি শত বছর ধরে ইসলামি স্থাপত্যকলার বৈভব ছড়িয়ে যাচ্ছে। একটু পর, আগরবাতির গন্ধ, জনতার মোনাজাত, ফোঁপানো কান্নার ধ্বনি, থেমে থেমে জেগে ওঠা অনিরুদ্ধ আর্তনাদের মাঝে ভয়ংকর নৈঃশব্দ্য জেঁকে বসল দরগাহ প্রাঙ্গণে। ক্যালিগ্রাফি-উৎকীর্ণ খিলানের দিকে চেয়ে আদনান হারিয়ে গেল চারশ বছর পেছনের পৃথিবীতে, নুরুদ্দীন সুফির প্রেমময় আহ্বানে যে পৃথিবীর হিন্দু-মুসলিম এক পেয়ালায় জল খেত আর এক চাঁদোয়ার নিচে উৎসব করত। আজকের মিছিলটি ও সেই সব হিন্দু পণ্ডিত বন্ধুর নামে উৎসর্গ করল, যুদ্ধ শুরুর পর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার আশঙ্কায় ক্লাসরুম শূন্য করে যারা চিরদিনের জন্য কাশ্মীর ছেড়ে চলে গেছে। যুগে যুগে যুদ্ধ এভাবেই মানুষের শিকড়কে উৎপাটন করে।

বারো

জেকেএলএফসহ অন্যান্য বিদ্রোহী গ্রুপ কর্তৃক হিন্দু পণ্ডিতদের হত্যাকাণ্ড, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া ও অত্যাচার-নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে হাজার হাজার পণ্ডিতের রাজ্যত্যাগ এখন কাশ্মীরের আলোচিত ঘটনা। একটা সময় কাশ্মীরের সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিল আদনান। কিন্তু মারিয়াম হারিয়ে যাওয়ার পর চেতনে হোক কিংবা অবচেতনে, আদনান সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। এখন আর সে পত্রিকা পড়ে না, খবর শোনে না, রাজনৈতিক আড্ডায় অংশগ্রহণ করে না। তবু প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার সূত্রে ও যেহেতু শ্রীনগরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সচেতন সমাজের মধ্যে বসবাস করে, না চাইলেও কাশ্মীরের টালমাটাল রাজনৈতিক খবর ওর কানের কাছে গড়িয়ে পড়েই। বিশেষত, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার উৎপীড়িত পণ্ডিতদের জন্য সরকারঘেঁষা পত্রিকাগুলোর আহাজারি ও এড়িয়ে যেতে পারে না। আজাদির জন্য যারা আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করেছে, অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, তাদের প্রতি শুরু থেকেই সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল আদনানের। কিন্তু ইদানীং বিদ্রোহীদের হাতে হিন্দু পণ্ডিতদের অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনা ও কিছুতে মেনে নিতে পারছে না। যে জুলুমকে প্রতিহত করবার জন্য তাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, সেই তারাই যদি সুযোগ পেয়ে দুর্বলের রক্ত ঝরায়, তবে জালেমের সাথে তাদের পার্থক্য রইল কোথায়। ফলে, বিদ্রোহীদের প্রতি তার যে বুকভরা ভালোবাসা ছিল, ভালোবাসার সেই

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বাঁধন ঢিলে হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মনের ব্যথাটা একদিন উপস্থাপন করে বন্ধু আতিকুল্লাহর সামনে— জেকেএলএফ আমাকে হতাশ করল। তাদের কাছ থেকে এমন আচরণ আশা করিনি।

জেকেএলএফ আবার কী করল? ভ্রু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করে আতিকুল্লাহ।

কী করছে, সেটা আমার থেকে তুমি ভালো জানো।

তোমার মুখেই শুনি না!

আমাদের অনেক হিন্দু বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছে। আমাদের এত বছরের অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য...

তো এর সাথে জেকেএলএফের কী সম্পর্ক?

জেকেএলএফের ভয়েই তো ওরা পালাচ্ছে।

তুমি ভুল জানো।

ভুল!

হ্যাঁ, ভুল। আতিকুল্লাহ একটু থামে। চারপাশে তাকিয়ে দেখে নেয় মানুষের অবস্থান। কথা হচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সিঁড়িতে। ব্যস্ত সিঁড়ি। হরদম মানুষের যাওয়া-আসা চলছে। একটু নির্জনতার জন্য ওরা হাঁটতে হাঁটতে সামনের উইলোগাছের নিচে পাতা একটি কাঠের বেঞ্চের ওপর বসে। তারপর আবার বলতে শুরু করে :

বিভিন্ন পত্রিকায় বলা হচ্ছে, কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চরম অবনতি ঘটেছে। জঙ্গিরা বারোশ পণ্ডিতকে হত্যা করেছে। ধ্বংস করেছে পঞ্চাশটির বেশি মন্দির। প্রায় তিন লক্ষ পণ্ডিত জীবনের ভয়ে উপত্যকা ছেড়ে পালিয়েছে। তারা আশ্রয় নিয়েছে জম্মু, দিল্লিসহ দেশের বিভিন্ন শহরে। কাশ্মীরের মুসলমানদের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ নিঃসন্দেহে গুরুতর। সুফি-সাধকদের রাহস্যিক ঐতিহ্যের প্রভাবে এই উপত্যকায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিন্দু-মুসলমান অত্যন্ত সহনশীলতার সাথে বসবাস করে আসছে। গোঁয়ার জঙ্গিদের কারণে ঐতিহ্যের সেই মালা যদি ছিঁড়ে যায়, তা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। তবে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ একপেশে কি না, এর মধ্যে সত্যের অপলাপ হয়েছে কি না, তা-ও একটু খতিয়ে দেখা দরকার। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এই উপত্যকায় বসবাসকারী হিন্দু পণ্ডিতদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজারের কিছু কম। জনসংখ্যাই যদি দেড় লক্ষ না হয়, তবে 'সানডে' পত্রিকা কীভাবে তিন লক্ষ পণ্ডিতের রাজ্যত্যাগের কথা বলতে পারে! হিন্দু পণ্ডিতেরা রাজ্য ত্যাগ করছে না, সে কথা বলছে না কেউ। লক্ষ লক্ষ না হলেও হাজার হাজার পণ্ডিত ইতিমধ্যে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কাশ্মীর উপত্যকা ত্যাগ করেছে। কিন্তু এর পেছনে যতটা না দায় আছে জেকেএলএফের, তার চেয়ে বেশি দায় রাজ্যপাল জগমোহনের।

জগমোহনের!

হ্যাঁ, জগমোহনের।

জগমোহন দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতা পেয়েই ঘোষণা করলেন— জঙ্গিদের হাত থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের রক্ষা করা সম্ভব নয়, তাই তাদের নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া উচিত। শুধু তা-ই নয়, কতিপয় নেতৃস্থানীয় পণ্ডিতকে নিজের কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে বললেন, উপত্যকার বিদ্রোহ দমন করবার জন্য জম্মু-কাশ্মীর সরকার মুসলমানদের ওপর ব্যাপক সামরিক অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সময় নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে সাময়িকের জন্য পণ্ডিতদের অন্যত্র চলে যাওয়াই মঙ্গলজনক। এখানেই শেষ নয়, জগমোহন উপত্যকা ত্যাগকারীদের জন্য বিনা মূল্যে জমি, নগদ অর্থসহ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। এমনকি সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য দিলেন বিনা কর্মে বেতন-ভাতা চালু রাখার ঘোষণা, অথচ তখনো মুসলমান সরকারি কর্মচারীদের কয়েক মাসের বেতন বাকি, অথচ সেই সময় ৬০ জন মুসলমান সরকারি কর্মচারীকে কর্তব্যে অবহেলার অজুহাত দেখিয়ে বরখাস্ত করা হয়েছে। একই মাটিতে বেড়ে ওঠা দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন আকাশ-পাতাল বৈষম্য করা হয়, তখন সেই মাটিতে যেকোনো মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবনতি ঘটতে বাধ্য। জগমোহন আরো কী করলেন, তিনি পণ্ডিতদের উপত্যকাত্যাগে উদ্বুদ্ধই করলেন না শুধু, সরকারি উদ্যোগে উপত্যকার বাইরে তিনি রাতারাতি ত্রাণশিবির খুলে ফেললেন। এগুলো যে গভীর সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে করা হয়েছে, তা বুঝতে মাথায় খুব বেশি ঘিলু থাকার প্রয়োজন নেই। উপত্যকার এক ট্যাক্সিচালক, নাম রাজিন্দর সিং, তিনি পিইউসিএলের প্রতিনিধিদলের কাছে কদিন আগে বলেছেন, ১৯৮৪ সালের নভেম্বরে যখন দিল্লিতে হাজার হাজার শিখকে হত্যা করা হলো, তখন তো দিল্লির উপকণ্ঠে কোনো ত্রাণ শিবির খোলা হলো না! আবার উত্তর প্রদেশের মিরাটে ও বিহারের ভাগলপুরে যখন দাঙ্গা বাধিয়ে শত শত মুসলমানকে মেরে ফেলা হলো, তখনো তো শহরের উপকণ্ঠে কোনো শিবির খোলা হয়নি। তবে কাশ্মীরে কেন এক-দুজন সংখ্যালঘুর মৃত্যুর খবরেই তড়িঘড়ি করে তিনশ মাইল দূরের জম্মুতে ত্রাণশিবির খোলা হলো! জগমোহন নিজেই কি চাইছেন না পণ্ডিতরা উপত্যকা ত্যাগ করুক? জগমোহন বিদেশি এবং স্বদেশি প্রভুদের দেখাতে চাইছেন, কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। এমতাবস্থায় বিপুল সামরিকায়নের কোনো বিকল্প

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

নেই। এই মাটিতে ঝাঁকে ঝাঁকে মিলিটারি-প্যারামিলিটারি নামানোর বৈধতা পাওয়ার জন্যই তার এই সংখ্যালঘু নিপীড়নের নাটক। তাই বলা যায়, পণ্ডিতদের দেশত্যাগের পেছনে জগমোহনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। এখানে জুলুমের ভয় ওখানে লোভনীয় জীবনের হাতছানি— এই দুই মুলা ঝুলিয়ে তিনি পণ্ডিতদের দেশত্যাগে বাধ্য করছেন।

আজ সব দোষ বিদ্রোহীদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে অথচ বিভিন্ন দৈনিকে, বিশেষত, উর্দু দৈনিকগুলো খুললে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিদ্রোহীরা পণ্ডিতদের কাশ্মীরে ফিরে আসার অনুরোধ জানাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, তারা মুসলমানদের সতর্ক করে দিচ্ছে, তারা যেন কোনো পণ্ডিতের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জবরদখল বা বিক্রি না করে। এই তো কদিন আগে ভারত সরকারের কাশ্মীরবিষয়ক মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ কাশ্মীর সফরে এসেছিলেন। তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন এভাবে : বিগত এক বছরে পণ্ডিতদের মালিকানাধীন সম্পত্তি, বাড়ি, বাগান— কোনো কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। পণ্ডিতদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলো আগের মতোই স্থানীয় মুসলমানরা দেখাশোনা করছে।

ভারতীয় প্রচারমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীরা জানাচ্ছে— উপত্যকায় হাজার হাজার সংখ্যালঘু হত্যা করা হচ্ছে। ভুল কথা। গবেষক সুমন্ত্র বোস কাশ্মীর এসে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ মতামত দিয়েছেন— হাজার হাজার নয়, কয়েক ডজন কাশ্মীরি পণ্ডিত নিহত হয়েছে। ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে নিখিল ভারত কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সম্মেলনে বলা হয়েছে, ১৯৮৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯০-এর মার্চ পর্যন্ত পঁয়ষট্টি হাজার হিন্দু উপত্যকা ছেড়ে পালিয়েছে এবং এই সময়ে জঙ্গিদের হাতে নিহত হয়েছে ৩২জন পণ্ডিত।

নিহতের বিচারে ৩২ সংখ্যাটি কিন্তু কম নয়।

বলছি না নিহতের সংখ্যা কম। কিন্তু মিডিয়াগুলো যেভাবে এই হত্যাকাণ্ডের গায়ে সাম্প্রদায়িকতার রং চড়াচ্ছে, হত্যাকাণ্ডগুলো কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিল না। জেকেএলএফের ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়ার বিদ্রোহকে বিতর্কিত করাই এদের মূল লক্ষ্য। জেকেএলএফ শুধু হিন্দু পণ্ডিতদেরই হত্যা করেনি, হত্যা করেছে ভারতপন্থী মুসলমানদেরও। এখানে কয়েকজন নিহত পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করছি। তাতেই তুমি বুঝে যাবে কেন তারা নিহত হলো। প্রথম নিহত হিন্দু পণ্ডিত হলেন টিকা লাল টাপলু। টাপলু ছিলেন জম্মু-কাশ্মীর ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি। তিনি সরাসরি বলেছিলেন, উপত্যকায় সামরিক আইন জারি করে কাশ্মীরি মুসলমানদের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

শায়েস্তা করা উচিত। তারপর নিহত হন অবসরপ্রাপ্ত হিন্দু বিচারক নীলকান্ত গঞ্জু। তিনি বিচারক থাকাকালীন জেকেএলএফ নেতা মকবুল ভাটের ফাঁসির রায় দিয়েছিলেন। এরপর একজন রেডিও পরিচালক নিহত হয়েছেন। তিনি নিজ রেডিওতে কাশ্মীরের অভ্যুত্থান ও জেকেএলএফ সম্পর্কে ভুলভাল তথ্য পরিবেশন করতেন। তাহলে কি এই হত্যাকাণ্ডগুলোকে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড বলা যায়?

কাউল ও তেঙ তাদের প্রবন্ধে বলেছেন, কাশ্মীরে জঙ্গিদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের সংখ্যা পঞ্চাশ। হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সংঘের ইশতেহারে ছত্রিশটি মন্দিরের কথা বলা হয়েছে। লালকৃষ্ণ আদভানি বলেছেন, কাশ্মীরে ধ্বংস করা হয়েছে চল্লিশটি মন্দির। 'ইন্ডিয়া টুডে'র একদল সাংবাদিক ধ্বংসপ্রাপ্ত তেইশটি মন্দিরের তালিকা সংগ্রহ করে কাশ্মীর এসেছিলেন সম্প্রতি। তাদের উদ্দেশ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। তারা তেইশটি মন্দিরের মধ্যে একুশটিই অক্ষত পেয়েছেন। মন্দিরের পূজারিরা সাংবাদিকদের বলেছেন, তাদের ওপর কোনো ধরনের নিপীড়ন করা হয়নি। এমনকি যেসব গ্রামে পাঁচ-সাতজন পণ্ডিতের বসবাস, সেখানকার মন্দিরগুলোকেও তারা অক্ষত পেয়েছেন। এরপরও যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের সংখ্যা নিয়ে বাড়াবাড়ি করছেন, তারা মূলত মুসলিমবিদ্বেষ থেকেই মিথ্যাচার করছেন।

দীর্ঘ বক্তৃতার পর আতিকুল্লাহ যখন থামে, ততক্ষণে ওর চেহারা লাল। দুচোখ দিয়ে ছুটছে ক্রোধের আগুন। শেষের দিকে এসে ওর কণ্ঠ এমন উচ্চগ্রামে ওঠে, খোদ আদনানই ভড়কে যায়। কাঁধে হাত রেখে বন্ধুকে শান্ত করবার চেষ্টা করে ও। আতিকুল্লাহর পরিবেশিত তথ্যে দূর হয়ে যায় ওর মনের সকল ধোঁয়াশা। জেকেএলএফের প্রতি যে অনাস্থা একটু একটু করে তৈরি হয়েছিল, তার জন্য ও মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করে। তারপর ও আতিকুল্লাহর হাত ধরে বলে, চলো না আমাদের গ্রামে বেড়াতে যাই! অনেক দিন গ্রামে যাই না। একটি বিশেষ দরকারও আছে।

বেড়ানোর প্রতি অনাগ্রহ কোনোকালেই ছিল না আতিকুল্লাহর। আদনানের প্রস্তাবে তাই সাথে সাথেই রাজি হয়ে যায় ও। হাসতে হাসতে বলে, এত দিন একসাথে পড়ছি অথচ এই প্রথম বাড়িতে যাওয়ার কথা বললে। এমন সুযোগ তো হাতছাড়া করা যাবে না।

পড়াশোনার প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়েছে আদনান। কিন্তু গ্রাম ছাড়লেও ওর শিকড় পোঁতা আছে গুরিহাকার মাটিতেই। যেখানেই যাক ও, গুরিহাকার মাটির মতো কোমল, মায়াময় কোনো জায়গা ও খুঁজে পায় না। যখনই ও

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বাড়িতে আসে, বাবা-মা, ছোট বোন এবং গ্রামবাসী এমন আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানায়, হৃদয় উষ্ণ হয়ে ওঠে। আদনানের আগে গুরিহাকার কেউ কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েনি। এ কারণে কাছের মানুষেরা তো বটেই, দূরের মানুষেরাও ওকে কাছে পেয়ে প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে। বাবার বয়সী মানুষগুলো এমনভাবে ওর কুশল জানতে চায়, গায়ে-মাথায় হাত বোলায়, যেন ও ফয়জুল্লাহর একার সন্তান নয়, ও প্রত্যেকের। ওকে অপত্যস্নেহ দেওয়ার অধিকার সবারই আছে।

মারিয়াম নেই। গ্রামে আদনানকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য আতিকুল্লাহর মতো একজন বিচক্ষণ সঙ্গীর দরকার ছিল। পাশাপাশি গোপন এক বাসনাও ছিল ওর মনে। গ্রামের মানুষেরা কীভাবে হৃদয় নিংড়ে ভালোবাসে ওকে, স্নেহের সেই পরাগটুকু আতিকুল্লাহকে দেখানোর গোপন আকাঙ্ক্ষাও ছিল। তাই তো এবার ওর আতিকুল্লাহকে সঙ্গে আনা। কিন্তু সেদিন কমলা রোদের দুপুরে গ্রামে পা রেখে হোঁচট খেল আদনান। পড়শিরা তো বটেই, আদনানকে দেখে বাবা-মাও কেমন গুটিয়ে গেলেন নিজেদের মধ্যে। মাত্র ছয় মাসের ব্যবধান, অথচ দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ওর আর গুরিহাকার মাঝে বয়ে গেছে ছয় বছরের চোরাস্রোত। অবশ্য এর মাঝে অনেকবার ও ফিরতে চেয়েছে, কিন্তু লাগাতার কারফিউ ওর বাড়ির পথের অন্তরায় হয়েছে বারবার। আবার জঙ্গিদের ক্লু খোঁজার নামে ভারতীয় সৈন্য কর্তৃক পোস্ট অফিসের চিঠি তল্লাশি ওকে চিঠি লিখতে নিরুৎসাহিত করেছে সব সময়। যোগাযোগের বন্ধন ঢিলে হওয়ার পেছনে মারিয়ামের নিরুদ্দিষ্টিরও দায় আছে। জীবন এখন এমন এলোমেলো আর ছন্নছাড়া, ছয় মাস আগে একবার যে আসতে পেরেছিল, সেটার উপলক্ষ ছিল দাদাজির মৃত্যু। আচমকা নূরজাহানের বিয়ে ঠিক না হলে হয়তো এবারও ওর আসা হতো না গুরিহাকায়।

পেছন ফিরে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায় আদনান। কত নির্ঝঞ্ঝাট, নিরুপদ্রব, মধুর জীবন সে ছেড়ে এসেছে। ক্রিকেট মাঠের হল্লা, ট্যুরিস্ট বাসের জানালায় বিদেশির মুখ কিংবা হিন্দি সিনেমার শুটিং দেখতে দেখতে কত বিকেল যে ঢুকে গেছে সন্ধ্যার গর্ভে! আর এখন ঝিলামের বুকে একটি লাশের ভেসে ওঠার অপেক্ষায় দিন কাটে ওর। তাই তো মৃত্যু কিংবা বিয়ের মতো অনিবার্য প্রয়োজন সামনে না দাঁড়ালে ওর ফেরা হয় না ঘরে।

কাশ্মীরিরা বিশ্বাস করে, বিয়ে নির্ধারিত হয় জান্নাতে, পৃথিবীতে শুধু উদ্‌যাপন করা হয়। নয়তো পেহেলগাম কলেজের এক তরুণ শিক্ষক কেনই-বা গুরিহাকায় আসবে আর বিকেলের নরম আলোয় ঝরনার পাশে নূরজাহানকে দেখে কেনই-বা তাকে পছন্দ করে ফেলবে আর দুই সপ্তাহের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

মাঝে কেনই-বা তার বিয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়ে যাবে! বিয়ের বয়স হয়েছে নূরজাহানের আর বয়স হচ্ছে বাবা-মার। চারপাশে এত দুঃসংবাদ— স্বামীর ঘরে গিয়ে নূরজাহান বাবা-মার দুশ্চিন্তা কমাতে চেয়েছে। তাই তো বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতেই ভাইয়ের সাথে শলা করা ছাড়াই ও এককথায় রাজি হয়ে গেছে। দুঃখ একটাই— এমন দিনে মারিয়াম পাশে নেই।

অগ্নিগর্ভ শ্রীনগর প্রতিদিনই পরিশ্রান্ত করে তুলছিল আদনানকে। শিশনাগের কূলে দাঁড়িয়ে গ্রামের নির্মল বাতাসে বুকভরতি শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন ছিল ওর। নূরজাহানের বিয়ে সতেজতা লাভের সেই উপলক্ষ তৈরি করে দেওয়ায় মনে মনে ও খুশি। কিন্তু বন্ধু আতিকুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে আসার পর ওর ধারণাটাই বদলে গেল। চিরচঞ্চলা নূরজাহানের গম্ভীর মুখ, মায়ের ঝুলে পড়া চোয়াল আর ক্লিনশেভ করা বাবার মুখের কাঁচা-পাকা দাড়ি সংকেত দেয়— তারা অপ্রীতিকর কিছু একটা লুকাচ্ছে। কুশলাদি বিনিময়ের পর, নাশতা খেয়ে দাদাজির কবর জিয়ারত করতে বেরিয়ে প্রথম ধাক্কাটা লাগে। অজিতদের বাড়ির অস্বাভাবিক নীরবতা ওর চলার গতি থামিয়ে দেয়। শীতকাল অনেক আগেই গত হয়েছে অথচ ওদের বাড়ির সব জানালা বন্ধ। জানালার পাল্লায় জমে থাকা ধুলোর আস্তর দূর থেকেও চোখে পড়ে। বোঝাই যায়, অনেক দিন খোলা হয়নি জানালাগুলো। জানালার মতো বন্ধ কাঠের ফটকটাও। আদনানের বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে। শেষমেশ অজিতরাও কি...। ভাবনার গতি সামনে অগ্রসর করতে ভয় হয় ওর। হঠাৎ কী ভেবে ও ছুটে যায় ফটকের কাছে। ফটকের মস্তবড় তালা নির্বাক কণ্ঠে বলে দিচ্ছে, এখানে প্রবেশ নিষেধ।

আদনান লোহার তালার ওপর কম্পমান হাত রাখে। দাদাজি মারা গেলে তার শরীর এমনই শীতল হয়ে গিয়েছিল। গেটের একদম ওপরে কাঠকয়লায় আঁকা অজিতের প্রতিকৃতি। জন্মস্থান ত্যাগের পূর্বে ও হয়তো রেখে গেছে নিজের অস্তিত্বের চিহ্ন, হয়তো আদনানের জন্যই। ছবির ঠিক নিচে লেখা : বিদায়।

চোখ ঝাপসা হয়ে আসে আদনানের। অজিতরা সত্যিই তবে চলে গেছে! অজিতের সাথে বেড়ে ওঠা শৈশব-কৈশোরের কত স্মৃতি মনে পড়ে ওর। আহা! এখন কে ওকে হিন্দুপুরাণের গল্প বলবে!

তোমরা বন্ধু ছিলে? কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করে আতিকুল্লাহ।

হ্যাঁ। এখানে ওদের কোনো শত্রু ছিল না। তারপরও ওরা চলে গেল!

যখন সাম্প্রদায়িক বিপন্নতা গ্রাস করে কাউকে, তখন বন্ধুকেও শত্রু মনে হয়। ওরা হয়তো নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারছিল না।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

অজিতের চোয়ালে হাত রাখে আদনান, ভালো থাকিস।

এবারের গ্রামে ফেরা আদনানের জন্য আক্ষরিক অর্থেই বিপন্ন বিস্ময় হয়ে রইল। অজিতদের শূন্য বাড়ি ডিঙিয়ে গোরস্তানে গিয়ে নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো ওর। গুরিহাকার সেই চিরচেনা ছোট্ট গোরস্তান— লাশের অভাবে যা ছিল শীর্ণ, অনভিজাত এবং নির্জন— নিত্যনতুন তাজা লাশে উপচে পড়ছে তার সারা অঙ্গ। আদনানের মনে হলো, এই সব নতুন কবর ক্ষুদ্র গোরস্তানটিকে সীমানা ভেঙে লোকালয়ের ভেতর সম্প্রসারিত করার চক্রান্তে লিপ্ত।

বসন্ত এসেছে। তুষারঢাকা কাশ্মীর এখন সবুজ। অথচ সবুজের কোনো কোলাহল কবরস্থানে নেই। বেদনার গুমোট বাতাসে স্তব্ধ হয়ে আছে চারপাশ। আদনান হাঁটু মুড়ে বসে নতুন কবরগুলোর এপিটাফ পড়তে গিয়ে অসাড় হয়ে গেল। বন্ধু তারিক, হোরাইরা, বেলাল— যাদের বয়স পঁচিশের কম, যাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে বড় হয়েছে আদনান— তারা এখন নির্বাক পৃথিবীর বাসিন্দা। তাদের অন্তিম পরিচয় ধারণ করে নিথর দাঁড়িয়ে আছে সমাধিলিপিগুলো। কাশ্মীরে আজরাইলের ব্যস্ততা বেড়েছে, দেদার মানুষ মরছে, সবই জানে আদনান। কিন্তু সেই মৃত্যুর নীল বিষ যে ছুঁয়ে গেছে নির্ঝঞ্ঝাট গুরিহাকাকেও, কল্পনা করতে পারেনি ও। বন্ধুকে দীর্ঘক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে দেখে বিচলিত হয় আতিকুল্লাহ। বন্ধুর পাশে বসে ও জিজ্ঞেস করে, এদের তুমি চেনো?

আদনান চোখের কোনা মুছে বলে, ওরা সবাই আমার বন্ধু ছিল। ভারতীয় সেনাদের গুলিতে নিহত হয়েছে।

আল্লাহ তাদের পরজীবনকে সুখময় করুক।

তারিক মারা গেল অথচ কেউ আমাকে খবরটি পর্যন্ত দেয়নি। কী আশ্চর্য!

ওর মৃত্যুর খবরে তুমি ঝুঁকিপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারো— হতে পারে সেই ভয়ে তোমাকে খবরটা দেওয়া হয়নি।

হঠাৎ গোরস্তানের অপর প্রান্তে, উইলোগাছের ওপাশ থেকে কাশির শব্দ ভেসে এলে চমকে ওঠে দুই বন্ধু। একসাথে তাদের ভীতবিহ্বল চোখ আছড়ে পড়ে ঝোপের ওপর। গুলজার চাচা কবর খুঁড়ছেন। চাচাকে সাহায্য করছে ১৪ বছরের কিশোর নাতি ওমর। আদনান পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় গুলজার চাচার কাছে। বিপন্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করতে চায়— তারিক, হোরাইরা, বেলাল

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কবে কীভাবে মারা গেল— কিন্তু জিজ্ঞাসা ওর কণ্ঠেই রয়ে যায়। পুরোনো লাশের প্রসঙ্গ ও কীভাবে উত্থাপন করবে, যখন ও দেখে, নবদম্পতির বিছানার মতো সাজানো হচ্ছে নতুন পাঁচটি কবর, আর প্রক্রিয়াধীন ষষ্ঠ কবরের মধ্যে সঞ্চালিত হচ্ছে গুলজার চাচার কোদাল। তার মানে আরো ছয়টি লাশ! বিস্ময়ে আদনানের দুই পা যেন গেড়ে যায় গোরস্তানের মাটিতে। ওর মুখে কোনো কথা সরে না। ওকে দেখে কোদাল রেখে ক্লান্ত শরীরে এগিয়ে আসেন গুলজার চাচা। নিস্পৃহ গলায় বলেন, অনেক দিন পর তোমাকে দেখলাম।

আদনান থমথমে গলায় বলে, ছয় মাস খুব দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু ছয় মাসে গুরিহাকার আগাপাশতলা এমনভাবে বদলে গেছে, ছয় বছরেও যা বদলায় না। ওর কথা শেষ হওয়ার পর ঝুপ করে নীরবতা নেমে আসে। হোরাইরার কবরের ফলকের পাশে গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে দেখা যায় একটি বিড়ালকে। একটি বেজি খুব দ্রুততার সাথে দুটি পুরোনো কবর ডিঙিয়ে চলে যায়। দাদাজির কবরকে মনে হয় একটি ভাঙা শিকারা, ডাললেক যাকে অপাঙ্‌ক্তেয় ভেবে ডাঙায় ছুড়ে ফেলেছে। খননকৃত নতুন কবরগুলোর দিকে ইশারা করে আদনান— নতুন ছয়টি কবর কাদের? কারা মারা গেল?

মারা যায়নি। তবে আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখছি। হঠাৎ হঠাৎ একসাথে এত বেশি লাশের আমদানি হয়, তখন কুলিয়ে উঠতে পারি না।

বিমর্ষ আদনানের মাথায় হানা দেয় পুরোনো দিনের স্মৃতি। একদা এই গুলজার চাচাই লাশের অপ্রতুলতায় কবর খননের নন্দনতত্ত্ব ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। আর আজ লাশের এত প্রাচুর্য— তাকে অগ্রিম কবর খুঁড়ে রাখতে হচ্ছে।

তোমার কি মনে আছে, একবার লাশের অভাবে আফসোস করেছিলাম— কেন মানুষ মরে না, কেন কবর খুঁড়তে পারি না! আর এখন দাদা-নাতি মিলেও লাশের সাথে তাল মেলাতে পারি না। বুড়ো হয়ে গেছি, বুঝলে। অনেকে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে বলে। কিন্তু কেন আমি দায়িত্ব ছাড়ব? কবর খোঁড়া তো আমার কাছে ইবাদত! উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি এই ইবাদতনামা। মৃত্যুর আগপর্যন্ত তা পালন করে যেতে চাই। ওই যে দেখো, ছোট্ট এক ঝুপড়ি, দাদা-নাতি ওখানেই থাকি। ওখানে থাকার সুবিধা হলো, কবরগুলোকে চোখে চোখে রাখা যায়। কখন কার কী প্রয়োজনে লাগি, বলা তো যায় না! তোমাকে আর একটা কথা বলি...গুলজার চাচা এগিয়ে এসে আদনানের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। খুব গোপনীয় কোনো কথা বলবার ভঙ্গিতে ওর কানের কাছে মুখ নামায়। তারপর ফিসফিস করে বলে, প্রতি রাতে এই

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

গোরস্তান বেহেশত হয়ে ওঠে, বুঝলে! শহীদদের কবর থেকে ভেসে আসে সুগন্ধ। জীবনে কত ফুলের গন্ধ শুঁকেছি, কত আতর গায়ে মেখেছি, কিন্তু এই গন্ধের কোনো তুলনা হয় না। বেহেশত বেহেশত!

আদনান সন্দেহের চোখে তাকায়। লাশের সঙ্গে থাকতে থাকতে কি গুলজার চাচার মতিভ্রম হচ্ছে! বয়সও তো কম হলো না মানুষটার। গুলজার চাচা বলতেই থাকে— দুঃখ শুধু একটাই, এখনকার কবরগুলো সুন্দর করতে পারি না। কবরও তো ঘর, তাই না? কাশ্মীরিরা কত যত্ন করে ঘর বানায় অথচ শহীদরা যেখানে কেয়ামত অব্দি থাকবে, সেই ঘরগুলো সুন্দর হয় না।

সুন্দর হয় না কেন? জানতে চায় আতিকুল্লাহ।

সংখ্যার চাপ। নির্মাণসংখ্যা বেড়ে গেলে শিল্পের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

প্রসঙ্গ বদলায় আদনান— তারিকরা কি একসাথে মারা গেছে?

হ্যাঁ। আজাদ কাশ্মীর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ওরা পাশের গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে ঘাঁটি গেড়েছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে মিলিটারি কনভয়ের ওপর অতর্কিত হামলা করত। গেরিলা, বুঝলে, গেরিলা! সময়ের কী অদ্ভুত ক্ষমতা— আমাদের চোখের সামনে আমাদেরই সন্তানেরা দুর্ধর্ষ গেরিলা হয়ে উঠল। বেশ কয়েকটা সফল অপারেশনও তারা করেছে। কিন্তু কী থেকে কী হয়ে গেল! এক রাতে প্রাইমারি স্কুল ঘেরাও করল মিলিটারি বাহিনী। এগারো জন ছিল ওরা। এক রাতেই সব শেষ। কীভাবে যে ওদের কানে খবরটা পৌঁছল!

চকিতে আতিকুল্লাহর দিকে তাকায় আদনান। ওর বুকের ভেতর যে সঞ্চিত হচ্ছে অনিরুদ্ধ ক্রোধ, সাক্ষ্য দেয় ওর কপালের দপদপে শিরা। বুঝতে বাকি থাকে না— দেশপ্রেমিকের পাশাপাশি কাশ্মীরের মাটি জন্ম দিয়েছে একদল গাদ্দারকেও।

তোমাকে আরেকটা জিনিস দেখাই— এবার আদনানের হাত ধরে টানতে থাকে গুলজার চাচা। তাজা ফুলে সাজানো একটি সমাধির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এই আমার ছোট ছেলে, ফারুক। ঘুমিয়ে আছে এখানে। ও বয়সে তোমাদের থেকে ছোট। তারিকদের সাথে ও লুকিয়ে ঘর ছেড়েছিল। সে-ও শহীদ হয়েছে যুদ্ধে। আমি শহীদের গর্বিত পিতা। গুলজার চাচা চোখ মোছে। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে কবরের মাথার কাছে। সমাধিলিপির ওপর হাত বোলায়। ফুলগুলো নতুন করে সাজায়। তার চোখের দুফোঁটা অশ্রু ফুলের ওপর ঝরে পড়ে।

মন খারাপ করবেন না, চাচাজি। আজাদির অনেক মূল্য। রক্ত ছাড়া সে ধরা দেয় না। ফারুকদের রক্তের ওপরই একদিন মুক্তির সৌধ নির্মিত হবে,

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ইনশা আল্লাহ। আপনাকে একটা খুশির খবর দিই। নূরজাহানের বিয়ে ঠিক হয়েছে। আগামী শুক্রবার বিয়ে। আপনি অবশ্যই আসবেন। ওমরকেও আনবেন সাথে। সামান্য আয়োজন। পুলিশ ধুমধাম করে অনুষ্ঠান করতে নিষেধ করেছে। ছোট বোনটার বিয়ে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল! জাঁকজমক করে ওর বিয়ে দেব। সেসবের কিছুই হবে না। আর এই অবস্থায় আমি চাইও না জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হোক। তাতে শহীদের আত্মার প্রতি তামাশা করা হবে। আদনান পকেট থেকে বিয়ের কার্ড বের করে গুলজার চাচার হাতে দেয়। কার্ডের ওপরে লেখা : বিয়ে নির্ধারিত হয় জান্নাতে, পৃথিবীতে শুধু উদ্‌যাপন করা হয়। গুলজার চাচা ধুলোমাখা হাতে লেখাটায় আদর করে। তারপর টেনে টেনে বলে, পুলিশ যতই নিষেধ করুক, বড় আয়োজন করো। নয়তো মেয়েটার মনে সারা জীবনের জন্য দাগ পড়ে থাকবে। কাশ্মীরে বিয়ে মানেই তো বিপুল আয়োজন। আমি আসব, অবশ্যই আসব।

যুদ্ধের জন্য নূরজাহানের বিয়ের অনেক কিছুই সীমিত করতে হয়। যুদ্ধ আসে কোরবানির পরীক্ষা নিতে। কোরবানির নৈবেদ্য ত্বরান্বিত করে মুক্তির পথ। ত্যাগ আর কোরবানি ছাড়া কবে কোন জাতি আজাদির নন্দিত পেয়ালায় চুমুক দিতে পেরেছে? কাশ্মীরে পাত্রপক্ষ কনের বাড়িতে যাত্রা করে সন্ধ্যার পর। রাতে, বিলম্বিত আহার শেষে নববধূ সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফেরে কাশ্মীরি বর। এ হাজার বছরের পুরোনো ঐতিহ্য কাশ্মীরের। কিন্তু বছরখানেক আগে এক নববধূ বিয়ের রাতে স্বামীর ঘরে যাওয়ার পথে মিলিটারি কর্তৃক গণধর্ষণের শিকার হয়। তার পর থেকেই সতর্ক হয়ে উঠেছে অভিভাবকেরা। হ্যাঁ, ঐতিহ্য পদদলিত করতে তাদের বুক খানখান হয়ে যায়, কিন্তু কন্যার ইজ্জত তো ঐতিহ্যের চেয়েও বড়। আর তাই সিদ্ধান্ত হয়, নূরজাহানের বর আসবে দিনের বেলা। মেহেদি সন্ধ্যা, আপ্যায়ন প্যান্ডেল, খাবারের মেনু, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ— পুলিশ সবকিছুকে সীমিত করতে বললেও শেষমেশ আর সীমিত থাকে না। বাড়ির সামনের আঙিনায় বানানো প্যান্ডেলে কনেপক্ষের খাবারের ব্যবস্থা হয় আর বরপক্ষের বসার ব্যবস্থা হয় ভেতরের মেহমানখানায়। বরের গাড়ির হর্ন বেজে উঠতেই বাদামি চুলের একদল কিশোরী ছুটে যায় বাইরে। সমস্বরে কাশ্মীরের ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত ওয়ানয়ুন গেয়ে তারা স্বাগত জানায় বরযাত্রী দলকে। গ্রীষ্মের শেষে যে হালটে আদনানরা ধান মাড়াই করে, বিচালির স্তূপ বানায়, সেখানে সাজানো ইটের ওপর ডেকচি বসিয়ে অস্থায়ী চুলায় ভাত এবং ওয়াজওয়ান রান্না চলে। ভাজা মাংসের ঘ্রাণে পাড়ার কুকুরের দল ঘোরাঘুরি করে আঙিনায়। আতিকুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে বিয়েবাড়ির কাজের চাপ সামলাতে যখন হিমশিম খায় আদনান,

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তখন ওর খুব করে মনে পড়ে শহীদ হওয়া বন্ধুদের কথা। নূরজাহানের বিয়ে হবে আর তারিকরা ফুর্তি করবে না, স্বপ্নেও ভাবেনি আদনান। রায়হানের কয়েকজন বন্ধু এসেছে। আদনান পরিচিত হয়েছে তাদের সাথে। এলোপাতাড়ি কথার ফাঁকে উঠে এসেছে কাশ্মীরের রাজনীতি ও দ্রোহের প্রসঙ্গ। রায়হানের এক বন্ধু তারিকদের আত্মদানকে বিদ্রূপ করলে মাথায় রক্ত উঠে যায় আদনানের। আতিকুল্লাহ বহু কষ্টে ওকে সামলায়। বিচিত্র সংস্কৃতির দেশ কাশ্মীর। এই মাটির উদার গর্ভে যেমন দেশপ্রেমিক জন্ম নিয়েছে, তেমনই জন্ম নিয়েছে গাদ্দারও।

নূরজাহান আদনানের পিঠাপিঠি ছোট বোন। হেসেখেলে, অভিমানে-আহ্লাদে একসাথে বড় হয়েছে দুজন। বড় হওয়ার ব্যস্ততা এবং একসাথে থাকার অভ্যস্ততায় পারস্পরিক ভালোবাসা মেপে দেখার ফুরসত হয়নি কোনো দিন। কিন্তু চিরকালের জন্য যখন বোনটিকে অন্যের হাতে তুলে দেবার উপলক্ষ আসে, আদনান বুঝতে পারে— নূরজাহান তার কতখানি ছিল। বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বোনটিকে আজ কত কথা বলতে ইচ্ছা করে! না বলা কত অভিমান আর না দেওয়া কত আদরের অবগুণ্ঠন খুলতে ইচ্ছা করে! কিন্তু ছেলে হয়ে জন্মাবার চিরায়ত আড়ষ্টতায় বলা হয় না কিছুই। ভালোবাসা প্রকাশে অপটু আদনানের সান্ত্বনা এখন একটাই— আড়ালই ভালোবাসার সৌন্দর্য।

বিকেলের আলো নরম হতে হতে থেমে যায় বিয়েবাড়ির সকল কোলাহল। গত কয়েক দিনের সমস্ত কর্মযজ্ঞ রচিত হয়েছে নূরজাহানকে ঘিরে। মেয়েটি জীবনসঙ্গীর সাথে বাসের সিঁড়িতে পা রাখতেই বাতি নেভার মতো দপ করে থেমে যায় কল্যাণগীতি ওয়ানয়ুনের সুর, তিন দিন ধরে মহল্লার তরুণীদের কণ্ঠে যা বেজে চলেছে অবিরত। ফয়জুল্লাহ, নাজনীন এবং আদনানের বুকে হু হু শব্দ তুলে যখন স্টার্ট নেয় বাসটি, ঠিক তখনই আদনানের চোখ থেকে টুপ করে ঝরে পড়ে এক ফোঁটা অশ্রু। প্রবল উৎসাহ নিয়ে শুরু হয়েছিল আয়োজন, এখন এক শতাব্দীর ক্লান্তি নিয়ে এলোমেলো পড়ে থাকে সবকিছু। নিরুত্তাপ প্যান্ডেল, পরিত্যক্ত খাবার টেবিল, নিভন্ত চুলার ছাই আর উচ্ছিষ্ট মাংসের হাড্ডি খেতে খেতে হঠাৎ থেমে যাওয়া কুকুরের পাল— সবই যেন নূরজাহানের বিরহে কাতর। গাড়িটি ছেড়ে গেলে নূরজাহানের পোষা মোরগ দুটি একসঙ্গে পাখা ঝাপটায়, গলা ফুলিয়ে বারবার ডাকতে থাকে। ওরা কি বুঝতে পারে— ওদের আদর দেওয়া মেয়েটি চিরদিনের জন্য ছেড়ে গেল ঘর? নূরজাহান চলে যায়, সাথে নিয়ে যায় এ বাড়ির সবটুকু আলো।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তেরো

গাঁয়ের নাম ত্রেহগাম। সবুজ পাহাড়ের গা ঘেঁষে গ্রামটি। দূর পাহাড়ের হৃৎপিণ্ড থেকে জন্ম নেওয়া একটি জলের ধারা বয়ে গেছে গ্রামকে পার্শ্বচরিত্র বানিয়ে। রাত নেই কিংবা দিন— নুড়ি পাথরের সাজানো বিছানার ওপর দিয়ে বয়ে যায় নীল-সবুজ জলরাশি, ক্লান্তিহীন। শরতের আগমনে ধূসর হওয়ার অপেক্ষায় নদীর দুকূল। চিনারগাছের পাতায় পাতায় আগুন জ্বলার প্রতীক্ষা। চিরহরিৎ পাহাড়গুলো বরফের টুপিতে মানিয়ে নিতে সংকল্পবদ্ধ। কঙ্কর ছড়ানো ধুলোওড়া একটি সরু পথ দূরের শহরের সাথে যুক্ত করেছে গ্রামটিকে। নদীর ওপর কাঠের সেতু উজ্জ্বল করেছে ত্রেহগামের গৌরব।

সূর্যের তেজ কমে এলে মসজিদের মাইক থেকে আজানের লহরি ভেসে আসে। বাড়ির গোপন কক্ষে আসরের নামাজ পড়তে পড়তে কেটলিভরতি চা দিয়ে যায় রুহুল বেগের ছোট ছেলে এহসান। চা খেয়ে শরীর চনমনে হয়ে উঠলে জেকেএলএফের ইউনিফর্ম পরে আদনানরা পা রাখে ইতিহাসের সেই বিপৎসংকুল পথে, যাপিত জীবনে যে পথের মুখোমুখি আর কোনো দিন হয়নি ওরা।

কাঠের সেতুর মুখে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল একটি পুরোনো ট্রাক। দ্রুত ট্রাকে ওঠার জন্য গাইড বারবার তাগাদা দিচ্ছিল ওদের। পথের ধারে বিশ্রামরত একটি কুকুর ফ্যালফ্যাল করে দেখছিল ওদের ভীতবিহ্বল পদক্ষেপ। ত্রেহগামের কুকুরটি এর আগে একচল্লিশ বার দেখেছে ট্রাকটির নিরুদ্দেশ হওয়া। বিয়াল্লিশতম অভিযান কি সফল হবে? সফরের ঝুঁকি সম্পর্কে প্রৌঢ় রুহুল বেগ আগেই সতর্ক করেছিলেন। সৈন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ক্রল করে সীমান্তবর্তী পর্বত পাড়ি দিতে হবে ওদের। সামান্য ভুলের কারণে মৃত্যুর থাবা নেমে আসতে পারে গর্দানের ওপর। এই সময় শারীরিক এবং মানসিক শক্তি ধরে রাখা তাই খুবই জরুরি। দলের সদস্যসংখ্যা তেরো। গাইডসহ চোদ্দ। গাইড ত্রেহগামের বাসিন্দা। ত্রেহগামে তার বাড়ি হলেও সীমান্তবর্তী প্রতিটি গ্রাম এবং গ্রামের পথঘাট তার মুখস্থ। একসময় কৃষিকাজ করলেও এখন তার একটাই কাজ— যোদ্ধা হতে চাওয়া কাশ্মীরি তরুণদের নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে আজাদ কাশ্মীরে পৌঁছে দেওয়া, নিরাপদে। যখন কাশ্মীর আজাদ হবে, তিনি আবার ফিরে যাবেন তার পুরোনো পেশায়— এই তার সংকল্প।

আল্লাহর নাম নিয়ে লাফ দিয়ে ট্রাকে ওঠে আদনান। ওর গায়ে জেকেএলএফের নামখচিত স্পোর্টস জ্যাকেট, পরনে মোটা কাপড়ের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ট্রাউজার, পায়ে ডাক ব্যাক জুতা। প্রত্যেকের পেছনে ঝোলানো ছোট্ট ব্যাগ। তাতে আলাদা আলাদা সংসার। ট্রাক সশব্দে স্টার্ট নিলে আদনান পিঠের ব্যাগটাকে মমতামাখা হাতে স্পর্শ করে। ব্যাগের মধ্যে অন্যান্য জিনিসের সাথে আছে মারিয়ামের একটি ছবি, আর আছে ওর লাল হিজাব, নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে জুলুমের চিহ্ন হিসেবে মারিয়াম যা ছেড়ে গেছে পৃথিবীর বুকে। বিকেলের নিবিড় হয়ে আসা ছায়ায়, সবুজের ফ্রেমের মধ্যে দাঁড়িয়ে রুহুল বেগ হাত নাড়েন— খোদা তাআলা তোমাদের রক্ষা করুন। তার কিশোর ছেলে এহসান কুকুরটির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর দেয় আর ধুলো ওড়ানো ট্রাকটিকে দেখতে থাকে। গাইড নদীর দিকে ইশারা করে বলেন, এটা পাকিস্তানে গিয়ে মিশেছে। এই নদীর কোল ঘেঁষেই আমাদের পথ।

নদীর কূলঘেঁষা আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথ ধরে এগোয় ট্রাকটি। কখনো ইঞ্জিনের ওপর নদীর শব্দ কখনো নদীর ওপর ইঞ্জিনের শব্দ জয়ী হয়ে পাশাপাশি চলে। গ্রামের অধিবাসীরা ট্রাকটি দেখামাত্র চকিতে কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে যায় সসম্ভ্রমে। কেউ কেউ অভিবাদন জানানোর ঢঙে হাত নাড়ে। দুই কিশোর, যারা পাহাড় থেকে লাকড়ি কুড়িয়ে ঘরে ফিরছিল, তারা মাথা থেকে লাকড়ির বোঝা ফেলে দিয়ে আর্মিদের অনুকরণে ট্রাকটিকে স্যালুট জানায়। মুরব্বিরা, নবীজির ওপর যাদের অগাধ ভরসা, তারা চিৎকার করে বলে, আমাদের নবীজি তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যোদ্ধা হয়ে ফিরো আসো। কাশ্মীর আজাদ করো। আমরা তোমাদের অপেক্ষায়।

গ্রামবাসীর বেপরোয়া উচ্ছ্বাস এবং রাখঢাকহীন উচ্ছলতা বিস্মিত করে আদনানকে। এদের কি আর্মির ভয় নেই! এদের বোকামি নির্ঘাত বিপদ ডেকে আনবে। নির্বোধ লোকগুলোর সরল ভালোবাসায় যদি ভেস্তে যায় সকল আয়োজন, তবে এত সতর্কতার কোনো মানেই হয় না। অথচ শ্রীনগর থেকে ওরা যখন যাত্রা করেছিল, এমন কৌশল অবলম্বন করেছিল, যেন ওদের ছায়াও টের না পায় গোপন অভিযাত্রার খবর। তখন ওরা ছিল মাত্র তিনজন। আদনান, আতিকুল্লাহ ও ইমতিয়াজ। লালচক থেকে ওরা বারমুলাগামী বাসে উঠেছিল। শত্রুর নজর এড়াতে তিনজন বসেছিল তিন জায়গায়। বারমুলায় কাজের খোঁজে যাচ্ছে বেকার আদনান। আতিকুল্লাহর মামা মারা গেছে। মামার জানাজার জন্য পথে বেরিয়েছে সে আর ইমতিয়াজ যাচ্ছে নিজের বাড়িতে। ক্যাম্পাসের সিনিয়র ভাই আনোয়ার হোসাইন, জেকেএলএফের মাঝারি মাপের নেতা যার সাম্প্রতিক পরিচয়, এভাবেই সাজিয়ে দিয়েছিলেন চিত্রনাট্য। এত সব ছদ্মাবরণের পরও কন্ডাক্টরের চোখে ঠিকই ধরা পড়ে যায় ওরা। কন্ডাক্টর সবার ভাড়া নিলেও ওদের তিনজনের ভাড়া নেয় না। বরং তার

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্রয়ের হাসি জানিয়ে দেয়— আমি তোমাদের গুপ্ত সমর্থক। জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে আজাদির জন্য তোমরা পথ চলেছ। তোমাদের থেকে ভাড়া নেওয়া গোনাহ।

যাত্রীতে পরিপূর্ণ ছিল বাসটি। পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে সাউন্ডবক্সে বলিউডের গান বাজছিল। যাত্রীরা নিচু স্বরে কথা বলছিল কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে। বাটামালু বাসস্ট্যান্ড থেকে মাথায় আপেলের ঝুড়ি, গলায় সবুজ মাফলার জড়ানো এক যুবক ওঠে বাসে। তার রহস্যপূর্ণ বাদামি চোখ কাকে যেন খুঁজে ফেরে। যুবককে দেখেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে আদনান। আনোয়ার ভাই এই সবুজ মাফলারের কথাই বলেছিলেন সেদিন। ওরা তিনজন যুবককে দেখিয়ে সবুজ পাথর বসানো আংটি আঙুলের পেটে ঘোরাতে থাকে, ঘোরাতেই থাকে। খানিক পর সবুজ মাফলারের সাথে চোখাচোখি হয় ওদের। অমনি সবার মুখে ফুটে ওঠে গোপন হাসি। এই হাসির অনুবাদ একটাই— একই পথের যাত্রী আমরা। বাস ততক্ষণে পৌঁছে গেছে বারমুলায়।

বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে কয়েকটি অনাবাদি জমি পেরিয়ে একটি আপেলবাগান। মেরুন রঙের ভাঙাচোরা একটি মাইক্রোবাস সেই আপেলবাগানে ইঞ্জিন সচল রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। মাইক্রোবাসে বসে অস্থিরতায় ঘামছিল আর রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল চার যুবক। সবুজ মাফলারকে অনুসরণ করে আদনানরা পৌঁছে যায় আপেলবাগানে। ড্রাইভারের তাগাদায় ওরা ঝটপট উঠে পড়ে মাইক্রোবাসে আর সবুজ মাফলার আপেলের ঝুড়ি মাথায় হারিয়ে যায় সবুজ বাগানে।

তোমরা অনেক দেরি করে ফেলেছ। এখন চেকপোস্টগুলোতে সামান্য বিরতি থাকে। এই ফাঁকে আমরা দ্রুত কুপওয়ারা যেতে চাই। এক্সালেটরে চাপ দিয়ে হড়বড় করে বলতে থাকে শীর্ণদেহী ড্রাইভার। তার ভাঙা গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি যেন শজারুর কাঁটা। এত বড় গোপন অভিযানের সাথে যুক্ত তিনি, অথচ চেহারায় তার কোনো ছাপ নেই।

ড্রাইভারের কথার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কোনো প্রত্যুত্তর করে না। দুঃসহন এক গুমোট নীরবতা জেঁকে বসে মাইক্রোবাসের সিটের ফাঁকে ফাঁকে। আদনান বুঝতে পারে, পূর্ব থেকে অপেক্ষমাণ চার যুবকও ওদের মতোই নতুন। অজানা ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠা তাদের নির্বাক বানিয়ে রেখেছে। গাড়ি চলে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে গাড়িটি একবার ডানে, একবার বাঁয়ে হেলে পড়ে, কিন্তু একবারও উল্টে যায় না। অন্য সময় হলে ড্রাইভারের নৈপুণ্যে আদনান মুগ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু এখন ওর উৎকণ্ঠিত হৃদয় মুগ্ধ হওয়ার সৌজন্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে। মুগ্ধতার বদলে ওরা সবাই সটান শরীরে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ভয়মিশ্রিত কৌতূহলে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে, এই পথের শেষ কোথায়, তারা জানে না।

সীমান্তবর্তী কুপওয়ারা জেলায় তখন শত শত কাশ্মীরি কিশোর-যুবকের ভিড়। নিয়ন্ত্রণরেখা পার হয়ে তারা পাকিস্তান যেতে চায় যোদ্ধা হতে। ফিরে এসে তারা মুক্ত করতে চায় জন্মভূমি। তাদের অধিকাংশই মা-বাবাকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা যুবক। আজাদির জন্য ঘরপলায়ন—সাহসিকতার এই নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা। আদনানরা ইতিহাসের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সারথি।

ত্রেহগামে মাইক্রোবাসটির পৌঁছাতে সন্ধ্যা নেমেছিল। আদনান ভেবেছিল, এই মাইক্রোবাসই ওদের সীমান্তে পৌঁছে দেবে। কিন্তু রুহুল বেগের বাড়ির গোপন কক্ষে একটি রাত ও একটি দিন লুকিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত হলে ও বুঝতে পারে, গন্তব্য এখনো বহুদূর। আদনানের ধারণাকে পোক্ত করতেই গৃহকর্তা জানায়, আগামীকাল বিকেলে তাদের চূড়ান্ত যাত্রা। এখন বিশ্রাম।

শুধুই কি চূড়ান্ত যাত্রা, অনিশ্চিতও কি নয়? বিড়বিড় করেছিল আদনান। আর এমন ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের আগে কী করে বিশ্রাম নেয় শরীর! যখন জীবনের চেয়ে মৃত্যুই অধিক নিকটবর্তী, যখন স্বজনের আহাজারি আর গণকবরের হাতছানির মাঝে তড়পায় প্রাণ। তবু অজানা সফরের জন্য শরীরটাকে প্রস্তুত করতে ও পিঠ লাগিয়েছিল গাদাগাদির বিছানায়। তখন ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ঠিলাভরতি ছাগলের গরম দুধ হাতে দরজার কড়া নেড়েছিল রুহুল বেগের মেয়ে জাহানারা। মুহূর্তে মাটিচাপা দেওয়া বেদনার স্মৃতি লকলকে জিহ্বা মেলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কুপির আবছা আলোয় জাহানারার ওড়নাঢাকা মুখের দিকে চেয়ে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠেছিল আদনানের। জাহানারা যেন নূরজাহানের অনুলিপি হয়ে ভাইয়ের কাছে এসেছে পুষ্টির পেয়ালা হাতে। হায় নূরজাহান, সেই রাতটি যদি তোর বিয়ের রাত না হতো! ডুকরে উঠেছিল আদনান। এই রক্তস্নাত পিচ্ছিল পথে পা রাখবার অনেক কারণ থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাবা-মার আদরের ছেলে, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী আদনান হয়তো আর দশজন যুবকের মতো নির্ঝঞ্ঝাট, নিরুপদ্রব সাংসারিক জীবন বেছে নিত, যদি না নূরজাহানের জীবনে সেই কালরাতটি আসত! বিয়ের পরদিন ভোরেই দুঃসংবাদটি এসে পৌঁছেছিল গুরিহাকায়। মা আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন। বাবা শীতের ডাললেকের মতো জমাট বাঁধা বরফ হয়ে গিয়েছিলেন। আর আদনান, আমাদের গল্পের আদনান ফেটে পড়েছিল প্রলয়ংকরী ক্রোধে। লজ্জায়, অপমানে, ক্ষোভে ও বোনের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

সামনে দাঁড়াতে পারেনি, সান্ত্বনা অথবা সাহস দিতে পারেনি; আজ পর্যন্ত। সেদিন সারাটা বেলা সে গোরস্তানে বসে কাটিয়েছিল। সন্ধ্যায় সূর্য ডুবলে শহীদদের কবরের মাটি ছুঁয়ে সে কসম করেছিল— পঞ্চাশজন সৈন্য হত্যা না করে বোনের সামনে যাবে না সে।

সেই কবরছোঁয়া প্রতিজ্ঞা পূরণকে লক্ষ্য বানিয়ে নিয়ন্ত্রণরেখার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আদনানদের ট্রাক। উপত্যকার আকাশ আজ ঝকঝকে নীল। বিস্তৃত নীলের চাদর ছুঁয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়া। যেন পাহাড়চূড়ায় উঠে হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে দেওয়া যাবে নীলের মখমল। আদনানের একবার মনে হয়, ওই আকাশই ওদের গন্তব্য। ওই আকাশের কাছে আছে দুঃখভোলানিয়া আদর। যেন একবার ওই আকাশ ছুঁতে পারলে ইহজনমের সব দুঃখ শীতের পাতার মতো ঝরে যাবে। আদনানদের ট্রাক ওই আকাশকে গন্তব্য বানিয়ে ছুটছে পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে। পথচারীরা আগের মতোই উচ্ছল, উত্তেজিত। তাদের উচ্ছ্বসিত অভিবাদন এখনো গড়িয়ে আসছে আদনানদের ট্রাকের দিকে। আদনান বিরক্ত হয়। ভয়ও পায়। শ্রীনগর থেকে সারাটা পথ কত সতর্কতা অবলম্বন করেছে ওরা! এত সব সাবধানতা আর কৌশলের পর গ্রামের মানুষগুলোর সরলতা যদি তীরে এসে তরি ডুবিয়ে দেয়, তবে সবই হবে পণ্ডশ্রম। আদনানের অন্তর্লোকে বয়ে চলা অস্থিরতা, ভীতি ও বিরক্তির স্রোত ভেসে ওঠে ওর চেহারায়। গাইড ওর কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করে— ভয় পেয়ো না। ওদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে দাও। গ্রামগুলো গেরিলাদের দখলে। শহর ছাড়িয়ে এই গহন ভূমিতে আর্মি আসতে সাহস করে না।

গাইডের বক্তব্য যে সত্য, তার প্রমাণ মেলে একটু পরই। রাস্তার ধারে একটু পরপর গেরিলাদের অস্থায়ী ক্যাম্প। মেশিনগান কাঁধে তাদের সতর্ক প্রহরা সন্ধ্যার আলোছায়াময় পথটিকে নিরাপদ করে রেখেছে। সমবয়সী দুটি ছেলেমেয়ে ভেড়ার পাল নিয়ে ঘরে ফিরছে। হতে পারে ওরা ভাই-বোন। হতে পারে ঘরে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে মা-বাবা, দাদা-দাদি— আস্ত একটি সংসার অথবা পরিবার। কাশ্মীরে সুখী পরিবারের চিরায়ত এই ছবি গত এক বছরে বদলে গেছে। আগে অভাব ছিল, অসুখ ছিল, প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকা ছিল, তারপরও ছিল ঘরভরতি সুখ ও সুখের ঐশ্বর্য। কনকনে ঠান্ডায়, তুষারপাতের টুপটাপ শব্দের মাঝে, কাংড়ি জ্বালিয়ে, দস্তরখানে সপরিবার রাতের সাদামাটা খাবারের ছিল বেহেশতি আয়োজন। এখন কনকনে ঠান্ডা আছে, তুষারপাতের টুপটাপ আছে, কাংড়ির উষ্ণতা আছে, খাবার আছে, আছে কবিতা-উৎকীর্ণ খাবারের দস্তরখান, নেই শুধু দস্তরখান

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ঘিরে বসে থাকা অনিবার্য মুখ ও মুখের হাসিগুলো। এখন মৃত্যু, কবর ও ধর্ষণ কাশ্মীরে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দ। খুব কম পরিবার আছে, যে পরিবারের দু-একজন যুবক সদস্য নিহত অথবা নিখোঁজ হয়নি। ধর্ষণের গ্লানির ভারে গুমরে মরা পরিবারের সংখ্যাও কম নয়।

ভেড়ার পাল নিয়ে ঘরে ফেরা ভাই-বোন আদনানদের ট্রাকের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আদনান ওদের জীবনের ভেতর খুঁজে পায় আপন শৈশব। নীল আকাশের নিচে, এমন ঘোরলাগা কত বিকেলে ও আর নূরজাহান ঝরনার কাছে গেছে পানি আনতে। সেই মায়াবী দিনগুলো রোদতপ্ত তুষার বলের মতো গলে গলে ছড়িয়ে গেছে কঠিন মাটিতে। আদনান ঘরে ফেরা বালক-বালিকার জন্য অনিরুদ্ধ মায়া অনুভব করে। ওদের দিকে হাত নেড়ে ও মনে মনে আওড়ায়— হে কিশোর, তোমাকে যেন যুদ্ধে যেতে না হয়। হে কিশোরী, মারিয়াম কিংবা নূরজাহানের পরিণতি যেন তোমাকে স্পর্শ না করে।

বুকচিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পর্বত থামিয়ে দেয় রাস্তার অগ্রযাত্রা। কাশতে কাশতে পর্বতের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যায় ট্রাক। ততক্ষণে আরো একটি রাতের আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে প্রকৃতি। ঘরে ফিরতে পর্বতের চূড়ার ওপর দিয়ে উড়ে যায় দুটি ঈগল। ত্রেহগাম থেকে সঙ্গ দেওয়া সেই ক্ষীণাঙ্গী নদীটি আর চোখে পড়ে না। জায়গাটি হয়তো অনেক দুর্গম। নদীটি তাই বাহিত হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছে কোলাহলময় কোনো সহজ পথ। গাইডের আদেশে দ্রুত ট্রাক থেকে নেমে পড়ে আদনান ও তার সাথিরা। চাকার দাগ ধরে আসার পথে ফিরে যায় ট্রাক, নতুন চালান আনতে। যাত্রীরা পর্বতের ঢালুর নিচে বসে অপেক্ষা করে অন্ধকারের। গাইড ওদের পরবর্তী সফরের গন্তব্য সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়। খুব বিপজ্জনক জায়গায় অবস্থান করছে দলটি। যেকোনো মুহূর্তে যা কিছু ঘটে যেতে পারে। আজ রাতে দুই ভাইয়ের মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুটি পর্বত অতিক্রম করতে হবে ওদের। পর্বতের ওপাশেই লাইন অব কন্ট্রোল। এখান থেকে ছয়শ গজের ভেতর আছে বিএসএফ ক্যাম্প। তাদের বাইনোকুলার সব সময় পর্যবেক্ষণ করে চারপাশ। চলার পথে তাই বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে সবাইকে। আলো জ্বালানো যাবে না। যাদের সিগারেটের অভ্যাস আছে, সিগারেট বন্ধ। ক্ষুধা লাগলে বিস্কুট খাওয়া যাবে, কিন্তু প্যাকেট ফেলে রাখা চলবে না। মানুষের কোনো চিহ্ন ওদের বাইনোকুলার ধরতে পারলেই বিপদ। তবে আশার কথা হলো, পর্বতের গা জুড়ে বেড়ে ওঠা ফার এবং পাইনগাছের আড়ালে লুকানোর পর্যাপ্ত জায়গা আছে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তিন মাসের ট্রেনিং শেষে ফেরার সময় কিন্তু পর্বত বরফে ঢেকে থাকবে। তখনকার সময়টা হবে আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং। থমথমে গলায় মন্তব্য করে আতিকুল্লাহ।

তখন আমাদের হাতে অস্ত্র থাকবে। গাইড ওদের সাহস দেয়।

সূর্য ডুবে যায়, তবু আজানের ধ্বনি কানে আসে না— লোকালয় থেকে এতটাই দূরে ওরা। খানিক পর নামাজি-বেনামাজি সকলে তায়াম্মুম করে মাগরিবের নামাজে দাঁড়ায়, গাইডের নেতৃত্বে। পর্বতের শরীর অন্ধকারে ছেয়ে গেলে আল্লাহর নাম নিয়ে ওরা যাত্রা শুরু করে। আকাশে চাঁদ নেই। তবে একটু পরই পৃথিবীর বিশাল শামিয়ানাজুড়ে দৃশ্যমান হয় নক্ষত্ররাজি। তারার আলোয় পর্বতের ফার ও পাইনগাছগুলো মাথা ঝুঁকিয়ে দেখে তরুণ অভিযাত্রী দলকে। ক্রিকেট, সিনেমা, ক্যাম্পাস চত্বরে বন্ধুদের আড্ডা, প্রেয়সীর চোখের মায়া, মায়ের স্নেহ কিংবা বোনের আদর— জগতের মোহনীয় সব হাতছানি ছুড়ে ফেলে ওরা বেছে নিয়েছে কণ্টকিত সেই পথ, কাঁটার ঘাইয়ে যে পথের পথিকদের পা সর্বদা রক্তাক্ত হয়। গাইড বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়— যত কষ্টই হোক, রাতের ভেতরই পাড়ি দিতে হবে সীমান্ত। নয়তো দিনের বেলা কোথাও লুকিয়ে থেকে পরবর্তী রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এতে ঝুঁকি বাড়বে বৈ কমবে না।

গাইডের ওপর বিরক্ত হয় আদনান। এই লোকটা ভয় ছাড়া সাহস দিতে জানে না। তার সব চিন্তাই নেতিবাচক। হাজার হাজার তরুণ ট্রেনিং নিয়ে ফিরে আসছে। এতই যদি ঝুঁকিপূর্ণ হবে, তবে কারোরই তো ফেরার কথা নয়। কিন্তু রাতের প্রথম প্রহর শেষ হলে পার্শ্ববর্তী পর্বতের পাদদেশে টিমটিমে আলোজ্বলা একটি বিএসএফ ক্যাম্প দেখে ভীতবিহ্বল হয়ে ওঠে ওরা। যুগপৎ ভীতি এবং পথের ক্লান্তি তাদের হতোদ্যম করে তুললে বিশ্রামের জন্য গাছপালা ও লতাপাতাঘেরা একটি নিরাপদ জায়গা তারা বেছে নেয়। আর তখন উন্মোচিত হয় গাইডের সতর্কতার তাৎপর্য। সবার ব্যাগেই ফলমূল ও পানীয় ছিল। আপেল, বেদানা, নাশপাতি, আখরোট ভাগাভাগি করে খেয়ে ওরা যখন নব-উদ্যমে যাত্রা শুরু করতে যাবে, ঠিক তখন গাইডের কাছে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে ইমতিয়াজ। ইমতিয়াজের এই ব্যস্তসমস্ত পদক্ষেপে ভড়কে যায় সাথিরা। তারা ঘিরে ধরে ইমতিয়াজকে। ফিসফিস করে জানতে চায় ঘটনা। ইমতিয়াজ শুরুতে কথাই বলতে পারে না কোনো। নিশ্বাসের দ্রুত ওঠানামায় তার কণ্ঠ জড়িয়ে যায়। গাইড ওর কাঁধে হাত রাখলে ও শান্ত হয় এবং খুলে বলে বৃত্তান্ত। জলবিয়োগ করতে গিয়ে অদ্ভুত এক ধাতব তারের দেখা পেয়েছে ও। মাটি থেকে এক হাত উঁচুতে টানটান করে বাঁধা তারটি

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বিএসএফের ক্যাম্পের দিকে চলে গেছে। এতই চিকন সে তার, দিনের আলোয়ও চোখে পড়ার কথা নয়। ইমতিয়াজের প্রস্রাবের ধারা তারে বাধাগ্রস্ত হয়ে দ্বিখণ্ডিত হলেই কেবল ও ধরতে পারে। বৃত্তান্ত শুনে সবার গলা শুকিয়ে যায়। সতর্ক পায়ে ওরা প্রস্রাবের জায়গাটায় যায়। ঘটনা মিথ্যা নয়। এই রাত্রিবেলা নক্ষত্রের আলোয় চিকচিক করছে তারটি। এই তারের মাধ্যমে ক্যাম্পের আর্মিরা কি ওদের সকল কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে? এর এক প্রান্ত যদি ক্যাম্পে গিয়ে শেষ হয়, অপর প্রান্তের ঠিকানা কোথায়?

সফরের শুরু থেকে যে গাইড ওদের ভয়ের ভেতর রেখেছিল, এই বিপন্ন সময়ে সেই গাইড এবার নির্ভয় দেয়। গাইড অভিজ্ঞতা থেকে বলে, দিনের বেলা কোনো এক সময়ে সৈন্যরা এসে তারটি টাঙিয়ে রেখে গেছে। আশপাশের কোনো গাছের গোড়ায় বাঁধা আছে এর প্রান্ত। সৈন্যরা জানে, পর্বতের এই জায়গাটা দিয়ে কাশ্মীরি তরুণেরা নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে। রাত্রিবেলা এখানে এসে বাধা দেওয়ার সাহস ওদের নেই। তাই ঘণ্টা বেঁধে রেখে গেছে।

ঘণ্টা?

এই তারের সাথে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর ঘণ্টা বাঁধা আছে। ভাগ্যিস আমরা টের পেয়েছি। নয়তো তারের সাথে পা লাগতেই ঘণ্টা বেজে উঠত আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্প থেকে এলোপাতাড়ি ফায়ার শুরু হতো।

গাইডের নির্বিকার বিবরণ শুনে বুক হিম হয়ে যায় সবার। ভাগ্যিস ইমতিয়াজ ঠিক জায়গায় প্রস্রাব করতে বসেছিল। আতিকুল্লাহ একে আল্লাহর মদদ আখ্যা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ পড়ে। অন্যরাও গলা মেলায় আতিকুল্লাহর সাথে। ঘণ্টা বাঁধা তার পার হতে গিয়ে অসাড়তা ভর করে সবার ওপর। নিষ্প্রাণ ওই তার যেন বিষধর সাপ, ডিঙাতে গেলেই ছোবল বসাবে। তবু লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সামনে পা বাড়াতেই হবে। গাইডকে অনুসরণ করে দলের প্রতিটি সদস্য কম্পিত পায়ে পার হয় ভয়ংকর জায়গাটি। এরপর সারা রাত ধরে চলে তাদের অভিযাত্রা। কখনো হেঁটে, কখনো দৌড়ে, কখনো ক্রল করে তারা এগোতে থাকে লক্ষ্যপানে। ভোরের আলো ফুটতে ফুটতে তারা পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে পা রাখতে সক্ষম হয়। আদনানদের বরণ করে নিতে আজাদ কাশ্মীর সীমান্তে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল দুটি মাইক্রোবাস। ড্রাইভারদ্বয় ভারত-কাশ্মীর থেকে আসা এই প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত জানিয়ে খুলে দেয় গাড়ির দরজা। আজাদ কাশ্মীরের রাজধানী মোজাফফরাবাদের একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় ওদের। মাইক্রোবাস যখন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের প্রবেশদ্বারের সামনে ব্রেক কষে, শিহরণ বয়ে যায় আদনানের শিরায়

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

শিরায়। মাইক্রোবাসের গ্লাসের ওপাশে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের ছবি দৃশ্যমান হলে আদনানের মনে পড়ে শহীদ বন্ধুদের কথা। তারিকরাও কি এখানেই এসেছিল প্রশিক্ষণ নিতে?

দুই পাহাড়ের মাঝখানে তাঁবু টাঙিয়ে বানানো হয়েছে অস্থায়ী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। জায়গাটা এখন গেরিলাদের পদচারণে মুখর। আদনানের মনে হয়, জঙ্গলে পথ হারিয়ে হঠাৎ এক বাজারের মধ্যে এসে পড়েছে সে। কয়েকজন তরুণ মাটিতে পদ্মাসনে বসে কালাশনিকভ পরিষ্কার করছে। একদল যোদ্ধা ক্রল করে পাহাড়ে উঠছে আবার নামছে। ড্রাইভার জানান— সম্প্রতি এই দলটির প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে ঢোকার জন্য তারা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছে।

মাইক্রোবাস থেকে নেমে আদনান মুগ্ধ চোখে তাকায় সদ্য প্রশিক্ষণ নেওয়া গেরিলাদের দিকে। বয়সে সবাই কিশোর-তরুণ। রক্তাভ গাল-ঠোঁট। লম্বা ভ্রু। চওড়া কাঁধ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বারুদমাখা চোখে আজাদির স্বপ্ন। ছেলেগুলোর এখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার কথা অথচ নিয়তি তাদের কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে! আরামের শয্যা, বাহারি খাবারের প্লেট আর মায়ের আদর ডিঙিয়ে ঘরপালানো এই যুবকেরা জীবন হাতে ছুটে এসেছে গহিন অরণ্যের কাছে, কিসের আকর্ষণে? আদনান বিড়বিড় করে— আসলে আজাদি এমনই এক উজ্জ্বল মাণিক্য, যার পাশে ম্লান হয়ে যায় প্রেয়সীর মুখও। আজাদির আকাঙ্ক্ষায় আশরাফুল মাখলুকাত হয়ে যায় পতঙ্গ, ঝাঁপ দেয় আগুনে। নিজেকে নিঃশেষ করে জ্বালিয়ে রাখে প্রেরণার সলতে।

পাথরের গায়ে জলের শব্দে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে আদনান। শিশনাগের কথা মনে পড়ে ওর। ওদের আপেলবাগানের গা ঘেঁষে কুলকুল রবে বয়ে চলা শিশনাগ। ওর শৈশব থেকে বড় হওয়ার প্রতিটি অধ্যায়ের সাক্ষী শিশনাগ। মারিয়ামের সাথে ওর গোপন কথার একমাত্র শ্রোতা শিশনাগ। আর কোনো দিন কি ও শিশনাগের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে? ভেজাতে পারবে পা? ছুড়তে পারবে নুড়ি? এই সবুজ-স্নিগ্ধ সকালে শিশনাগকে ও প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে অনুভব করে। আগে কোনো দিন এভাবে, এমন নিবিড় করে, শিশনাগ ওর অনুভবে ধরা দেয়নি। ছেড়ে এলেই কি তবে মায়া বেড়ে যায়? নাকি বিপন্নতা মানুষকে স্মৃতিকাতর করে তোলে? জলের শব্দের উৎস সন্ধানে আদনান ইতিউতি তাকায়। সীমান্ত থেকে ওদের বরণ করা তিনজনের একজন জানায়, পাশেই এক নদী আছে। তোমরা চাইলে হাতমুখ ধুয়ে আসতে পারো। আমরা নাশতার ব্যবস্থা করছি।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আদনান সবার সাথে নদীর কাছে যায়। সবুজ জলের পবিত্র আবহে ওর প্রাণ জুড়িয়ে আসে। ও নদীর কূলে একটি পাথরের ওপর বসে চোখে জলের ছিটা দেয়। মুখ-হাত ধোয়। নদীর টলটলে জলে ভেসে যায় গত রাতের সকল ভয় ও অবসাদ। নদীর মাঝখানে মাথাভাসানো একটি বড় পাথর ভাগ করে দিচ্ছে জলের অদম্য স্রোত। সেটাই শব্দের উৎস। বেখেয়ালি এক কাক এপার থেকে ওপারে উড়ে গেলে আদনানের দৃষ্টি পড়ে ওপারের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের ওপর। পাহাড়চূড়ায় ভারতীয় পতাকা উড়ছে। পতাকা পাহারা দেওয়া বিএসএফ সদস্যকে দূরত্বের কারণে লাগছে অতিশয় ক্ষুদ্র। ক্রোধে শক্ত হয়ে ওঠে আদনানের চোয়াল। এই লোকগুলোকে জন্মভূমি থেকে উৎখাত করা ওর সামনের দিনের একমাত্র আরাধনা।

সবুজ ঘাসের ওপর গোল হয়ে খেতে বসে ওরা। একটি ছেলে কোমর ভেঙে সবার প্লেটে শুকনো রুটি বণ্টন করে। অপরজন দেয় সবজি। রুটি বণ্টনকারী ছেলেটি আপন কাজে এতটাই মগ্ন, একবারও মাথা তোলে না। ছেলেটার কাঁধ, চুল, হস্তসঞ্চালন-ভঙ্গি বড্ড পরিচিত লাগে আদনানের। পাতে পাতে ঘুরতে ঘুরতে সে যখন আদনানের পাতে আসে, চোখাচোখি হয় দুজনের। অমনি কেঁপে ওঠে আদনান আর ছেলেটার হাত থেকে পড়ে যায় রুটি।

ভাইয়াজি, তুমি এখানে?

শফিক, তুমি এখানে?

দুজনের বিস্ময়াভিভূত মুখ থেকে বেরিয়ে আসে অভিন্ন জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য। পৃথিবী তার রহস্যময় শরীরের ভাঁজে ভাঁজে কত রকম বিস্ময়ই না লুকিয়ে রাখে! নয়তো দেশের সীমানার বাইরে, রক্তপিচ্ছিল পথের বাঁকে, একসময়ের ভেড়ার রাখাল শফিকের সাথে কেন দেখা হয়ে যাবে! মনিব-ভৃত্য চোখের ওপর চোখ রেখে কতক্ষণ বসেই থাকে আর দাঁড়িয়ে থাকে সময়। শফিকের সঞ্চালিত হাত স্থির হয়ে যায় আদনানের পাতের ওপর। পাশ থেকে রুটি চিবানোর শব্দ আসে। সবজি দেওয়া লোকটি আদনানের কাছে এসে বাধাগ্রস্ত হলে সে তাড়া লাগায়। তখন কেউ একজন বিরক্ত হয়ে শফিকের হাত থেকে রুটির পাত্র কেড়ে নিয়ে বণ্টন শুরু করে। খানিক পর ঘোর ভাঙলে শফিক তপ্ত কণ্ঠে বলে, তুমি কেন, ভাইয়াজি?

শফিকের প্রশ্নের মর্ম ধরতে পারে না আদনান। আমি কেন মানে?

তোমার জীবনের অনেক দাম। এই পথ তোমার জন্য নয়। শফিক আদনানের পাশে ঠেসে বসে।

আর তোমার জীবনের দাম খুব সস্তা? শ্লেষ মিশিয়ে বলে আদনান।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

দশজনকে জিজ্ঞেস করলে সেটাই বলবে।

কবে এসেছ?

দুই মাস। আর এক মাস পরই ট্রেনিং শেষ। তারপর যুদ্ধ।

আদনান রুটি মুখে দেয়। একটু থেমে বলে, এখানে খুব কষ্ট, না?

কষ্ট তো আছেই। যুদ্ধের চেয়েও কষ্ট প্রশিক্ষণে। যুদ্ধে তুমি মরে যেতে পারো কিন্তু প্রশিক্ষণে মৃত্যু নেই। যত কষ্টই হোক, তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। শফিক ওর কনুই এবং হাঁটু বের করে দেখায়। প্রথম প্রথম ক্রল করে পাহাড়ে ওঠানামার কারণে ওর হাঁটু ও কনুইয়ের চামড়া উঠে গিয়েছিল। দগদগে ঘায়ের প্রদাহ এখন কিছুটা কমে এসেছে কালশিটে পড়ার কারণে। তবু প্রশিক্ষণের ভয়াবহ কষ্টের ছাপ এখনো ধরে রেখেছে ওর ক্ষতচিহ্ন। শিউরে ওঠে আদনান। বড় মায়া নিয়ে তাকায় ও শফিকের ক্ষতের দিকে। হে খোদা, যাদের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের কারণে শফিকের হাত ও হাঁটু আবরণ হারিয়েছে, তাদের তুমি ধ্বংস করো। বিড়বিড় করে আদনান।

তুমি খাও। গল্পের জন্য অনেক সময় পাওয়া যাবে।

অনেক ব্যথা?

অভ্যাস হয়ে গেছে। হাসার চেষ্টা করে শফিক।

আদনান আরেক টুকরো রুটি মুখে দেয়। এগুলো কোথা থেকে আসে?

ভেতরে এক গ্রাম আছে। মায়েরা রান্না করে পাঠায়। তাদের অবশ্য ন্যায্য মজুরি দেয় পাকিস্তান আর্মি।

হোক ভিনদেশ। তবু তো মায়ের হাতের রান্না। তারাও কারো না কারো মা। আদনান বেদনার হাসি হাসে।

চাচা-চাচি কেমন আছে? আসার সময় দেখা করে দোয়া নিয়ে আসা দরকার ছিল। কিন্তু বাড়ি থেকে একপ্রকার পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।

একদিন ঘুম থেকে জেগে সন্তানের শূন্য বিছানা আবিষ্কার করে যে বাবা-মা, তারপর দিনে দিনে লোকমুখে জানতে পারে তাদের সন্তান যুদ্ধে গেছে, সেই বাবা-মা কতই-বা আর ভালো থাকতে পারে!

শফিক চুপসে যায়। চুপ করে থাকে আদনানও। একই অপরাধের সমন যাদের মাথার ওপর ঝোলে, তাদের তো চুপসে থাকাই নিয়তি।

খাওয়া শেষে আদনানের সাথিরা তাঁবুর ভেতর বিশ্রাম নেয়। আদনান শফিককে নিয়ে নদীর কূলে পাথরের ওপর বসে। শফিকের সাথে দেখা না হলে আদনানও হয়তো ঘুমাত। কিন্তু এই শ্বাপৎসংকুল পথে একজন চেনা, চেনাই শুধু নয়, আপন মানুষ পেয়ে বুকের ভেতর কথারা খলবল করে। শফিককে ও ছাড়তে চায় না।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কাশ্মীরি ছেলেরা ক্রিকেট ব্যাট ত্যাগ করে অস্ত্র হাতে তুলে নেবে, কেউ দুবছর আগে বললে বিশ্বাস করতাম না। ন্যাকড়া দিয়ে কালাশনিকভ পরিষ্কার করে একটি পাথরের সাথে খাড়া করে রাখতে রাখতে বলে শফিক। একটি ফড়িং উড়তে উড়তে ব্যারেলের মাথার ওপর বসে কী ভেবে আবার চলে যায়।

আদনান ধাতব অস্ত্রটির দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে থাকে। হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে পরখ করে ব্যারেলের কাঠিন্য। বুলেট ধারণকারী কলা আকৃতির ম্যাগাজিন ওর শরীরে শিহরণ তোলে। ট্রিগারে চোখ রাখলে সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হয় মারিয়াম ও নূরজাহানের মুখ।

ভাইয়াজি, তুমি কি এটা দেখতে চাও?

না। যখন আমার নিজের একটি অস্ত্র হবে, তখনই দেখব। আদনানের কণ্ঠ থমথমে।

নূরজাহান বেহেনজি কেমন আছে? তার বিয়ের কথাবার্তা শুনেছিলাম। পরে আর খবর জানতে পারিনি।

আদনান এবার কালাশনিকভটি কোলের ওপর তুলে নেয়। ট্রিগারে আঙুল রেখে শীতল গলায় বলে, ও ভালো আছে। ওর খুব ভালো বিয়ে হয়েছে। এখন শ্বশুরবাড়িতে আছে। একটু থেমে ও আবার বলে, কৈশোরে নিজের সাথে ওয়াদা করেছিলাম, বাবা-মা, ভাইবোনকে ভালো রাখব। তাদের অপূর্ণ চাওয়াগুলো পূর্ণ করব। তাদের দুর্দশা লাঘবে সামনে থাকব। ওয়াদা রক্ষা করতে পারলাম না। আমি এখন তাদের দুশ্চিন্তার কারণ।

আপনজনের ইজ্জত-আবরু আর স্বাধিকারের জন্য লড়তে এসেছ, তাদের জন্য এই তো সবচেয়ে বড় কোরবানি তোমার। কে বলে তুমি ওয়াদা রক্ষা করতে পারোনি! কথাগুলো ভেসে আসে পেছন থেকে, স্পষ্ট উচ্চারণে। আদনান ও শফিক দুজনই চমকে উঠে পেছনে তাকায়। আতিকুল্লাহ কখন যে এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি ওরা।

তোমাদের কথার মধ্যে ঢুকে পড়ার জন্য দুঃখিত। আসলে ঘুম আসছিল না। তাই তোমাদের খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসেছি। আতিকুল্লাহর দুই হাতে দুই পেয়ালা গাওয়া।

এসে ভালো করেছ। বসো। আদনান পাশের একটি মসৃণ পাথরের দিকে ইশারা করে।

আতিকুল্লাহ দুজনের হাতে গাওয়ার পেয়ালা দুটি ধরিয়ে দিয়ে পাথরটির ওপর বসে।

তোমারটা কোথায়?

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আমি খেয়ে এসেছি।

আতিকুল্লাহ নদীর ওপারে তাকিয়ে বলে, দুই পাড়ের পাইনগাছের মধ্যে কোনো তফাত নেই। চিরহরিৎ, সুন্দর, নয়নাভিরাম। অথচ মানুষগুলোয় কত ব্যবধান। ওরা আমাদের বুকে বুলেট ছুড়ছে আর এরা আমাদের হাতে বুলেট তুলে দিচ্ছে।

যদিও দুজনের মতলবে কোনো পার্থক্য নেই। বিদ্রূপ ফুটে ওঠে আদনানের কণ্ঠে।

মানে! আতিকুল্লাহর কণ্ঠে বিস্ময়।

দুই দলেরই লক্ষ্য কাশ্মীর নামের সুন্দরী রমণীকে জোরপূর্বক নিজের ঘরের বউ বানানো।

তা ঠিক বলেছ। কিন্তু পাকিস্তানের সাথে থাকলেই কি আমরা অধিক ভালো থাকব না? প্রশ্ন ছুড়ে দেয় শফিক।

আমরা সব থেকে ভালো থাকব নিজের সঙ্গে থাকলে। আমরা স্বাধীনচেতা জাতি। কোনো দখলদার শক্তির অধীনে আমরা ভালো থাকতে পারি না।

তাহলে পাকিস্তানের সহযোগিতা নিচ্ছ কেন?

যুদ্ধের প্রয়োজনে। যুদ্ধ শেষ হলে আমরা নিজেদের মতো করে দেশ গঠন করব। ভুলে যেয়ো না, একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের উদ্দেশ্য। আমাদের মহান নেতা মকবুল ভাট চিরকাল সেই স্বপ্নই দেখে এসেছেন। আমরা মকবুল ভাটের স্বপ্ন পূরণের জন্যই এখানে যুদ্ধ-প্রশিক্ষণ নিতে এসেছি।

ভাইয়াজি, এই কথাগুলো বলার সময় এখনো আসেনি। এখানে পাকিস্তানপন্থী হিজবুল মুজাহিদিনসহ অন্যান্য দলের গোয়েন্দারা থাকতে পারে। তারা কাশ্মীরকে পাকিস্তানের যুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করছে। আমরা এগুলো আলোচনা করলে হতে পারে তারা আমাদের দুশমন হয়ে উঠবে।

আমি জানি, এসব আলোচনার সময় এটা নয়। কিন্তু আতিকুল্লাহর কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে বাধ্য হলাম। কাশ্মীরে ফিরে গিয়ে জেকেএলএফ নেতৃবৃন্দের সাথে এ নিয়ে কথা বলব। ভবিষ্যৎ বিষয়ে এখনই আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। নয়তো কাশ্মীর ইস্যুতে আমরা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারি। গল্পের সুর কেটে যায়। আর একবার যার সুর কাটে, তাকে আর জোড়া দেওয়া যায় না। ওরা উঠে পড়ে। ক্যাম্পে ফিরতে হবে। আদনান একটি নুড়ি কুড়িয়ে নদীর বুকে নিক্ষেপ করে। শফিক ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বলে, ভাইয়াজি, তুমি যে এখানে আছ, সুস্থ আছ, চাইলে তোমার আপনজনদের জানাতে পারো।

কীভাবে? শফিকের কথা বিস্মিত করে আদনানকে।

মোজাফফরাবাদভিত্তিক একটি রেডিও স্টেশন আছে সাদা-এ-হুররিয়াত নামে। গেরিলাদের স্বার্থ রক্ষা করে এরা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এদের জনপ্রিয় গানের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে এরা নানামুখী বিজ্ঞাপন ও শ্রোতাদের মতামত প্রচার করে। তুমি যদি চিঠি লিখে এদের কাছে কোনো গান শোনার অনুরোধ করো, ওরা অনুষ্ঠানে বলে দেবে, মোজাফফরাবাদের ঝাড়পোরা গ্রাম থেকে আদনান ফয়জুল্লাহ অমুক গানটি শুনতে চেয়েছেন, তিনি আমাদের অনুষ্ঠান পছন্দ করেন। সে সময় চাচা-চাচি কিংবা নূরজাহান বেহেনজি যদি রেডিও শোনে, ঠিক বুঝে যাবে এটা তুমি ছাড়া কেউ নও। তুমি সুস্থ আছ এবং কোথায়, কী উদ্দেশ্যে অবস্থান করছ, একটিমাত্র বাক্য থেকে সব জানা হয়ে যাবে তাদের।

দারুণ তো! আমি ওদের কাছে চিঠি লিখব। উত্তেজিত হয়ে ওঠে আতিকুল্লাহ।

তুমি চিঠি লেখোনি? শফিককে জিজ্ঞেস করে আদনান।

শফিক লাজুক হেসে বলে, হ্যাঁ। অবশ্য বিশেষ একজন না থাকলে হয়তো চিঠিটা লেখা হতো না।

সেই বিশেষ একজনটা কে? আদনান ভ্রু নাচায়।

ওর সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। যুদ্ধটার জন্য বিয়ে পিছিয়ে গেল। লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে শফিকের গাল। খানিক পর ওর রক্তিম গালে জেগে ওঠে বেদনার ছায়া— ইচ্ছা ছিল ঘরে বউ তুলে মাকে সুখ দেব অথচ আমি এখন এই গহিন অরণ্যে পড়ে আছি।

আদনান কাঁধে হাত রাখে শফিকের। দোয়া করো, এই দুঃসময় যেন অনন্ত না হয়।

শফিক, আতিকুল্লাহর এত উত্তেজনা অথচ রেডিওতে চিঠি লেখার কোনো আগ্রহই খুঁজে পায় না আদনান। মারিয়াম নিখোঁজ। নূরজাহান থেকেও অনুভূতিশূন্য। মা সংসার থেকে উন্মুল। বাবা বিমূঢ়তায় আক্রান্ত। এই যখন অবস্থা, তখন আদনান ওর অস্তিত্বের জানান দেবে কার জন্য? ঘরে যার দুশ্চিন্তা করার মানুষ নেই, সে হারিয়ে গেলেই কী আর মরেই গেলেই কী! তার বিপদ-আপদেই-বা কার কী এসে যায়। আদনান রেডিওর ভাবনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে শুয়ে পড়ে শফিকের ব্যবস্থা করা তাঁবুতে। গেল রাতে এক ফোঁটা ঘুমানোর সুযোগ হয়নি। এখন না ঘুমোলে মাথা নিয়ে দাঁড়ানোই

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কঠিন হয়ে যাবে। শ্রীনগর থেকে একটি ট্রেনিং সেন্টারের কল্পিত যে ছবি সে সঙ্গে এনেছিল, এখানকার ব্যবস্থাপনা ততটা ভয়ংকর নয়। অন্য দেশের আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধের ট্রেনিং নেওয়া মানেই তো উদ্বাস্তু জীবন। নানা রকম সংকট, বিপর্যয়, গ্লানি, অসুখ ও দূষণ সেখানে ফণা তুলে থাকে। আদনান এখানকার ঘুম, খাওয়া এবং টয়লেটের পরিবেশ নিয়ে শঙ্কিত ছিল। কিন্তু এক বেলাতেই ওর ভুল ভেঙে গেছে। পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মীর সরকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে সবকিছু। আদনানদের মতো তারাও চায় কাশ্মীরের আজাদি। এ কারণে আজাদির জন্য নিবেদিতপ্রাণ তরুণ-যুবকদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা তারা দিয়ে চলেছে। আর এই মনোরম ব্যবস্থাপনার কারণেই কি না কে জানে, আদনানের ঘুমঘোরে হাজির হয় মারিয়াম। সেই লাল হিজাব, হারিয়ে যাওয়ার আগে যা সে ছেড়ে গিয়েছিল গাউকাদাল সেতুর মুখে, সেই হিজাবটি পরেছে সে। লাল হিজাবের পটভূমিকায় তার গোলাপি মুখ দেখাচ্ছে লাবণ্যময়, অথচ সেই মুখে নেই কোনো হাসি। আদনান মনখারাপের কারণ জিজ্ঞেস করলে ও মুখ ভার করে বলে, আমি হারিয়ে গেলাম অথচ তুমি আর আমাকে খোঁজো না। এত অল্প সময়ে তোমার স্মৃতিতে আমি মৃত হয়ে গেলাম!

মারিয়ামের হাত ধরতে যায় আদনান। কিন্তু সহসা ওর হাত মায়ের রান্নার পাতিলের মুখে উড়ে যাওয়া বাষ্পের মতো অদৃশ্য হয়ে যায়। ধড়ফড় করে ঘুম থেকে জেগে ওঠে আদনান। কত দিন পর মারিয়াম স্বপ্নে এল! মারিয়ামকে পেয়ে ওর উন্মুল জীবন যেন ঠিকানা ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু ঘুম ভেঙে প্রশিক্ষণকেন্দ্রের গণতাঁবুতে নিজেকে আবিষ্কার করে ওর বুক ফেটে যায় বেদনায়। নিজেকে মনে হয় বরফাচ্ছাদিত পর্বতারোহীর মতো, ঝড় যার পিরহান উড়িয়ে নিয়ে গেছে। না, মারিয়ামকে ও মৃত ভাবে না। মারিয়াম জীবিত। একটু গুছিয়ে নিয়ে ও আবার খুঁজতে শুরু করবে মারিয়ামকে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, মারিয়াম বেঁচে আছে। একদিন নিশ্চয়ই ও মারিয়ামকে খুঁজে পাবে। এই ছোট্ট কাশ্মীর মারিয়ামকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। আদনান সিদ্ধান্ত নেয়— মারিয়ামকে নিজের অস্তিত্বের জানান দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিগগিরই ও সাদা-এ-হুররিয়াত বেতারে চিঠি লিখবে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

চৌদ্দ

অবসর পেলেই গ্রাম দেখতে বেরিয়ে পড়ে আদনান। একেক দিন ওর সঙ্গে থাকে আতিকুল্লাহ অথবা ইমতিয়াজ, কোনো দিন সে একা। শফিক যত দিন ছিল, সে-ও সঙ্গ দিত বন্ধুর মতো একসময়ের মনিবের ছেলেকে। ট্রেনিং শেষে শফিকদের দলটি ফিরে গেছে কাশ্মীরে। আদনানরা ফেরার অপেক্ষায়। গুরিহাকা আর আজাদ কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর মধ্যে মৌলিক কোনো প্রভেদ নেই। সেই সবুজ পাহাড়, পাইনগাছের সারি, নীল পানির ঝরনা, সমতল ভূমিতে শিশু-কিশোরদের ক্রিকেট-হল্লা, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে দৃষ্টিনন্দন কাঠের বাড়ি, হঠাৎ হঠাৎ পথের বাঁকে উদয় হওয়া সালোয়ার-কামিজ আর ওড়নাঢাকা বাদামি চোখের ললনা। নিসর্গে প্রভেদ না থাকলেও দুই পারের জীবনে আছে বিস্তর প্রভেদ। এখানকার জীবন তরঙ্গময়, কোলাহলমুখর, হাসি-আনন্দে কল্লোলিত; আর ওপারের জীবন অনিশ্চিত, বিভীষিকাময়, শক্ত বুটের নিচে তড়পানোই যার নিয়তি। এপারের মানুষের মুখ নির্ভার, অবিবাদী। প্রতিদিন একটু একটু করে বেঁচে থাকার কোনো তাড়া নেই এদের। যেমনটি আছে আদনানদের।

তাঁবুর সামনে একটি পাথরের ওপর বসে গাওয়া খাচ্ছিল আদনান। চারপাশে ভুরভুর করে উড়ছিল জাফরান, দারুচিনি ও এলাচের ঘ্রাণ। শীতের আমেজ শুরু হয়ে গেছে। বরফের টুপি মাথায় দিতে প্রস্তুত পর্বতরাজি। আজ টি-শার্টের ওপর আগেভাগেই পিরহান চাপিয়েছে আদনান। পরনে ট্রাউজার। পায়ে শক্ত সোলের জুতা। আসরের ওয়াক্ত অত্যাসন্ন। নামাজ শেষে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা ওর। এমন সময় আতিকুল্লাহ এসে বলল, স্থানীয় দুটি কিশোর এসেছে ক্যাম্পে। তারা একজন যুবককে খুঁজছে। তাদের বর্ণনা শুনে মনে হলো, তোমাকেই খুঁজছে ওরা।

যাহ্! এখানে কে আমাকে খুঁজতে আসবে! যুগপৎ বিস্ময় ও অবিশ্বাসের ছায়া পড়ল আদনানের মুখে।

ক্যাম্পের প্রবেশপথে প্রহরীর কাছে ওদের বসিয়ে রেখে এসেছি। একটু চলো। না চিনলে চলে এসো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বন্ধুর সাথে গাওয়ার পেয়ালা হাতে ক্যাম্পের প্রবেশদ্বারের দিকে হাঁটতে লাগল আদনান। গতকালের বীভৎস একটি খবরে উত্তপ্ত হয়ে আছে গোটা ক্যাম্প। প্রতিশোধস্পৃহায় টগবগ করে ফুটছে প্রতিটি সদস্য। কুপওয়ারা জেলায় ৪৩ জন কাশ্মীরি নারী ভারতীয় সৈন্য কর্তৃক গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার একই কথা, ট্রেনিং

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

যথেষ্ট হয়েছে, এবার ফেরা যাক। শয়তানগুলোকে দুনিয়া থেকে বিদায় না করে স্বস্তি নেই।

ধর্ষণের খবর সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ করেছে আদনানকে। এই একটি সংবাদই ওর শিরার ভেতর ঢুকে সমগ্র সত্তায় ঘৃণার বিবমিষা জাগিয়ে তুলছে। যখনই ও এই ধরনের সংবাদ শোনে, জলোচ্ছ্বাসের মতো ফুঁসে ওঠে ওর ক্রোধ। পরক্ষণে ভেঙে পড়ে আফসোসে— হায় কাশ্মীর, তোমার গর্ভে যদি কোনো নারীর জন্ম না হতো! যাদের আবরু রক্ষা করার শক্তি তোমার নেই, তাদের জন্ম দাও তুমি কোন স্পর্ধায়! কত ভরসা করে মেহেদিরাঙা হাত স্বামীর হাতে রেখেছিল নূরজাহান। স্বপ্নের কুঁড়িগুলো পাপড়ি হয়ে মেলার আগেই তা ঝরে গেল ধুলোয়। সেই রাতের নৃশংসতার অনুপুঙ্খ আখ্যান শোনার হিম্মত হয়নি আদনানের, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটনার অনুমিত ধারাবর্ণনা এতবার ওর মস্তিষ্কের ওপর অনুরণিত হয়েছে, চোখের দেখা সত্যের চেয়েও অধিক বাস্তব হয়ে তা জেগে আছে ওর স্মৃতিজুড়ে। সেদিন কাশ্মীরের শত বছরের ঐতিহ্য ভেঙে দিনের আলো থাকতেই বউ নিয়ে যাত্রা করেছিল বরযাত্রীর গাড়ি। সন্ধ্যা নামার আগেই নূরজাহানের শ্বশুর-শাশুড়ি হৃদয় থেকে বরণ করে নিয়েছিল বাড়ির নতুন সদস্যকে। মহল্লার মেয়েরা ঝাঁক বেঁধে এসেছিল নতুন বউ দেখতে। নূরজাহানের পটে আঁকা মুখ দেখে আহমদের ভাগ্যের তারিফ করছিল সকলে। ভাগ্যের আশকারা ছাড়া এমন সুন্দরী, পয়মন্ত বউ জোটে কয়জনের! নূরজাহানের রূপ কারো কারো বুকে যে ঈর্ষাগাছের কাঁটা ফোটাচ্ছিল না, তা কিন্তু নয়। খানিক পর, মেয়েরা মুখে মিষ্টি আর বুকে ঈর্ষার গোপন কাঁটা নিয়ে ঘরে ফিরলে বিয়েবাড়ির চাঞ্চল্য সেদিনের মতো থেমে গিয়েছিল। দুই রাকাত নামাজ পড়ে নূরজাহানকে নিয়ে আহমদ শুয়ে পড়েছিল বাসরশয্যায়। অনাঘ্রাত সুখের ঢেউয়ে ওর অনভিজ্ঞ হৃদয়নৌকা আন্দোলিত হচ্ছিল বারবার। পাহাড়ি পথের বিস্ময় নিয়ে সামনে পড়ে আছে আস্ত একটি রাত, যে রাতের তাৎপর্য আর দশটি রাত থেকে নিরঙ্কুশ আলাদা। এমন রাত সাধারণত একবারই আসে নারী-পুরুষের জীবনে। আর তাই, এ রাতের কুশীলবদ্বয় থাকে আবিষ্কারের নেশায় উন্মত্ত, ঈষৎ সন্ত্রস্তও। এদিন অনভিজ্ঞতাজনিত ভীতি আহমদের উত্তেজনাকে পরাস্ত করছিল বারবার।

রাতের প্রথম প্রহর কেটে গেলে যখন নবদম্পতির পারস্পরিক হৃদয় হস্তান্তর সম্পন্ন হয়, ঠিক তখনই সদর দরজায় অসহিষ্ণু করাঘাত। দিনকাল খারাপ পড়েছে। উৎকণ্ঠা প্রতিটি মুহূর্তকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। প্রতিটি রাত জাঁকালো অন্ধকারের সাথে বয়ে আনে মৃত্যুনীল আতঙ্ক। দুঃসংবাদের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

জন্য উপত্যকার মানুষেরা এখন এতটাই প্রস্তুত থাকে, টিনের চালে তুষারপাতের মিহি শব্দকেও মনে হয় বুটের আওয়াজ। এই যখন অবস্থা, তখন সদর দরজার অবিরাম করাঘাত বাড়ির ঘুমক্লান্ত সদস্যদের কল্পনায় আজরাইলের ডানার ঝাপটা হিসেবে চিত্রিত হয়। অন্ধকার বিছানায় হন্তদন্ত হয়ে উঠে বসেন আহমদের মা। স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন, শুনতে পাচ্ছেন! কিছু শুনতে পাচ্ছেন?

স্বামী আশফাক মিরের অনুভূতিও অভিন্ন— এই রাতে কারা দরজা ধাক্কায়? সন্ধ্যারাতে দূরে তিনি গুলির শব্দ শুনেছিলেন। এটা কি সেই গুলির প্রতিক্রিয়া? লতিফুন্নেছা স্বামীর হাত চেপে ধরেন— আমার খুব ভয় করছে। ও গো, আমার খুব ভয় করছে। ঘরে আহমদের নতুন বউ।

আশফাক মির স্ত্রীকে মিছে সান্ত্বনা দেন— ভয় পেয়ো না। ওরা সম্ভবত বিদ্রোহীদের খুঁজতে এসেছে। আমাদের বাড়ি কোনো বিদ্রোহী নেই। অতএব, ভয়েরও কিছু নেই। ওদের দরজা থেকেই বিদায় করে দেব।

করাঘাতের শব্দ ক্রমেই বাড়ে, সাথে গালাগালি। প্যারামিলিটারির অশুভ থাবা যে পড়েছে বাড়িতে, কোনো সন্দেহ নেই। আশফাক মির বাইরের বাতি জ্বালিয়ে ছুটে যান ছেলের ঘরের দরজায়। আহমদও তখন বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বাপ-বেটায় মুখোমুখি হয়ে যায় দরজার সামনে। আশফাক মির উৎকণ্ঠিত গলায় বলেন, আমি ওদিকটা দেখছি। তুমি ঘরে যাও, বেটা। খবরদার, বের হবে না। তিনি সদর দরজার দিকে যেতে গিয়ে আবার ফিরে আসেন এবং পুনরায় সতর্ক করেন— ভেতরে যাও। বউমার কাছে থাকো। খবরদার, বের হবে না।

আশফাক মির সদর দরজার দিকে এগিয়ে যান। তার স্ত্রী এক পৃথিবীর উৎকণ্ঠা নিয়ে জানালার পর্দায় মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকেন। দরজার পাল্লা সরতেই যমদূতের মতো একঝাঁক সশস্ত্র প্যারামিলিটারি সদস্য প্রবেশ করে বাড়িতে। আবছা আলোছায়ায় উঁচানো বন্দুক, জলপাই রঙের হেলমেট আর কমব্যাট বুটে সজ্জিত তাদের প্রত্যেককে লাগে দৈত্যের মতো। লতিফুন্নেছা ডুকরে ওঠেন— ইয়া আল্লাহ, তুমি রহম করো।

আপনারা? ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করেন আশফাক মির।

বাহিনীর দলপতি রাতের নীরবতা খানখান করে কঠিন গলায় যা বলে, তার সারমর্ম এই : তাদের একটি কনভয় সন্ধ্যারাতে মদনাপুরার রাস্তা ধরে চলছিল। পথিমধ্যে জঙ্গিদের গ্রেনেড হামলার শিকার হয়েছে কনভয়টি। ৯

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

জন নিহত। তাদের কাছে খবর আছে, হামলাকারীরা এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

এসব কী বলেন আপনারা? আমি নির্বিবাদী মানুষ। ক্ষুদ্র ব্যবসা আমার পেশা। আমি কেন জঙ্গিদের আশ্রয় দেব!

তোমার ছেলে কোথায়? জঙ্গিদের সাথে তার কানেকশন আছে।

আহমদ কলেজে পড়ায়। সে কেন জঙ্গি হতে যাবে! তা ছাড়া আজ তার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের রাতে কেউ বোমাবাজি করতে যায় নাকি!

বিয়ে! দলপতি নিঃশব্দে সৈন্যদের দিকে তাকায়। কিছু কি ইশারাও করে?

পেছন থেকে এক সৈন্য এগিয়ে আসে— তোমার ছেলের ঘর কোনটি? নতুন বউ আছে তো ঘরে?

আশফাক মির থরথর করে কেঁপে ওঠেন। মুখ ফসকে কী ভয়ংকর তথ্য তিনি ফাঁস করে দিয়েছেন! অনুশোচনায় তিনি ক্ষয়ে যান, ভেঙে পড়েন। কেন তিনি বিয়ের কথা বলতে গেলেন!

তোমার ছেলের ঘর কোনটা?

আশফাক মির মাথা নিচু করে স্থির দাঁড়িয়ে থাকেন। তার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ থেকে কোনো বাক্য ধ্বনিত হয় না। তার সজল চোখের সামনে ভাসে বউমার মিষ্টি মুখ। বেটি, এই বুড়ো বাপকে ক্ষমা করে দিস।

এর পরের ঘটনা খুব দ্রুত ঘটে যায়। সৈন্যরা আহমদের ঘরের দরজা ভেঙে বের করে আনে নববধূ নূরজাহানকে। উদ্যত অস্ত্রের মুখে পরিবারের সবাইকে বেঁধে ফেলা হয় মোটা রশি দিয়ে। তারপর এ বাড়ির নতুন বউকে ঘিরে রচিত ইতিহাসের ন্যক্কারজনক অধ্যায়। নূরজাহান শামিল হয় সেই সব হতভাগার মিছিলে, যুগে যুগে বাসররাতে যাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে।

আহ্! নূরজাহানের ব্যথাভরা মুখটা ভেসে উঠতেই আদনানের কম্পিত হাত থেকে গাওয়ার পেয়ালাটা পড়ে যায়।

এই, কী হলো! তুমি ঠিক আছ তো? আতিকুল্লাহ শূন্য পেয়ালাটা কুড়িয়ে নিয়ে আদনানের দিকে তাকায়। অস্তমিত সূর্যের মতো লাল আদনানের চোখ।

কিছু না। আমি ঠিক আছি। আদনান চোখের কোনা মুছে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে।

ক্যাম্পের প্রবেশদ্বারে একটি গাছের গুঁড়ির ওপর পা রেখে অল্পবয়সী দুটি ছেলে ক্রিকেট খেলা নিয়ে গল্প করছিল। ওদের একজনকে চিনতে পারে আদনান। মুহূর্তে ওর মুখটা হাসি হাসি হয়ে যায়— আরে ইউসুফ, তুমি? এই

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

মুহূর্তে ওকে দেখে কে বলবে এক বীভৎস ক্ষত বুকে নিয়ে সুখে থাকার অভিনয়জীবন বেছে নিয়েছে ও!

আতিকুল্লাহ প্রফুল্ল কণ্ঠে বলে, বললাম না ওরা তোমাকে খুঁজছে! অথচ তুমি বিশ্বাসই করছিলে না।

ইউসুফের সাথে পরিচয় দিন দুয়েক আগে। নিয়ম করে আদনান সেদিনও ঘুরতে বেরিয়েছিল বিকেলে। পর্বতের নিচে সবুজ ঢালু মাঠে একটি পাথরখণ্ডকে স্ট্যাম্প বানিয়ে ক্রিকেট খেলছিল কয়েকটি বালক। অধিকাংশের গায়ে কাবুলি। কয়েকজনের মাথায় রঙিন টুপি। খেলার আনন্দে ডগমগ করছিল তাদের গোলাপি মুখ। সবার বয়স বারো-তেরোর ভেতরে। ওদের খেলার মাঠটিকে মনে হচ্ছিল স্বর্গ থেকে নেমে আসা একটুকরো উদ্যান। মাঠের কোল ঘেঁষে নিম্নভূমির দিকে নেমে গেছে একটি পানির নালা। নালার পানির ভেতর চকচক করছিল নুড়িপাথর। লাল রঙের দুটি গরু নালায় মুখ ডুবিয়ে পানি খাচ্ছিল। নালাটির গন্তব্য একটি হ্রদ। কলকল সুরতান ছড়িয়ে নালাটি মিলিত হয়েছে হ্রদটির সাথে। বৃত্তাকার পাইনগাছের সারি হ্রদটিকে ঘিরে রেখেছে চারপাশ থেকে। পাইনের সবুজ পাতার ছায়ায় হ্রদটির পানি গাঢ় সবুজ। নালার ধারে উইলোগাছের নিচে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে চিৎকার করছিল— ইউসুফ, এই ইউসুফ! ভাই আমার, এক্ষুনি চল, নয়তো আব্বুজিকে বলে দেব।

ইউসুফ যে কে, মোটেও বোঝা গেল না। কারণ, ক্রীড়ারত বালকদের কেউই মেয়েটির ডাকে সাড়া দিচ্ছে না।

দূর থেকে ঘটনা লক্ষ করছিল আদনান। মেয়েটির হয়রান অবস্থা দেখে মস্তিষ্কে সংকেত গেল— নিশ্চয়ই গুরুতর কোনো ব্যাপার। ও লাফ দিয়ে পানির নালা ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ল খেলার মাঠে। গরু দুটি এখন ঘাসে মুখ ডুবিয়েছে। এই, তোমাদের মধ্যে ইউসুফ কে?

মেয়েটিকে পাত্তা না দিলেও ওরা আদনানের দিকে ঠিকই মনোযোগ ফেরাল। কারণ, আদনান অপরিচিত। অল্পবয়সী ছেলেরা আপনজনকে উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু অপরিচিতজনকে নয়। কয়েকজন বল করা ছেলেটিকে দেখিয়ে বলল, ওই তো ইউসুফ, বল করে।

আদনানেরও মন বলছিল, ওটাই ইউসুফ হবে। মেয়েটির সালোয়ার-কামিজের রং লাল, ছেলেটিরও তাই। ইউসুফ, বেহেনজি তোমাকে ডাকছে। কেন ডাকছে শুনে এসে তারপর খেলো। আদনান হাত ইশারায় মেয়েটিকে দেখাল।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ডাকুক। বেহেনজি শুধু খেলার সময়ই ডাকে। খেলা রেখে আমি কোথাও যেতে পারব না। ইউসুফ ঝাঁজের সাথে বলল।

বেহেনজি তোমার বড়। বড়রা ডাকলে শুনতে হয়। তুমি যাও, আমি তোমার হয়ে বাকি বলগুলো করে দিচ্ছি।

এবার অন্যরা হইহই করে উঠল। আপনি বড় মানুষ। আমরা বড়দের সাথে খেলি না। আপনি যান।

আমি তোমাদের মতোই আস্তে বল করব।

আস্তে করলেও আপনাকে নেব না। আপনি এখন যান।

মেয়েটির সামনে বেকায়দায় পড়ল আদনান। ছেলেগুলো বড্ড তেজি এবং স্বাধীনচেতা। আশপাশে কোনো বাড়িঘর নেই। জরুরি না হলে অনুজকে ডাকতে দূরের লোকালয় থেকে মেয়েটির এখানে আসবার কথা নয়। মেয়েটির প্রতি প্রচ্ছন্ন মায়া অনুভব করল ও। একবার ভাবল, ওকে জিজ্ঞেস করে, কেন ইউসুফকে তার প্রয়োজন। ভাবতে ভাবতে সে ঘুরল আর দেখল মেয়েটি হনহন করে ঢালু বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। তার পরপরই সূর্য ডোবার মতো টুপ করে সে খাদের আড়ালে হারিয়ে গেল।

আশ্চর্য! মেয়েটির মনে কোনো ভয়ডর নেই! এই নির্জন তেপান্তরে, একাকী কীভাবে সে খাদের ভেতর নেমে যেতে পারল! অদম্য কৌতূহল মেয়েটির পিছু নিতে বাধ্য করল আদনানকে। একটু পর জলপ্রপাতের শব্দ ভেসে এলে খোলাসা হলো সবকিছু। একটি বৃহৎ পাথরের ওপর থেকে নালার পানি লাফিয়ে পড়ছে হ্রদের ভেতর। সেই লাফানো পানি পিতলের ঘড়ায় ভরেছে মেয়েটি, কিন্তু পানিভরতি ঘড়া নিয়ে ওপরে ওঠার ক্ষমতা তার নেই। সে ঘড়াটি মাথায় তোলার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। নূরজাহানের কথা মনে পড়ল আদনানের। সূর্যের কমলা আলো মুখে নিয়ে বিব্রত এবং অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে যেন তার অনুজা নূরজাহান।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় আদনান। মেয়েটির পরিচিত কেউ থাকলে সে নিশ্চয় পানির ঘড়া তুলতে সাহায্য করত। কিন্তু এখানে আদনান ছাড়া তৃতীয় কোনো মানুষ নেই। ফলে, একটি বিপদগ্রস্ত মেয়ের পাশে দাঁড়াবার দায়িত্ব নৈতিকভাবে আদনানের কাঁধে এসে পড়ে।

আমি তোমাকে সাহায্য করছি।

চমকে ওঠে মেয়েটি। কেউ যে তার পিছু পিছু লেকপাড় পর্যন্ত চলে এসেছে, ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। এই নির্জন প্রান্তরে অপরিচিত যুবককে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। ঘড়া রেখে দ্রুত ওড়না টেনে নিজেকে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আড়াল করার চেষ্টা করে। আদনান তাকে আশ্বস্ত করতে চায়— ভয় পেয়ো না, আমি তোমার কল্যাণকামী। ইউসুফের কাজটা আমি করে দিতে চাই।

মেয়েটির মুখের মেঘ তবু সরে না। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে আপন জায়গায়। কিন্তু হ্রদের বুকে জলের সঞ্চালন এবং তা থেকে উৎপন্ন মনোহর শব্দ থেমে থাকে না। থেমে থাকে না হ্রদের আয়নায় ঝকঝকে নীল আকাশের মুখ দেখাও। আদনানের ইচ্ছা করে এই স্বর্গীয় আবহের মধ্যে আরো কিছুটা সময় অতিবাহিত করতে। কিন্তু মেয়েটি অস্বস্তির কথা ভেবে সে ত্যাগ করে গোপন ইচ্ছা। পানিভরতি পিতলের ঘড়াটা হাতে নিয়ে সে পাড় বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে।

উপযাজক হয়ে যে যুবক এত দূর এগিয়ে আসতে পারে, তাকে অবিশ্বাস করা যায় না। খানিক পর আশ্বস্ত হয় মেয়েটি। তবে তার ভয়ের শূন্যগর্ভ ভরাট করতে ছুটে আসে দ্বিধা এবং সংকোচ। অপরিচিত মানুষের সাহায্য নিতে তার কুণ্ঠা হয় সীমাহীন। কিন্তু বিকল্প কোনো পথও যে খোলা নেই।

আব্বুজি বাড়ি আসুক, তারপর ইউসুফের মজা দেখাব। এতবার ডাকলাম, তবু এলই না। মেয়েটি বিব্রত ভাব কাটানোর জন্য কথাটা বলে।

সংকোচ কোরো না। আমি তোমাদের গ্রাম দেখতে বেরিয়েছিলাম। আমার হাতে অন্য কোনো কাজ নেই।

আপনি কাদের বাড়িতে এসেছেন? আপনাকে আগে কখনো দেখিনি। মেয়েটি ধীরে ধীরে সাহস সঞ্চয় করে।

আমি ক্যাম্পে থাকি। এই গাঁয়ের শেষ মাথায়।

ও। মেয়েটির গলা হঠাৎ নিভে যায়। ক্যাম্পের কথা শুনে কি সে ভয় পেয়েছে?

নাম কী তোমার? ঘড়া নিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করে আদনান।

বিলকিস।

প্রতিদিন তুমিই কি পানি নিতে আসো?

আব্বুজি আসে। সাথে আমি থাকি।

আজ আব্বুজি এল না?

তিনি শারদাগামে গেছেন।

শারদাগাম তো বেশ দূর। তোমাদের গাঁ কোনটা?

এটাই। ধেরকোট।

খাদের পাড় বেয়ে টিলার ওপর উঠতেই ইউসুফকে দেখা যায়। বেহেনজিকে সাহায্য করতে সে ঝড়ের বেগে দৌড়ে আসছে। বাতাসের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ধাক্কায় হঠাৎ ওর টুপি খুলে পড়ে যায়। ও টুপিটা কুড়িয়ে নিয়ে পরতে পরতে আবার দৌড়ায়। ছেলেটার কাণ্ড দেখে হাসি পায় আদনানের। ইউসুফ কাছে এসে হরিণশাবকের মতো হাঁপায় আর আদনান বলে, চলে এলে যে! খেলা শেষ?

আমাদের ফিল্ডিং শেষ। প্রথম উইকেট পড়লে আমি ব্যাট করতে নামব। মাঠের দিকে তাকিয়ে হড়বড় করে বলে ইউসুফ। দৌড়ানোর অভিঘাতে ওর টুকটুকে ফরসা মুখে রক্তিম আলপনা।

আর এই ফাঁকে বেহেনজিকে সাহায্য করতে ছুটে এলে! তুমি তো খুব সংসারী ছেলে!

এখন কেন এসেছিস! যা, তোকে লাগবে না। পিতলের বাসনের মতো ঝনঝন করে বেজে ওঠে বিলকিসের কণ্ঠ। আদনান হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বিলকিসের দিকে তাকায়। কপট গম্ভীর এই বোনের মাঝে ও কাশ্মীরি মায়ের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায়। নারীরা একই অবয়বে কত যে চরিত্র ধারণ করতে পারে! কখনো বোন, কখনো মা, কখনো প্রেয়সী, কখনোবা আজাদির জন্য রাজপথকাঁপানো বিপ্লবী মহীয়সী।

ধমক খেয়ে চুপসে যায় ইউসুফ। সে নরম গলায় বলে, বেহেনজি, তোমার শাদির সদাই করে আব্বুজি এখনো ফেরেনি?

আব্বুজি ফিরলে তোকে ডাকতাম না।

আরে বিলকিস, তোমার শাদি নাকি? মারহাবা! কবে শাদি? আদনানের কণ্ঠে উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ে।

বিলকিস কুঁকড়ে যায় লজ্জায়। যেন হঠাৎ আসা দমকা বাতাস একটি গোপন, বিব্রতকর প্রসঙ্গের ঘোমটা সরিয়ে দিয়েছে। সে নত মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে, যেন সে এক উইলোগাছ। অকারণে সে ওড়নার প্রান্ত শাহাদত আঙুলে প্যাঁচায়। একফাঁকে কটমট করে তাকিয়ে অনুজকে শাসায়। ইউসুফ ফিক করে হেসে দিয়ে একটি নুড়ি ছুড়ে মারে হ্রদের ভেতর।

কবে শাদি? আবার জিজ্ঞেস করে আদনান।

আগামী শুক্রবার। বোনের বিয়ের আনন্দে ইউসুফের চোখে নক্ষত্রের আলো ঝলমল করে।

তোমার শাদিতে আমাকে দাওয়াত দেবে না, বিলকিস?

আদনানের কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রাম্য সরলা তরুণী হঠাৎ ঘাবড়ে যায়। পার্শ্ববর্তী দেশের একজন বিদ্রোহীকে তার বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো কতটা সংগত এবং নিরাপদ, তাৎক্ষণিক সে বুঝে উঠতে পারে না। সে কেবলই আমতা-আমতা করে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

অমনি ভয় পেয়ে গেলে! আমি তো মজা করছি। ঠিক আছে, দাওয়াত দিতে হবে না।

পানির ঘড়াটা দিন। এবার আমি নিতে পারব।

দুদিন পর তোমার শাদি মোবারক। আজ ইউসুফ পানি নিয়ে যাবে বাড়িতে। আদনান ইউসুফের মাথায় পানির ঘড়াটা বসিয়ে দেয়।

আসি। বিদায়ের আগে নিচু স্বরে সৌজন্য প্রকাশ করে বিলকিস।

শেষ বিকেলের কমলা আলোয় উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় ভাই-বোন। দুজনের দুটি দীর্ঘ ছায়া বন্ধুর মতো সঙ্গ দেয় ওদের। ওরা ঘরে ফিরছে। সুখের পসরা সাজিয়ে ঘরে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে আপনজন। দিন শেষে সুখের কাছেই ওদের প্রত্যাগমন। অভাব-অনটন আর পাহাড়ি জীবনের শত সংগ্রামমুখরতার পরও সুখই ওদের ঠিকানা। আজাদ উপত্যকার চিরসুখী ভাই-বোনের মনোরম ছবি হয়ে ওরা ফুটে থাকে আদনানের চোখের তারায়। একটু পর ঝাপসা হয়ে আসে ওর চোখ। বিষণ্ন হয়ে ওঠে হৃদয়। অমন সুখের ঠিকানা নির্মাণের জন্যই তো আদনানদের সকল বিদ্রোহ।

ইউসুফের সাথে আবার দেখা হবে, আশা করেনি আদনান। এর বড় কারণ, ক্যাম্পের দিন ফুরিয়ে আসছে। শিগগিরই ফিরতে হবে নিজের দেশে। অথচ এরই মধ্যে ছেলেটি খুঁজতে খুঁজতে ওদের ক্যাম্পে চলে এসেছে, ব্যাপারটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। আদনানকে দেখে ইউসুফ ও তার সঙ্গী গল্প থামিয়ে সালাম দেয়। এই বয়সী ছেলেদের চেহারায় এমন মায়া থাকে, এরা সহজেই বড়দের আদর ছিনিয়ে নেয়। তার ওপর ইউসুফ দুরন্ত, চঞ্চল এবং সুদর্শন। ফলে আদর লুটে নিতে তার বাড়তি প্রচেষ্টা করতে হয় না। আদনান দুহাত দিয়ে ইউসুফের দুকাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে হাসি হাসি মুখে বলে, ইউসুফ, তুমি?

আম্মুজি আপনাকে আমাদের বাড়ি যেতে বলেছেন। কুশল বিনিময়ের তোয়াক্কা না করে সরাসরি আসল কথাটা পাড়ে ইউসুফ।

আতিকুল্লাহর ভ্রুতে গিঁট পড়ে। এরই মধ্যে স্থানীয় কোনো পরিবারের সাথে সুসম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে নাকি তার বন্ধু!

আদনান অবাক হয়ে বলে, তোমার আম্মুজি আমাকে চিনলেন কীভাবে? আর কেনই-বা আমাকে যেতে বলেছেন?

বেহেনজি সেদিন বিকেলের কথা বাড়িতে বলে দিয়েছেন।

ও, তাই বলো। আদনানের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আম্মুজি, বেহেনজি— একসঙ্গে একাধিক নারী-প্রসঙ্গের অবতারণা আতিকুল্লাহর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয়। সে আদনানের দিকে রহস্যপূর্ণ চোখে তাকিয়ে বলে, ঘটনা কী! আম্মুজি, বেহেনজি— এরা কারা?

আতিকুল্লাহকে ধোঁয়াশার ভেতর রাখতে আদনানের ভালো লাগে। তাই সে খোলাসা না করে আরো বেশি রহস্যের ঘূর্ণি তৈরি করে। বলে, সময় হলেই সব জানতে পারবে, মেরে দোস্ত।

এখনই আমাদের সাথে চলুন। দেরি হয়ে গেলে ওরা আমাকে খেলতে নেবে না। ইউসুফের কণ্ঠে অনুরোধ ঝরে পড়ে।

ও হ্যাঁ, তোমার তো খেলা রয়েছে। ঠিক আছে, চলো। কিন্তু আম্মুজি কেন আমাকে যেতে বলেছেন?

তা তো জানি না।

ইউসুফ ও তার বন্ধু সামনে, আদনান ও আতিকুল্লাহ পেছনে— এইভাবে ওরা ইউসুফদের বাড়ির উদ্দেশে চলতে থাকে। ধেরকোট গাঁয়ের একটি টিলার ওপর বিলকিসদের দৃষ্টিনন্দন কাঠের বাড়ি। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, ডাললেকে সন্তরণরত কোনো রঙিন শিকারা। সামনে চিনের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল পর্বত। জানুয়ারিতে যখন সাদা বরফে ঢেকে যায় পর্বতটি, কাচের জানালায় চোখ রেখে শুভ্র দৈত্য দেখে বিলকিস নিশ্চয়ই চমকে ওঠে। আদনানদের মেহমানখানায় নিয়ে যায় ইউসুফ। গদির ওপর বসতে দিয়ে পিঠের নিচে গুঁজে দেয় কুশন। আতিকুল্লাহ তখনো উসখুস করছে— এটা কাদের বাড়ি?

একটু পরই দরজায় এক মধ্যবয়সী নারীর মুখ উঁকি মারে। পেছনে লজ্জাবনত বিলকিস। আমি ইউসুফের আম্মুজি। কেমন আছেন আপনারা?

ভদ্রমহিলার চেহারায় এমন আভিজাত্যের ছোঁয়া, সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায় ওরা। আমরা ভালো আছি। আমাদের তুমি করে বললে খুশি হব। আমরা আপনার সন্তানতুল্য।

তুমি করেই বলব। বসো তোমরা। মেয়েকে নিয়ে ভদ্রমহিলাও সামনের গদিতে তাকিয়া টেনে বসেন। উভয়ের মাথায় হিজাব। নিয়মিত পোশাকের ওপর আলগা কাপড়ে ঢাকা সমস্ত শরীর।

আম্মুজি, আমি খেলতে গেলাম। একটা আপেল খেতে খেতে ছুটে বেরিয়ে যায় ইউসুফ।

ভদ্রমহিলা হাসেন— খেলা ছাড়া ছেলেটা কিচ্ছু বোঝে না। মুখে শুধু জাভেদ মিয়াদাদের নাম।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ওই বয়সে আমরাও ক্রিকেটপাগল ছিলাম। হাসতে থাকে আদনান।

সেদিন বাড়ি এসে বিলকিস সব বলেছে আমাকে। তোমাদের মধ্যে কে সেদিন বিলকিসকে সাহায্য করেছিলে?

আমি। স্মিত হেসে জবাব দেয় আদনান।

বিশেষ কোনো কারণে তোমাদের ডাকিনি। পরিচিত হওয়া আর বিলকিসের শাদির দাওয়াত দেওয়া উদ্দেশ্য। তুমি সেদিন যেচে দাওয়াত চেয়েছ, অথচ মেয়েটা আমার এমন বোকা, তোমাকে দাওয়াত দেয়নি। সেই থেকে আমি শরমে মরে যাচ্ছি। আগামী শুক্রবার অবশ্যই তোমরা আসবে। দুজনই আসবে।

বিয়ের প্রসঙ্গে মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে বিলকিসের। কাপড় গুটিয়ে হঠাৎ ও উঠে চলে যায়। আদনান বলে, দাওয়াত দিলেন, আসার চেষ্টা করব অবশ্যই। তবে আমাদের পরিচয় কিন্তু জানলেন না।

তোমাদের পরিচয় জানি। আমাদের দেশে যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে এসেছ তোমরা। তোমাদের জন্য খুব মনখারাপ হয়, জানো! অনেক খারাপ খারাপ সংবাদ আমাদের কানে আসে। তবে এই ব্যাপারে নিশ্চিত থেকো, আজাদ কাশ্মীরের প্রতিটি মানুষ তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। এখানে তোমাদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তাও নেই। প্রত্যেক নামাজের পর আমি তোমাদের আজাদির জন্য দোয়া করি। মায়ের মতো এই মানুষটির আন্তরিকতায় আপ্লুত হয়ে যায় দুই বন্ধু। আতিকুল্লাহ সিক্ত কণ্ঠে বলে, আমরা আমাদের মতো করে চেষ্টা করছি। কিন্তু এই অচলাবস্থা থেকে মুক্তির দিশা পেতে আপনার মতো মায়েদের দোয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্বল। আপনাদের বাড়ি না এলে জানা হতো না এ দেশের মায়েরাও আমাদের আজাদির আকাঙ্ক্ষায় দিন গুজরান করেন।

এত কথা হলো অথচ তোমাদের নামটা এখনো জানা হলো না।

আমি আদনান আর ও আমার বন্ধু আতিকুল্লাহ। চাচাজি কোথায়?

কন্যার শাদি নিয়ে তিনি ভয়ানক ব্যস্ত। আজকাল তাকে আর বাড়িতে পাওয়া যায় না।

আলাপের মাঝপথে বিলকিস ফিরে আসে। সঙ্গে খাঞ্চাভরতি বৈকালিক নাশতা— আপেল, আখরোট, ফিরনি ও গাওয়া। আদনানদের সামনে খাঞ্চাটা রেখে ও মুখ টিপে হেসে বলে, সেদিন দাওয়াত না দিয়ে বোকামি করেছি। এই হলো সেই বোকামির প্রায়শ্চিত্ত। এবার মুখে দিন।

বিলকিসের মা অবাক— তুই তো এই ধরনের কথা বলতে পারিস না। নিশ্চয়ই বাইরে থেকে মুখস্থ করে এসেছিস।

আম্মুজি, তুমি না!

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বিলকিসের বিব্রতকর অবস্থা দেখে সবাই একসঙ্গে শব্দ করে হেসে ওঠে। হাসির শব্দ তখনো মিলিয়ে যায় না, তার আগেই বেদনার এক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় বিলকিসদের পরিপাটি মেহমানখানায়। প্রকৃতির নিয়মই বোধ হয় এমন— হাসির সাথে কান্নার উপাদান মিশিয়ে দিতে সে বড্ড পারঙ্গম। নয়তো নাশতা খাওয়ার ফাঁকে বিলকিসের মা কেন নূরজাহানের প্রসঙ্গ টেনে আনবেন! আত্মজার দিকে একপলক তাকিয়ে তিনি বলেন, রেডিওতে খবর শোনার অভ্যাস আগে ছিল না। তোমাদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে শোনা হয়। কয়েক মাস আগের একটি খবরে খুব মন খারাপ হয়েছিল। পেহেলগাম জেলার একটি মেয়েকে নাকি বিয়ের রাতে ধর্ষণ করা হয়েছে। কী বলব তোমাদের, আমিও এক মেয়ের মা, সংবাদটি আমার হৃদয় দুমড়েমুচড়ে দিয়েছে।

আদনানের মুখে ছিল একটুকরো আখরোট। সহসা ওর মুখের সঞ্চালন থেমে যায়। শুধু মুখ বলি কেন, বজ্রাহত মানুষের মতো স্তব্ধ হয়ে যায় ওর শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আতিকুল্লাহ আড়চোখে দেখে বন্ধুর প্রতিক্রিয়া। ততক্ষণে আদনানের চোখের পাতা কাঁপতে শুরু করেছে। মুখটা থমথমে। ওর মনোদৈহিক পরিবর্তন এত দ্রুতে ঘটে যায়, সামনের আসনে বসে বিলকিস কিংবা ওর মা কেউই টের পায় না। ভদ্রমহিলা তখনো বলেই চলেছেন, আমার মেয়েটার বিয়ে যতই ঘনিয়ে আসছে, ওই হতভাগিনীর কথা ততই মনে পড়ছে। এত বড় বেদনার মুখোমুখি যেন না হয় কোনো নারী। এখনো দুঃস্বপ্ন আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

আম্মুজি, উনি কাঁদছেন! বিহ্বল কণ্ঠে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিলকিস। সত্যিই আদনানের চোখ থেকে তখন দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে গালে। ভদ্রমহিলা অবাক বিস্ময়ে বলেন, তুমি কাঁদছ!

আতিকুল্লাহ বলে, সেই হতভাগিনী আদনানের বোন।

মুহূর্তে পিনপতন নীরবতায় ছেয়ে যায় বিলকিসদের মেহমানখানা। বিলকিস বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে আদনানের দিকে। ওর অভিব্যক্তি এমন— যার বোনের সাথে এমন নৃশংস ঘটনা ঘটে, না জানি তার ভাইটি কতটা কষ্টে পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় শ্বাস নেয়। ভদ্রমহিলা ওড়নায় মুখচাপা দিয়ে অপরাধীর মতো বসে থাকেন। ক্ষণকাল পর অনাকাঙ্ক্ষিত প্রসঙ্গের উত্তাপ কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি টেনে টেনে বলেন, আমাকে ক্ষমা করো, বেটা। যদি জানতাম মেয়েটি তোমার বোন, কখনো ওই কথা মুখে আনতাম না। তোমাকে যে সান্ত্বনা দেব, সেই ভাষাও আমার নেই। শুধু দোয়া করি, আল্লাহই এর উপযুক্ত বিচার করুন। শেষের দিকে ভদ্রমহিলার কণ্ঠও সিক্ত

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

হয়ে আসে। ততক্ষণে নিজেকে সামলে নেয় আদনান। সে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলে, আপনি বিব্রত হবেন না, চাচিজান। ওই কঠিন মহাসত্য বুকে নিয়েই আমার সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত হয়।

সে এখন কেমন আছে? মেপে মেপে জিজ্ঞেস করেন ভদ্রমহিলা।

এই প্রসঙ্গের বাকি কথার ভার নিজের কাঁধে তুলে নেয় আতিকুল্লাহ। বলে, যার সাথে এমন ঘটনা ঘটে, সে কতই-বা আর ভালো থাকতে পারে। তবু ভালোই আছে সে। ওর স্বামীটি ভালো। নয়তো হতভাগিনীর মৃত্যু ছাড়া কোনো গতি ছিল না।

আমি শাহ ইসমাইল হুজুরের মাজারে গিয়ে দোয়া করব। আল্লাহ যেন আপনাদের আজাদিকে ত্বরান্বিত করেন। যখন দুই কাশ্মীর এক হয়ে যাবে, আমি দেখতে যাব আমার বেহেনজিকে। কথাগুলো বলতে বলতে বিলকিসের চোখ সজল হয়ে ওঠে।

একটু সময় নিয়ে আদনান বলে, ওই ঘটনার পর নূরজাহানের সামনে যাইনি। যদি কোনো দিন ওর সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করি, বিলকিস, ওকে বলব তোমার কথা। এক বোনের প্রতি তোমার এই ভালোবাসা নিশ্চয়ই ওকে আপ্লুত করবে।

মহল্লার মসজিদ থেকে মাগরিবের আজান ভেসে এলে ওরা বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। শেষ বেলায় ভদ্রমহিলা আবারো স্মরণ করিয়ে দেন— বিলকিসের শাদিতে অবশ্যই তাদের আসতে হবে। বাইরে তখন শীতের আনাগোনা। খাড়া পর্বতের গায়ে কুয়াশার আবরণ। ইউসুফ খেলা ভেঙে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরছে। মাঠের সেই পানির নালা নির্ভাবনায় হ্রদের জলে মিশছে। আজাদ কাশ্মীরের চিরসবুজ এই হ্রদ কখনো মজলুমের রক্তে লাল হয় না। আদনান ও আতিকুল্লাহ ধেরকোট জামে মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়তে ঢুকলে আরো একটি মায়াবী রাতের সাথে আজাদ কাশ্মীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়।

পনেরো

বিলকিসের বিয়ের খাবারের স্বাদ বহুদিন জিহ্বায় লেগে থাকবে আদনানের। যদিও এক দিনের পরিচয়ের সূত্র ধরে মেয়েটির বিবাহভোজে অংশ নেওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না ওর। তা ছাড়া ওদের ক্যাম্পের কমান্ডারের পক্ষ থেকেও ছিল না স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদন। জরুরি অবস্থায় এখানে ওরা প্রশিক্ষণ নিতে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

এসেছে, বিয়ের দাওয়াত খেতে নয়। কিন্তু এতবার করে বলেছেন ভদ্রমহিলা, না গেলে মনে কষ্ট পাবেন, হয়তো আর কোনো দিন পরিবারটির সাথে দেখাও হবে না, এই সব ভেবে কমান্ডারের নিমরাজিতে ওরা দুজন গিয়েছিল বিয়ের দাওয়াত খেতে। বাড়ির সামনে বিশাল প্যান্ডেলে শ খানেক লোকের ব্যবস্থা হলেও আদনানরা যেহেতু বিদেশি, আরো কজন বিশেষ অতিথির সাথে ওদের বসানো হয়েছিল মেহমানখানায়। লাল জরিদার পাঞ্জাবি পরে ঘরে-বাইরে ছোটাছুটি করছিল ইউসুফ, এ বাড়ির একমাত্র ছেলে। ইউসুফের বাবা রান্নার তদারকিতে ছিলেন তুমুল ব্যস্ত। কাশ্মীরের চিরায়ত ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে পাত্রপক্ষ এসেছিল সন্ধ্যারাতে। বরযাত্রীর আগমনের খবর শোনামাত্র একঝাঁক কাশ্মীরি কিশোরী ছুটে গিয়েছিল বাইরে। কোরাস কণ্ঠে ওয়ানয়ুন গেয়ে তারা বরণ করে নিয়েছিল নতুন দুলামিয়াকে। বিলকিসের ঘর থেকেও ভেসে আসছিল ওয়ানয়ুনের সুর আর তাম্বাখনিয়রের ধপধপ তাল। পাড়ার মহিলারা পালাক্রমে বিলকিসের ঘরে গিয়ে গেয়ে আসছিল কাশ্মীরের ঐতিহ্যবাহী এই গীত। বিয়ের আক্দ শেষে শুরু হয়েছিল খাবারের পর্ব। বিকেলে দশ-বারোটি অস্থায়ী চুলায় ওয়াজওয়ান রান্না হতে দেখেই আদনান বুঝেছিল, বিলকিসের বাবা মেহমানদারিতে উদারহস্ত। মেহমানখানায় চারজনের একেকটি দল ভাগ হয়ে বৃত্ত রচনা করে বসে অপেক্ষা করছিল খাবারের। আদনান ও আতিকুল্লাহর সাথে যোগ দিয়েছিল পাত্রপক্ষের দুজন অতিথি। প্রথমে এল পিতলের মস্তবড় থালা, যাতে চারজন অনায়াসে হাত নাড়তে পারে। একজন পরিবেশক থালার ওপর রচনা করে গেল সাদা ভাতের স্তূপ। তারপর এল চারটি বাক্স। প্রত্যেক বাক্সে হাত মোছা রুমাল, খিলাল, পান-মসলা, চারজনের জন্য আলাদা আলাদা। সবজির দুটো আইটেমের পর উন্মুক্ত হলো আকর্ষণের প্রথম দরজা। এল তাবাখ মাজ। কোনো মসলা ছাড়া তেলে ভাজা খাসির পাঁজরের এই মুচমুচে মাংসকে বলে তাবাখ মাজ। পরিবেশক ভাতের চূড়ার ওপর চারজনের জন্য চার টুকরো তাবাখ মাজ রেখে গেলে অপূর্ব খশবু ছড়িয়ে পড়ল। আদনান ছেলেপক্ষের দুজন আত্মীয়ের সাথে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ভোজনক্রিয়ায় এতটাই তারা আত্মমগ্ন, আলাপ ঠিক জমল না। শুধু এটুকু জানা গেল, তাদের একজন ছেলের মামাতো ভাই, অপরজন চাচাতো। তাবাখ মাজ শেষ না হতেই চারজনের মাথার ওপর দিয়ে বৃত্তের মাঝখানে নেমে এল বিশাল বড় এক চামচ। চামচে লাল ঝোলের সাথে চার টুকরো মাংসের বড়া। চামচের হাতল যার হাতে, তার কোমরের সাথে ঢোলের মতো বাঁধা একটা হাঁড়ি। ওই হাঁড়ি থেকেই বেরিয়েছে বড়াগুলো। বিয়েবাড়িতে কোমরে হাঁড়ি বেঁধে হেঁটে বেড়ানো লোকদের বলে ওয়াজা;

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ওয়াজওয়ানের পাচক। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত বিয়েবাড়ির রান্নার দায়িত্ব দেওয়া হয় আট-দশ সদস্যের এই সব ওয়াজার ওপর। রান্না থেকে শুরু করে পরিবেশন— সবকিছুই এদের দায়িত্বে। এরপর এল রিসতা, এল আবগোশ, ধানিওয়ালা কোরমা, মার্চওয়াগান কোরমা, রোগেন জুস, গুশতাবা। সবগুলোই মাংসের আইটেম এবং সবগুলোর সম্মিলিত একক নাম ওয়াজওয়ান। মুগুর দিয়ে থেঁতলে মাখন মাখানো মাংসের বড়াকে বলে রিসতা। কাশ্মীরি ভাষায় তাবাখ মানে চামড়া আর মাজ মানে মাংস। চমড়ার মতো পাতলা তেলে ভাজা মাংসই তাবাখ মাজ। তেল, ঝাল ও মসলায় লাল করে রান্না করা ঝোলা মাংস রোগেন জুস। ধনেপাতা ও মরিচ মেশানো কোরমাকে বলে ধানিওয়ালা কোরমা ও মার্চওয়াগান কোরমা। আবগোশের আক্ষরিক অর্থ পানি-মাংস। দুধ দিয়ে রান্না করা একধরনের মাংস, যা দেখতে সাদা বা ঘিয়ে রঙের। সবার শেষে এল গুশতাবা। এটাও রিসতার মতোই খানিকটা। তবে রিসতার ঝোলে মরিচ ও টমেটো ব্যবহার করা হয় আর গুশতাবায় ব্যবহার করা হয় টক দই। ফলে রিসতার রং লাল হলেও গুশতাবার রং হয় ঘোলাটে। ওয়াজওয়ানের সর্বশেষ পরিবেশন ছিল এই গুশতাবা। আদনানদের থালার ঠিক মাঝখানে টেনিস বলের মতো গোলাকৃতির গুশতাবা রেখে ওয়াজা বললেন, খানা খতম। আদনান আতিকুল্লাহর কানের কাছে মুখ নিয়ে মজার ছলে ফিসফিস করে বলল, ওয়াজা এত দ্রুত থালার মাঝখানে ফুলস্টপ বসিয়ে দিল!

অনেক দিন পর তৃপ্তি নিয়ে বিশেষ খাবার খেল আদনান। সর্বশেষ ও ওয়াজওয়ান খেয়েছিল নূরজাহানের বিয়েতে। তবে ভোজনবিলাসিতা বলতে যা বোঝায়, সেই খাবারে তা ছিল না। বোনের বিয়েতে বড় ভাইদের কাঁধে এত সব দায়িত্বের বোঝা চাপানো থাকে, আয়োজন করে, তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার ফুরসত হয় না। কাজের ফাঁকে কেবল ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য দু-একটা আইটেম মুখে দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। তা ছাড়া ক্যাম্পের একই ধরনের খাবার ওর রুচি ভোঁতা করে দিয়েছিল। ভিন্ন স্বাদ আস্বাদনের জন্য তেতে ছিল ওর রসনা। এমতাবস্থায় বিলকিসের বিয়ের ওয়াজওয়ান অন্য রকম স্বাদে ধরা দেয় আদনানের জিহ্বায়।

বিলকিসের সাথে দেখা করার সুযোগ খুঁজছিল আদনান। মেয়েটির জীবনের শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় দিন আজ। এই দিনে বড় ভাইয়ের তরফ থেকে ভালোবাসার কোনো স্মারক ছোট বোনের হাতে অর্পিত হওয়া উচিত। কিন্তু বিলকিসকে কী উপহার দিতে পারে আদনান! সে এক পরদেশি, বিপন্ন মাতৃভূমির মুক্তির লক্ষ্যে স্বল্প সময়ের জন্য ও আশ্রয় নিয়েছে বিলকিসদের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

দেশে। যেখানে সে আছে, যাদের আশ্রয়ে আছে, সেখানে আছে নানা আইনকানুন ও সীমাবদ্ধতা। চাইলেই সে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের মতো বিলকিসের জন্য যা খুশি তা হাজির করতে পারে না। এ নিয়ে দুদিন অনেক ভেবেছে আদনান। শেষমেশ ও বিলকিসের জন্য নির্বাচন করেছে সেই উপহার, যা একই সাথে শোকের এবং ভালোবাসার চিহ্ন। নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে মারিয়াম যে লাল হিজাবটি ছেড়ে গিয়েছিল গাউকাদাল সেতুর মুখে, সেই হিজাবটিই ও প্যাকেট করে এনেছে। আদনানদের মুক্তিপ্রত্যাশী এক ভিনদেশি বোনের জন্য এর চেয়ে দামি উপহার আর কিছু হতে পারে না। হিজাবের সাথে সংযুক্ত করেছে এক চিঠি। মারিয়ামের গল্প বলা হয়নি বিলকিসকে। চিঠিতে চোখের অশ্রু দিয়ে মারিয়ামের বেদনাবিধুর জীবনেতিহাস রচনা করেছে আদনান। এই উপহার দেওয়ার জন্যই বিলকিসকে খুঁজছে ও।

অনেক চেষ্টার পরও দ্বিধা ও সংকোচের কারণে বিলকিসের কাছে পৌঁছাতে পারল না আদনান। আজ বিলকিসের শাদি। এ বাড়ির আজ যত আয়োজন, সব বিলকিসকে ঘিরে। বিলকিস আজকের অনুষ্ঠানের মক্ষীরানি। কর্মী মৌমাছিরা আজ চারদিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে তাদের রানিকে। রানির কাছে পৌঁছাতে হলে ভাঙতে হবে কর্মী বাহিনীর দুর্ভেদ্য পাঁচিল, যা আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব। গোটা পাড়ার মনোযোগ আজ যার ওপর নিবদ্ধ, বাইরের মানুষ আদনান তার কাছে এত সহজে পৌঁছায় কীভাবে। ফলে, উপহারের প্যাকেটটি ও ইউসুফকে হস্তান্তর করে বলে, বেহেনজিকে দিয়ো। বোলো, ভাইয়াজির তরফ থেকে উপহার। আদনানের কথা শেষ হয় না, তার আগেই ইউসুফ দুরন্ত মাছরাঙার মতো প্যাকেটটি ছোঁ মেরে নিয়ে ছুটে যায় বেহেনজির ঘরের দিকে। আদনান আঁতকে উঠে বলে, আরে, আস্তে যাও, পড়বে তো!

রাত গভীর হচ্ছে। বিলকিসদের পাড়াটুকু বাদ দিলে ধেরকোটের সকল বাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশে ফুটফুটে তারা। শীত নামছে। দূর থেকে ভেসে আসছে শিয়ালের ডাক। একটু পরই বিলকিসকে নিয়ে যাত্রা করবে বরযাত্রীর গাড়ি। আদনানকে দ্রুত ক্যাম্পে ফেরার তাগিদ দেয় আতিকুল্লাহ। কিন্তু এই বাড়িজুড়ে এত কোলাহল আর আনন্দমুখরতা, আদনানের ফিরতে ইচ্ছা করে না। এখানকার জীবন কত সহজ, কত প্রফুল্লময়, কত নিরুদ্বিগ্ন, যেন নিরবধি বয়ে চলে এক শান্ত নদী। আর ওদের জীবন অনিশ্চিত, বিপন্ন, জানুয়ারির ডাললেকের মতো জমাটবদ্ধ, বন্দুকের নলের মুখে থমকে গেছে যার বহমানতা। মিছিল, প্রতিবাদ, কারফিউ, বারুদের গন্ধ, রক্ত, লাশ—

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

এসব এখন কাশ্মীরের প্রতিশব্দ। রাতের বিয়ের যে ঐতিহ্য, তা বন্ধ হয়ে গেছে ওদের দেশে। বন্ধ হয়ে গেছে ওয়ানয়ুনের সুর, ওয়াজওয়ানের জিবে জল আসা গন্ধ, দুটি মানব-মানবীর নতুন সংসার পাতার স্বপ্ন। ইউসুফের বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আদনানরা বেরোনোর উদ্যোগ নেয়, ঠিক তখনই বিলকিসের ডাক শোনা যায়। আদনান চকিতে পেছন ফিরে তাকায়। নারীদের বেষ্টনী ভেঙে বিলকিস উঠে এসেছে আদনানকে বিদায় জানাতে। সঙ্গে মা। খয়েরি রঙের ভারী লেহেঙ্গার ভারে ডানে-বাঁয়ে দুলছে মেয়েটির শীর্ণ দেহ। মেহেদিরাঙা হাতে আদনানের দেওয়া উপহারের প্যাকেট। বিলকিসের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারে না আদনান। নবজীবনের সজীবতায় ঝলমল করছে মেয়েটি। আসমান থেকে নেমে আসা এক স্বর্গীয় ঐশ্বর্য আশ্রয় নিয়েছে ওর সর্বাঙ্গে। দুদিনের ব্যবধানে ওর মুখ থেকে মুছে গেছে কৈশোরিক চাঞ্চল্য, সেখানে আশ্রয় নিয়েছে নারিত্বের গাম্ভীর্য। কদিন পর যে মেয়েটি মা হবে, তার চেহারায় কৈশোরিক চপলতা মানায় না। তাই তো এই রূপবদলের খেলা, প্রকৃতির। আদনান উৎফুল্ল হয়ে বলে, খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে। জীবনভর এমনই সজীব থেকো।

বিলকিসের মা বলেন, তোমাদের ঠিকঠাক আপ্যায়ন করতে পারলাম না। বিয়েবাড়ির এত ব্যস্ততা!

আদনান মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, অনেক খেয়েছি আজ। বহুদিন পর এমন তৃপ্তি নিয়ে খেলাম।

এখনই বেরোনোর কী দরকার। আরো কিছুক্ষণ বসে যাও।

না না। অনেক রাত হলো। ক্যাম্পে ফিরতে হবে।

বাইরে বাইরে থাকো। পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুমাও। তোমাদের জন্য খুব খারাপ লাগে। খাওয়াদাওয়াটা অন্তত ঠিকঠাকমতো কোরো।

ভাইয়াজির দেওয়া উপহার এখনই খুলে দেখতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু চারপাশে এত মানুষ...

যখন বিয়ের হাঙ্গামা শেষ হবে, যখন একা থাকবে, তখন খুলো প্যাকেটটি। এটা একা দেখার উপহার। অবশ্য সঙ্গে তোমার বরকে রাখতে পারো। ঠোঁটে হাসি আর চোখে বিষণ্নতা নিয়ে বলে আদনান।

জানেন, আগে আমি নামাজে ফাঁকি দিতাম। এখন নিয়মিত পড়ি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর আপনাদের আজাদির জন্য দোয়া করি। আল্লাহ নিশ্চয় এই দুর্দিনের অবসান ঘটাবেন। সাবধানে থাকবেন। শরীরের যত্ন নেবেন। নূরজাহান বেহেনজিকে আমার সালাম জানাবেন।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

যখন যুদ্ধে যাব, সব সময় তোমাদের দোয়ার সঙ্গ অনুভব করব। আল্লাহ তার এত এত বান্দার চোখের জল নিশ্চয়ই উপেক্ষা করতে পারবেন না। আজ আসি। বেঁচে থাকলে হয়তো আবারো দেখা হবে। এটুকু বলে একটু থামে আদনান। তারপর লজ্জিত কণ্ঠে বলে, এমন দুর্ভাগা জাতি আমরা, তোমাদের বেড়াতে যেতে বলব, সেটাও পারছি না। আমাদের ঘর এখন শ্বাপদের অভয়ারণ্য।

বিলকিসের মা এগিয়ে আসেন। সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, মন খারাপ কোরো না। ইনশা আল্লাহ, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। দুই কাশ্মীর এক হয়ে গেলে যখন সীমান্তের মাঝে নল উঁচু করা বন্দুক থাকবে না, আমরা তখন দাওয়াত ছাড়াই বেড়াতে যাব।

একদল নির্ঘুম কুকুরের বেষ্টনীর ভেতর দিয়ে ওরা ক্যাম্পে ফিরে আসে। সেই রাতে ঘুম আসে না আদনানের। বিলকিসের চেহারার মধ্যে ও আবিষ্কার করে নূরজাহানের মুখ। কত সৌভাগ্য নিয়ে এসেছে মেয়েটি! পারিবারিক আশীর্বাদে কত চমৎকার আয়োজনে বিয়ে হচ্ছে ওর। ওর সন্তানেরা পাবে স্বাধীন-সার্বভৌম মাটি। যে মাটি মায়ের আঁচলের মতোই নিরাপদ এবং প্রশান্তিময়। বিলকিসের সৌভাগ্যে বুকের ভেতর ঈর্ষার কাঁটা খচখচ করে আদনানের। এক কাল্পনিক নিক্তিতে ও বিলকিস আর নূরজাহানকে মাপতে শুরু করলে বিলকিসের পাল্লা একদিকে হেলে পড়ে। একই উপত্যকায় একই ধরনের খাবার খেয়ে, একই রকম আলো-বাতাস গায়ে মেখে বড় হয়েছে দুজন। অথচ মাঝখানের একটি সীমান্তরেখা, যার বৈধতা নিয়ে আছে আন্তর্জাতিক মহলের জিজ্ঞাসা, সেই সীমান্তরেখাটি দুটি মেয়ের জীবনের সাথে খেলেছে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি খেলা। একটি মেয়ে বিয়ের রাতে ধর্ষণের কলঙ্ক নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে, সেই বিয়েই অপর মেয়ের জীবনে এসেছে সৌভাগ্যের সিঁড়ি হয়ে। আদনান ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ইচ্ছা করে অ্যাটম বোমা মেরে জুলুমের প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে। ওর ভারী নিশ্বাস আর হাত নিশপিশ শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আতিকুল্লাহর। অন্ধকার হাতড়ে সে অবাক হয়ে বলে, আদনান, কী হয়েছে তোমার?

কিছু না। খটমট করে উত্তর দেয় আদনান। শেষ রাতে ওর ক্লান্ত চোখ ঘুমের আবেশে বন্ধ হয়ে যায়। স্বপ্নে দেখা দেয় নূরজাহান। নূরজাহানের চোখভরতি টলমলে জল। গালে কান্নার দাগ। নির্লিপ্ত নয়নে শুধুই মৃত্যুর প্রতীক্ষা। ছোট বোনের এই মর্মান্তিক পরিণতি কোনো দিন প্রত্যাশা করেনি আদনান।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ট্রেনিংয়ের দিনগুলো দ্রুত ফুরিয়ে আসে। চার মাসের প্রথম দুমাস ওরা দৌড়ানো, পাথর উত্তোলন, ক্রল করে পাহাড়ে ওঠা, গড়িয়ে নেমে পড়া, ডুবসাঁতার, পাথর ছুড়ে লক্ষ্যভেদ, রশি বেয়ে গাছে ওঠা, এক গাছ থেকে আরেক গাছে যাওয়ার মতো দৈহিক প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এরপর শুরু হয় অস্ত্রের প্রশিক্ষণ। কালাশনিকভ, রকেট লাঞ্চার, মাইন বিস্ফোরণ, গ্রেনেড নিক্ষেপে দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে চার মাসে ওরা পুরোদস্তুর গেরিলা হয়ে ওঠে। কীভাবে আচানক আর্মি কনভয়ের সামনে যমদূতের মতো উপস্থিত হতে হবে, এবং একমুহূর্তে কীভাবে ধ্বংসলীলা ঘটিয়ে উধাও হয়ে যেতে হবে, ওদের গেরিলা প্রশিক্ষক তা মর্মে মর্মে শিখিয়ে দেন। সেই সাথে সাংগঠনিক দক্ষতা ও নেতার আনুগত্য বিষয়েও সবক দেওয়া হয় ওদের। গেরিলা প্রশিক্ষণ শেষে ওরা প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে ভিন্ন এক সত্তা আবিষ্কার করে। এক অদ্ভুত অশরীরী ক্ষমতা ওরা অনুভব করে প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে। ওরা মুখিয়ে ওঠে অর্জিত দক্ষতা রণক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার জন্য। তত দিনে শীত নেমে এসেছে উপত্যকায়। সবুজ পাহাড় ঢেকে গেছে বরফের চাদরে। বিরুদ্ধ আবহাওয়ার এই সময়টাতে ভারতীয় সৈন্যরা ভীতবিহ্বল থাকে। তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার এখনই মোক্ষম সময়।

১৯৯২ সালের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহের এক বিকেলে মাতৃভূমি উদ্ধারের সংকল্প নিয়ে যাত্রা শুরু করে ওরা। আসার সময় ওরা প্রত্যেকে ছিল নিরস্ত্র, অপ্রশিক্ষিত সাধারণ তরুণ। এখন প্রত্যেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত অস্ত্রধারী দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। নিয়মিত পোশাকের ওপর ওদের প্রত্যেকের গায়ে চামড়ার কোট। মাথায় কানঢাকা টুপি। পায়ে ডাকব্যাক জুতা। পিঠে পেটফোলা ব্যাগ, তাতে রসদ, পোশাক ও প্রয়োজনীয় অ্যামুনেশন। সন্ধ্যারাতে নিয়ন্ত্রণরেখা পার হয়ে বরফঢাকা পর্বতে ওঠার আগে সবাইকে সতর্ক করে গাইড— মাসখানেক আগে এখানে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছে। অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। ভারতীয় সৈন্যরা ইদানীং খুব সজাগ। একমুহূর্তের অসাবধানতায় বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। তাই সবাইকে চোখকান খোলা রেখে পর্বত অতিক্রম করতে হবে। সাবধান, কোনো চিহ্ন ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না।

রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে ওরা কখনো হেঁটে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনোবা ক্রল করে পর্বতের গা বেয়ে ওপরে ওঠে। পথের দুর্গমতা, শীত এবং ভারী অস্ত্র ওদের এবারের যাত্রাকে দুর্বিষহ করে তোলে। কারো কারো আচরণে এবং কথায় হতাশা ফুটে উঠলে বয়স্ক গাইড ওদের ভেতর জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে দেশপ্রেম— আজাদির জন্য তোমরা জীবন বাজি রেখেছ। নাম লিখিয়েছ মুক্তির লড়াইয়ে। জানি না গোলামির জিঞ্জির থেকে কাশ্মীর

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কখনো মুক্ত হবে কি না। তবে মুক্ত হোক অথবা না হোক, মুক্তির জন্য তোমাদের এই প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ ইতিহাস কখনো বিস্মৃত হবে না। কাশ্মীরের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তোমাদের নাম সোনার হরফে লেখা থাকবে। এই জনপদের মানুষের হৃদয়ে যুগের পর যুগ তোমরা বরিত হতে থাকবে। আজাদির সেনানীরা, দুর্গম পথের এই কষ্ট স্বল্প সময়ের জন্য। আমাদের আগে বহু দল এই পথ অতিক্রম করেছে। আমাদের পরও বহু দল এই পথ অতিক্রম করবে। স্বল্প সময়ের কষ্টের বদৌলতে আল্লাহ যদি আমাদের চিরস্থায়ী মুক্তির দরজা খুলে দেন, তবে সে তুলনায় এই কষ্ট খুবই তুচ্ছ। অতএব, আল্লাহর নামে সামনে চলো।

অন্ধকারে গাইডের মুখ দেখা যায় না, তবু তার ভরাট কণ্ঠের স্বল্পদৈর্ঘ্য বক্তব্য টনিকের মতো কাজ করে। মুহূর্তের মধ্যে চনমনে হয়ে ওঠে সবাই। তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক সোনালি সূর্য, মেঘের আড়াল থেকে যার কিরণ উঁকি দিচ্ছে। কাল্পনিক ওই সূর্যকে নিশানা বানিয়ে নব-উদ্যমে ওরা পথ চলতে থাকে। ওরা তো সেই সব তরুণ, নিরাপদ এবং বর্ণিল ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে প্রত্যেকে যে যার পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠছিল। বাবা-মার মমতা, কলেজ-ভার্সিটির চৌহদ্দি, বন্ধুদের আড্ডা, খেলার মাঠের উল্লাস, পর্যটনকেন্দ্রের অস্থায়ী ব্যবসা, কৃষিকাজ কিংবা আপেলবাগানে বাবার কাজে সহযোগিতা— এভাবেই বড় হচ্ছিল ওরা। হঠাৎ এক ভূমিকম্প এসে চৌচির করে দিয়েছে ওদের বেড়ে ওঠার মসৃণ পথ। বেড়ে উঠতে উঠতে একদিন আচমকা বড় হয়ে গেছে ওরা। জীবন মুঠোয় নিয়ে বিশ্বের অন্যতম প্রশিক্ষিত ও দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো বড়। মায়ের মমতা, বাবার শাসন, ক্রিকেটের আকর্ষণ কিংবা প্রেয়সীর কসম— কোনো কিছুই ফেরাতে পারেনি ওদের। ওরা ঘর ছেড়েছে। ওরা পা রেখেছে দুর্গম বন্ধুর পথে। যতক্ষণ না বাইরের জঞ্জাল সাফ হচ্ছে, ওরা ঘরে ফিরবে না। তত দিনে রেখে যাওয়া জীবন থেকে যদি আবার নতুন করে শুরু করা যায়, ওরা শুরু করবে। নয়তো ভেসে যাবে নিরুদ্দেশে। জাতির বৃহৎ স্বার্থে কয়েক হাজার তরুণ-জীবন নিরুদ্দেশে ভেসে গেলে পৃথিবীর খুব বেশি ক্ষতি হওয়ার কথা নয়।

পথচলার বিরতিহীনতা ওদের পরিশ্রান্ত করে তুললে গাইডের নির্দেশে ওরা সেই জায়গায় যাত্রাবিরতি করে, যাওয়ার পথে যেখানে ওরা ঘণ্টাবাঁধা তারের দেখা পেয়েছিল। পাইনগাছের ডাল ভেঙে ওরা ডালের ওপর আরাম করে বসে। পাশে সন্তানের মতো শুইয়ে রাখে স্টেনগান, এলএমজি, কালাশনিকভ। অন্ধকার ক্রমেই দানা বাঁধছে। তবু দীর্ঘ সময়ের পথচলায়

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

অন্ধকার চোখ সওয়া হয়ে গেছে। টর্চের আলো ছাড়াই ওরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে এবং চিনতেও পারছে।

গাইড সবার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, এই সুযোগে তোমরা খেয়ে নিতে পারো। আবার কখন খাওয়ার সুযোগ হবে জানা নেই। এই ধরনের যাত্রায় শরীরে শক্তি ধরে রাখা খুব জরুরি। তবে হ্যাঁ, খাবারের কোনো চিহ্ন যেন পড়ে না থাকে। সৈন্যরা চিহ্ন দেখলে বুঝে ফেলবে এটা গেরিলাদের গুপ্ত পথ। তখন এই পথ অন্য গেরিলাদের জন্য মৃত্যুফাঁদ হবে।

গাইডের পরামর্শে প্রত্যেকে ব্যাগ থেকে খাবার বের করে। ফলমূল, শুকনো খাবার আর পানির বোতল। আদনান বিস্কুটের প্যাকেট এনেছিল সাথে। আতিকুল্লাহর সাথে ও বিস্কুট ভাগ করে খেয়ে পানির বোতলে মুখ লাগায়। বিস্কুটের খোলা প্যাকেট নিয়ে ঝামেলায় পড়ে আদনান। চকচকে এই প্যাকেট ফেলে রেখে গেলে দূর থেকেও যে কারো চোখ পড়তে পারে। আতিকুল্লাহ পরামর্শ দেয়— ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখো। নিরাপদ কোনো জায়গায় ফেলে দিয়ো।

কিন্তু বন্ধুর পরামর্শ কানে তোলে না আদনান। এমন বিপজ্জনক সফরে পরিশ্রান্ত পা যেখানে শরীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে বারবার, সেখানে কাগজের বাড়তি একটি ঠোঙাও অকারণ বহন করতে রাজি নয় আদনান। ও প্যাকেটটিকে বরফের ভেতর পুঁতে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। একটি চিকন ডাল দিয়ে ও মাটি খোঁড়ার মতো বরফ খুঁড়তে থাকে। তখন ইমতিয়াজ এসে বলে, বেশি করে গর্ত করো। আমার কলার খোসাটাও যেন পুঁতে ফেলতে পারি। গাইড তাড়া দেয়, দ্রুত করো সবাই। ভোরের আগেই এই গহিন প্রান্তর পাড়ি দিতে হবে আমাদের।

ডাল দিয়ে বরফ খুঁড়তে খুঁড়তে শক্ত কোনো কাঠ অথবা লোহার স্পর্শ পায় আদনান। অন্ধকারে জিনিসটা ঠিক কী, বুঝতে পারে না ও। গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ও চমকে ওঠে। যেন ভৌতিক একটি কবজি এবং বরফশীতল পাঁচটি আঙুল ওর হাত চেপে ধরে পাতালপুরীতে ডাকছে। ভয়ে এমনভাবে ও আড়ষ্ট হয়ে যায়, কতক্ষণ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো বসে থাকে। সহসা ও গর্ত থেকে হাত বের করতে পারে না। ক্ষণকাল পর ও অস্ফুট স্বরে চিৎকার করলে কয়েকজন ছুটে আসে। ইমতিয়াজ ব্যস্ত কণ্ঠে বলে, কী হলো?

গর্তের মধ্যে কিছু একটা আছে। কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দেয় আদনান।

কিছু একটা আছে মানে! ইমতিয়াজ সাহস করে হাত ঢোকায় গর্তে। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলে, মনে হচ্ছে কয়েকটি লোহার রড। আলো জ্বাললে বোঝা যাবে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আমার কাছে হাতের আঙুল মনে হয়েছে। পাঁচটি আঙুল। একটি ছোট।

তাই! দেখি তো আবার। ইমতিয়াজ আবার হাত ঢোকায় গর্তে। এবার ও আদনানের অনুমানের সাথে একমত হয়।

ততক্ষণে গাইডও চলে এসেছে ঘটনাস্থলে। বর্ণনা শুনে গাইড যা মন্তব্য করে, তাতে সবার শরীর হিম হয়ে যায়। বরফপাতের শুরুতে এই পর্বতের ওপরই বিএসএফের সাথে আগের দলটির রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল। হতে পারে সেই যুদ্ধের কোনো লাশ বরফের নিচে চাপা পড়েছে আর এটা তারই হাত।

গুঞ্জন শুরু হয় সবার মধ্যে। কাশ্মীরে ঢোকার আগেই লাশের সাক্ষাৎ!

আর দেরি করা ঠিক হবে না। এবার চলো। গাইড তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তাড়া লাগায়।

না। থমথমে গলায় বলে ওঠে আদনান। লাশের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করে আমরা যেতে পারি না। এটা যদি আমাদের কোনো যোদ্ধাবন্ধুর লাশ হয় আর আমরা তার জানাজা ও দাফনের ব্যবস্থা না করেই চলে যাই, সেটা হবে অধর্মের কাজ। আপনি যদি আমাদের চলে যেতে বাধ্য করেন, হতে পারে আমরাও কোনো দিন আপনার লাশ মাড়িয়ে চলে যাব। জানাজাটুকুও পড়ব না। এত কথা বলতে চায়নি আদনান। গাইডের ঔদাস্য ওর ভেতরটাকে এমনভাবে ফুঁসিয়ে তুলেছে, কথাগুলো না বলে ও থাকতে পারেনি। ওর প্রতিটি উচ্চারণের মধ্যে এমন দৃঢ়তা ছিল, গাইড থতমত খায়। বিব্রত ভাব গোপন করে সে বলে, তোমরা সবাই বৃত্ত তৈরি করে দাঁড়াও, আমি আলো জ্বেলে দেখি জিনিসটা কী আসলে। ঘন হও, ঘন হও, আলোর রেখা যেন বাইরে যেতে না পারে।

আদনানের ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হয়। কোনো এক হতভাগার হাতের কবজি। বরফের ভেতর থাকায় এখনো টাটকা। আঙুলগুলো বাঁকা হয়ে আকাশের দিকে উত্থিত। ফিসফাস শুরু হয় সাথিদের মধ্যে— আদনান সত্যিই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছেলে! এটা অমীমাংসিত রেখে চলে যাওয়াটা মোটেও সমীচীন হচ্ছিল না আমাদের।

এরপর তৈরি হয় নতুন ধোঁয়াশা। এটা বিচ্ছিন্ন হাত, নাকি গোটা দেহই চাপা পড়ে আছে বরফের নিচে— কেউ চূড়ান্ত রায় দিতে পারে না। আদনান নেতৃত্বসুলভ ভঙ্গিতে বলে, বরফ সরানো হোক। হতে পারে আমাদের অগ্রগামী দলের কোনো যোদ্ধার শরীর চাপা পড়ে আছে। আমরা আমাদের ভাইয়ের লাশ এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারি না।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কয়েকজন তরুণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেমে পড়ে বরফ সরানোর কাজে। ট্রেনিংয়ের পর এটাই তাদের প্রথম কোনো প্রায়োগিক কাজ, তাই উৎসাহটাও বেশি। একটু একটু করে বরফ সরে আর বরফের ভেতর থেকে একটু একটু করে বেরিয়ে আসে মানবশরীর। অল্পক্ষণ পর যখন বরফের ছাদ পুরোপুরি সরে যায়, তখন উন্মোচিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ। পা দুটো ভাঁজ করা। গায়ে চামড়ার কোট। মাথায় কানঢাকা টুপি। বিস্ফারিত ভঙ্গিতে চোখ দুটো খোলা। যেন বিপন্ন বিস্ময়ে দেখছে রাতের আকাশ। বুকের ওপর দুটো ছিদ্র। তাতে জমাট বাঁধা রক্ত। তার মায়াবী মুখের ওপর টর্চের আলো পড়তেই চিৎকার করে ওঠে আদনান— শফিক!

গাইড আদনানের মুখ চেপে ধরে— কী করছ বেকুব ছেলে! তোমার নির্বুদ্ধিতার কারণে আমরা সবাই লাশ হয়ে যাব।

গাইডকে সরিয়ে দেয় আদনান। ঝপাং করে বরফের মধ্যে বসে পড়ে শফিকের মাথাটা কোলের ওপর তুলে নেয়। ঠান্ডা চুলে হাত বুলিয়ে সিক্ত গলায় বলে, শফিক, চলে গেলি তুই। এভাবে চলে গেলি! আমাদের আর একসাথে যুদ্ধ করা হলো না। তারপর ও শফিকের উন্মীলিত চোখ দুটো বন্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু দ্রোহের অনলে টগবগ করে ফুটতে থাকা ওর চোখ দুটো কিছুতেই বন্ধ হয় না।

আতিকুল্লাহ কাঁধে হাত রাখে ওর— ভেঙে পোড়ো না, আদনান। মৃত্যু দেখার প্রস্তুতি নিয়েই আমরা ঘর ছেড়েছিলাম। এমনকি যেকোনো মুহূর্তে মরতে পারি আমরা নিজেরাও। আমাদের রক্তের ভেতর দিয়ে যদি নতুন প্রজন্মের মুক্তির সূর্য উদিত হয়, ধরে নেব, আমাদের এই ঘর ছাড়া সার্থক হয়েছে।

হঠাৎ পাইনগাছের ঝোপে বুলেটবিদ্ধ হওয়ার শব্দ হয়— স্বৎ স্বৎ। পরপর কয়েকবার। গাইড চিৎকার করে ওঠে, সবাই শুয়ে পড়ো। জলদি। অস্ত্র হাতে নাও। আমরা আক্রান্ত হয়েছি। কুইক।

সবকিছু এত দ্রুত ঘটে যায়, হতভম্ব গেরিলারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কতক্ষণ। তারপর ঝুপঝাপ করে সবাই শুয়ে পড়ে। দলটির সাথে কোনো দলপতি নেই। প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে, প্রত্যেকে যার যার এলাকায় ফিরে যাবে এবং স্থানীয় গেরিলাদলের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের অধীনে যুদ্ধ করবে। কিন্তু পথের মাঝেই যে ওরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে, সম্ভবত প্রশিক্ষণকেন্দ্রও তা ভাবেনি। নয়তো যোগ্য কোনো কমান্ডারকে ওদের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

সঙ্গে পাঠানোর কথা। দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কমান্ডার যেহেতু নেই, গন্তব্যে পৌছার আগপর্যন্ত তাই গাইডকেই ওরা মনে মনে দলপতি ধরে নেয়।

ধাক্কা দিয়ে আদনানকে শুইয়ে দেয় আতিকুল্লাহ। সে নিজেও শুয়ে পড়ে পাশে। তারপর কয়েক সেকেন্ডের জন্য সবকিছু স্তব্ধ। একটু পর যোদ্ধাদের ভারী নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায় শুধু। প্রত্যেকের আঙুল ট্রিগারে, কান শব্দের উৎস অনুসন্ধানে খাড়া। কয়েক শ গজ নিচে, পর্বতের ঢালু থেকে আচমকা আলো জ্বলে আবার নিভে গেলে ওই আলোকে নিশানা বানিয়ে ফায়ার করে আদনান। মেশিনগানের বিকট শব্দ রাতের স্তব্ধতাকে ভেঙে খানখান করে দেয়। সেই শব্দ মিলিয়ে যেতেই ভেসে আসে ভিন্ন কণ্ঠের দুটি চিৎকার। কেবল তীব্র আঘাতপ্রাপ্ত মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের কণ্ঠই এমন চিৎকারের জন্ম দিতে পারে।

চাপা কণ্ঠে তেড়ে ওঠে গাইড— এই, তোমাকে ফায়ার করার অনুমতি কে দিয়েছে!

এ ছাড়া আমাদের আর কী উপায় আছে, বলুন!

ওরা হয়তো এতক্ষণ সন্দেহের ভেতর ছিল। তোমার গোঁয়ার্তুমি আমাদের অবস্থান ওদের কাছে নিশ্চিত করে দিল।

গুলি না করলেও ওরা খুঁজতে খুঁজতে এখানে ঠিকই এসে পৌছাত। আমরা যুদ্ধে জড়িয়ে গেছি। এই মুহূর্তে যুদ্ধের বিকল্প কিছু নেই।

তুমি সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি করছ। ওদের সংখ্যা, অবস্থান, অ্যামুনেশন সম্পর্কে কিছুই আমরা জানি না। এতটা আন্দাজের ওপর যুদ্ধ করা যায় না। তা ছাড়া তোমাদের নিরাপদ গন্তব্যে পৌছে দেওয়া আমার দায়িত্ব। আমি জেনেশুনে তোমাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি না। এই, তোমরা ক্রল করে আমার পিছু পিছু আসো। জায়গাটা এখন মৃত্যুফাঁদ ছাড়া কিছু নয়। গাইড সামনের দিকে চলার উদ্যোগ নেয়। সহযোদ্ধারা নীরব। তারাও হয়তো গাইডের মতোই বিনা যুদ্ধে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে।

এতক্ষণে সামনের পথ সৈন্যরা ঘিরে রেখেছে কি না, আমরা জানি না। সবচেয়ে ভালো হয় এখানে ঘাঁটি গেড়ে শত্রুদের খতম করে তারপর সামনে অগ্রসর হওয়া....

শেষ হয় না আদনানের কথা। তার আগেই কয়েক রাউন্ড গুলি ওদের মাথার ওপর দিয়ে শিসকাটা শব্দ তুলে বেরিয়ে যায়। গুলিটা আসে আগের জায়গা থেকেই। ওরা নিশ্বাস বন্ধ করে বরফে চোয়াল ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। আদনান মাথা নিচু করে আগের নিশানায় আবার ফায়ার করে। ওপরে অবস্থানের এই এক সুবিধা, ওর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। কয়েক সৈন্যের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

মরণচিৎকার বুঝিয়ে দেয়, ট্রেনিং আদনানকে যেমন সাহসী করে তুলেছে, তেমনই ওর নিশানাকেও করেছে নিখুঁত। গাইড বলে, সৈন্যরা ওই একদিকেই আছে। ওদিকেই ওদের ক্যাম্প। আমাদের সামনের রাস্তা নিরাপদ। চলো সবাই আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই।

শত্রু পেছনে রেখে আমরা পালিয়ে যাব কেন? প্রতিবাদ করে ইমতিয়াজ।

কারণ, তারা সংখ্যায় কত আমরা জানি না। গাইড যুক্তি দেখায়।

এক তরুণ বলে, একটা ক্যাম্পে খুব বেশি সৈন্য থাকে না। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে নরকে পাঠিয়ে দিয়েছে আদনান। আমরা একসাথে ফায়ার করলে ওরা সবগুলো মরবে।

তোমরা ভুলে যাচ্ছ আমরা এখন যুদ্ধ করার অবস্থায় নেই। তা ছাড়া আমি তোমাদের নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে এসেছি, যুদ্ধ করতে নয়। কথা না বাড়িয়ে সবাই আমার সাথে চলো। কেউ মাথা উঁচু কোরো না।

আমি যাব না। দৃঢ় কণ্ঠে বলে আদনান।

তুমি যে যাবে না, আমি জানি। বাকিরা চলো। ব্যঙ্গ করে গাইড।

কেন যাবে না তুমি? আদনানের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় আতিকুল্লাহ।

কারণ, আমার সঙ্গে শফিক রয়েছে। শফিককে রেখে আমি যেতে পারব না। আর ওকে নিয়ে যেতে হলে শত্রুদের খতম করেই তবে যেতে হবে। তোমরা গাইডের সাথে চলে যাও। আমি পরে আসব।

তোমার মাথা ঠিক আছে, আদনান! এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে, শত্রু আর লাশের সাথে তুমি কীভাবে থাকবে! কথাটা কার, অন্ধকার বুঝতে দেয় না।

আতিকুল্লাহ বলে, একসাথে এসেছি, একসাথেই লড়ব। আমিও থাকব তোমার সাথে।

ওর দেখাদেখি ইমতিয়াজসহ আরো দুজন প্রত্যয় ব্যক্ত করে আদনানের সাথে থাকার। আদনান দৃপ্ত কণ্ঠে বলে, আমি জানতাম, তোমরা আমাকে হতাশ করবে না। কিন্তু হতাশ করে গাইডসহ বাকিরা। গাইড ওদের নিয়ে ক্রল করে সামনের দিকে অগ্রসর হয় আর পূর্বের জায়গা থেকে আবার ছুটে আসে বুলেট। বুলেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন পাইনগাছের পাতা ওদের গায়ের ওপর পড়ে। আদনান বলে, খুব সাবধান। একদম মাথা উঁচু করবে না। নয়তো আমাদের পরিণতিও এই ছেঁড়া পাতার মতো হবে।

দলটিতে এখন আদনানসহ পাঁচজন। আদনান ওদের দলপতি বনে যায়। ও শফিকের কপালে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বলে, শফিক, ভাই আমার, তোমার খুনের বদলা না নিয়ে আমি যাব না। এরপর ও সাথিদের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ছড়িয়ে দেয় চারপাশে। প্রত্যেকে কয়েকটি পয়েন্ট থেকে একই লক্ষ্যবস্তুতে গুলি ছুড়তে থাকে। জবাবে অজ্ঞাত সৈন্যরাও ছুড়তে থাকে গুলি। কতক্ষণ গোলাগুলির পর প্রতিপক্ষ শিবিরে নীরবতা নেমে আসে। আদনানরা চুপচাপ অপেক্ষা করে আধা ঘণ্টা। তারপরও প্রতিপক্ষ শিবির থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া না এলে ওরা বুঝে নেয়, সবাই খতম হয়ে গেছে। ক্রল করে ওরা আবার এক জায়গায় জড়ো হয়। সবার চোখেমুখে বিজয়ের ঝিলিক। ইমতিয়াজ হঠাৎ সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। ওর দেখাদেখি অন্যরাও সেজদায় নত করে মাথা। ওদের প্রথম অভিযানই সফল হয়েছে। এ কারণে ওরা খোদার দরবারে শুকরিয়া জানায়। আজকের বিজয় ওদের সাফল্যের মুকুটের প্রথম পালক।

আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না। পার্শ্ববর্তী ক্যাম্প থেকে এদের সাহায্যে নতুন বাহিনী চলে আসতে পারে। তাড়া দেয় আদনান।

সিদ্ধান্ত হয় শফিকের লাশ পালাক্রমে প্রত্যেকে নিজ নিজ কাঁধে বহন করবে এবং নিকটবর্তী কোনো লোকালয়ে পৌঁছে জানাজার পর তার লাশ দাফন করা হবে। বরফের নিচে থাকতে থাকতে শফিকও বরফ হয়ে গেছে। আদনান ওর শক্ত লাশ কাঁধে তুলতে যাবে, তখন আতিকুল্লাহ একটি বুদ্ধির কথা বলে। যুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অস্ত্রের। আজ যাদের হত্যা করলাম, তাদের অস্ত্রগুলো হতে পারে আমাদের সবচেয়ে বড় সম্বল।

এই কথাটা তুমি আগে বলবে না! আদনান উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। টর্চের আলো ফেলে সতর্কতার সাথে ওরা শত্রুর ঘাঁটিতে পৌঁছায়, যে ঘাঁটি এতক্ষণে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। ওরা বরফের ওপর টকটকে লাল রক্ত এবং রক্তের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের লাশ পড়ে থাকতে দেখে। ইমতিয়াজ ঝটপট লাশ গুনে এসে আদনানকে রিপোর্ট করে— ১৫ জন খতম।

ইশ্! এই খবরটা যদি কোনোভাবে আজাদ কাশ্মীরের রেডিওতে পৌঁছানো যেত! আফসোস ফুটে ওঠে আদনানের কণ্ঠে।

ওরা নিহত সৈন্যদের ভারী ভারী অস্ত্রগুলো পছন্দমতো কবজা করে নেয়। কখনো কাজে লাগতে পারে ভেবে কয়েকটি লাশের অক্ষত ইউনিফর্ম খুলে নেয় শরীর থেকে। উলঙ্গ লাশগুলো বরফচাপা দিয়ে ওরা যাত্রা শুরু করে নিরাপদ গন্তব্যের দিকে। শফিকের লাশ এবং বাড়তি অস্ত্রগুলো ওদের যাত্রাপথকে প্রলম্বিত করে। রাত্রিভর দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে লোকালয়ে পৌঁছাতে ওদের সকাল হয়ে যায়। ততক্ষণে শীতের ঘায়ে প্রত্যেকের বিধ্বস্ত অবস্থা। হাতের তালু বরফের মতো ঠান্ডা। চোখ লাল। নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে। দাঁতের দুপাটি থেকে উৎপন্ন হচ্ছে ঠকঠক শব্দ। ওদের অনুভূতি

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

এমন— এই মুহূর্তে কোনো এক আগুনের গর্তে ঢুকে গেলে যেন প্রশান্তি পাওয়া যেত।

সীমান্তের দুর্গমতা পার হয়ে গ্রামের মেঠো পথে পা রেখে ওরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। এবার নিশ্চয় কোনো বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া যাবে। ক্ষুধা, শীত, নিদ্রাহীনতায় কাবু ওদের শরীর খুব করে কামনা করে পারিবারিক উষ্ণতা ও আপ্যায়ন। তা ছাড়া সঙ্গে রয়েছে এক শহীদের লাশ। শহীদরা মরে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওদের খাবারের ব্যবস্থা হয়। মৃত্যুর পর ওরা জান্নাতের সবুজ পাখি হয়ে উড়ে বেড়ায়। শফিক আল্লাহর মেহমান। জান্নাতি খাবার খেয়ে ওর এখন উড়ে বেড়ানোর কথা। অথচ আদনানদের কাঁধে চড়ে ওকে দুনিয়ার গ্লানি বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

ছেলেটাকে দ্রুত আল্লাহর জিম্মায় সঁপে দেওয়া উচিত। বিড়বিড় করে আদনান। শফিক তখন ইমতিয়াজের কাঁধে ছিল। ইমতিয়াজ কাঁধ বদল করে দ্রুত হাঁটতে থাকে। কিন্তু গন্তব্য যে তখনো অনেক দূরে, তা জানিয়ে দেয় চারপাশের অসীম শূন্যতা। তুষারঢাকা সকালে মানুষের কোনো চিহ্ন নেই। অনাবাদি ফসলের মাঠ ছেয়ে আছে শুভ্র ফুলে। পায়ে চলা সরু পথ একটু পরপর তুষারের পেটে ঢুকে ওদেরকে বিভ্রান্ত করছে বারবার। এত সব প্রতিকূলতার মাঝে হলুদ রঙের লম্বা ইটের ঘর ওদের উত্তেজিত করে তোলে। হলুদ দেয়ালের গায়ে কালো অক্ষরে লেখা : রহমতবাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুপওয়ারা। স্থাপিত ১৯৬৮। সাইনবোর্ড থেকে ওরা দুটো জিনিস উদ্ধার করে। হলুদ দালানটি একটি স্কুলঘর এবং গ্রামের নাম রহমতবাগ।

চলো সবাই। স্কুলের বারান্দায় হয়তো বসার জায়গা পাওয়া যাবে। চাই কি কোনো মানুষও পেয়ে যেতে পারি। নেতাসুলভ ভঙ্গিতে আদেশ করে আদনান।

রাস্তা ছেড়ে ওরা স্কুলের আঙিনায় পা রাখতে গিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ে। এই সময় শিক্ষার্থীদের পদচারণে জায়গাটি মুখর থাকার কথা, অথচ খেলার মাঠ, বারান্দা ও শ্রেণিকক্ষে অদ্ভুত রকমের নীরবতা। দুটি উইলোগাছ পাতাশূন্য ডালে তুষার ধরে বিষণ্ন বদনে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুলটি যে শীতকালীন ছুটির কবলে পড়েছে, অনেক দিন কাশ্মীরি জীবনের স্রোতের বাইরে থাকায় ওরা হুট করে ধরতে পারে না। যখন ধরতে পারে, তখন উপলব্ধি হয়, আস্ত স্কুলটি এখন পুরোটাই তাদের সম্পদ। যেভাবে খুশি, সেভাবে ওরা বিশ্রাম নিতে পারে। ওরা স্কুলের বারান্দার ওপর শফিকের মরদেহ চিত করে শুইয়ে রাখে। দেয়ালের সাথে খাড়া করে রাখে অস্ত্র। কনক্রিটের বারান্দায় ঠেসে বসে ওরা আড়মোড়া ভাঙে, আলস্য দূর করে, কেউ কেউ হাই তোলে। ঘরপালানো এই

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তরুণদের দিকে স্কুলের তুষারাবৃত খেলার মাঠটি উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে। এই উদাসীনতা ফেব্রুয়ারির শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যত দিন না ক্লাস চালু হচ্ছে।

এখানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। বিশ্বস্ত কোনো মানুষের সন্ধান করতে হবে। আশপাশে আর্মির ঘাঁটি আছে কি না, আমরা জানি না। এই গাঁয়ে ভারতীয়দের কোনো গুপ্তচর আছে কি না, তা-ও জানি না। যদি থেকে থাকে, তবে যেকোনো মুহূর্তে আমরা আক্রান্ত হতে পারি। গম্ভীর কণ্ঠে বলে আতিকুল্লাহ।

তা ছাড়া শফিকের মরদেহও দ্রুত দাফন করা দরকার। লাশের সাথে সফর কোনো সুখকর বিষয় নয়। মন্তব্য জুড়ে দেয় ইমতিয়াজ।

জাফরুল্লাহকে সাথে নিয়ে তুমি গাঁয়ের ভেতর যাও, ইমতিয়াজ। অস্ত্র পিরহানের ভেতর লুকিয়ে রাখবে। নিজেদের পরিচয় দেবে মুসাফির বলে। যদিও চেহারা ও বেশভূষা দেখেই বুঝে ফেলার কথা তোমরা কারা। তারপরও শুরুতে পরিচয় দেবে না। আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো এক বিশ্বস্ত ঘরের সন্ধান করে তবেই ফিরবে। এখনই যাও। আর হ্যাঁ, চোখকান খোলা রাখবে।

ওদের পাঠিয়ে দিয়ে আদনান শফিকের পাশে গিয়ে বসে। পথচলার ব্যস্ততায় ও শফিককে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেনি। যদিও যাত্রাপথে ও আদনানের কাঁধেই ছিল অধিক সময়। এখন একটুখানি অবসর পেয়ে ও শফিকের স্মৃতিতে কাতর হয়ে পড়ে। ছেলেটা খুব ছোটবেলায় এসে জুটেছিল আদনানদের বাড়িতে, ভেড়ার রাখাল হিসেবে। একই গ্রামের ছেলে অথচ গরমের দিনগুলোতে ও বাড়িতে যেত না বললেই চলে। গরমের পুরোটা সময় সে থাকত আপাদমস্তক রাখাল হয়ে। শীতকালে যখন ভেড়ার পাল বিক্রি করে দেওয়া হতো, সেই কয়টি মাস ও মায়ের কাছে থাকত। দারিদ্র্য ওকে রাখাল বানিয়েছিল, কিন্তু ও ছিল আদনানের ভাই। ছেলের মৃত্যুর খবর কীভাবে ওর মাকে জানাবে, ভেবে বিপন্ন বোধ করে আদনান! আত্মার অব্যক্ত আর্তনাদ চোখের জল হয়ে ওর গাল ভিজিয়ে দেয়।

একটু পর এক প্রৌঢ়কে নিয়ে স্কুলবারান্দায় আসে ইমতিয়াজ ও জাফরুল্লাহ। ওদের পেছনে উৎসুক একঝাঁক শিশু-কিশোরের মুখ। বাচ্চাগুলোর চোখে অপার বিস্ময় আর সীমাহীন কৌতূহল। ওদের কৌতূহলোদ্দীপক চোখ আদনানদের ওপর নয়, দেয়ালের সাথে খাড়া করে রাখা অস্ত্রের ওপর। একসাথে এত মানুষের উপস্থিতি, হোক ওরা নিতান্ত বাচ্চা ছেলে, দলের সবাইকে উৎকণ্ঠিত করে। বিরক্তি আড়াল করতে পারে না আদনান— এদের কেন এনেছ!

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ওদের আনতে হয়নি। ইকবাল চাচার সাথে ওরা চলে এসেছে।

প্রৌঢ়ের নাম ইকবাল মির। তিনি বিনীত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসেন। আন্তরিক কণ্ঠে বলেন, আপনারা দয়া করে আমাদের বাড়িতে তাশরিফ রাখুন। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় আমার বাড়ি। আপনাদের খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তা ছাড়া লাশেরও দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি দুজনকে বলে এসেছি। এতক্ষণে বোধ হয় কবর খুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে।

আদনানের দেখাদেখি সবাই উঠে দাঁড়ায়। প্রৌঢ়ের হাতে হাত মিলিয়ে উষ্ণতা বিতরণ করে। আদনান বলে, আশা করি আপনি আমাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছেন। এই এলাকায় ভারতীয় সৈন্যদের আনাগোনা কেমন?

এলাকাটা এখন নিরাপদ। বছরখানেক আগে সৈন্যরা একবার অভিযান পরিচালনা করেছিল। আপনাদের মতো যুবকেরা সেবার ট্রেনিং নিয়ে আমাদের গাঁয়ে উঠেছিল। কীভাবে যেন ওদের কাছে খবর পৌঁছে যায়। অতর্কিত আক্রমণ করে ওরা সবাইকে শহীদ করে দেয়। সংখ্যায় তারা ছিল বারোজন। ইকবাল মির খুব ম্রিয়মাণ কণ্ঠে কথা বলেন।

আতিকুল্লাহ ও আদনান গোপনে দৃষ্টি বিনিময় করে। আতিকুল্লাহ প্রৌঢ়ের কাছে জানতে চায়, চাচাজি, ভারতীয়দের সাথে এখানকার কারো আঁতাত আছে বলে সন্দেহ করেন?

কাউকে সন্দেহ করি না।

এখান থেকে নিকটবর্তী আর্মি ক্যাম্পের দূরত্ব কেমন?

দশ-বারো কিলোমিটার হবে।

আমাদের কথা যত কম জানাজানি হবে, ততই ভালো।

গ্রাম তো! গোপন রাখা কঠিন। আপনারা আজাদির সৈনিক। আপনাদের দেখার জন্য সবাই পাগলপারা হয়ে থাকে।

কথার মাঝে হন্তদন্ত ভঙ্গিতে দুজন গ্রামবাসী উপস্থিত হয়। তাদের কাঁধে খাটিয়া। দুজনের গায়েই পিরহান। কানঢাকা টুপি। তাদের বয়স আদনানদের চেয়ে বেশি নয়। ইকবাল মির বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমরা আবার আসতে গেলে কেন! কবর খননের কী অবস্থা?

ইসমাইল আর রফিক কবর খুঁড়ছে। আমরা লাশ নেওয়ার জন্য এলাম। শহীদের লাশ বেশিক্ষণ আটকে রাখা গোনাহ, তাই চলে এলাম। যুবকদ্বয় খাটিয়া রাখতে রাখতে একসঙ্গে উত্তর দেয়। তাদের আন্তরিক উষ্ণতার আভাস কথার প্রতিটি উচ্চারণে টের পাওয়া যায়। তারা অনুমতির তোয়াক্কা না করে লাশ খাটিয়ায় তুলে ফেলে। শিশু-কিশোরেরা এতক্ষণ বিহ্বল হয়ে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

অস্ত্র দেখছিল। গুলিবিদ্ধ লাশের দৃশ্যমানতা ওদের ভেতর চঞ্চলতা তৈরি করে। কেউ দুকদম পেছনে সরে যায়, কেউবা দুকদম এগিয়ে আসে।

যে যুবক খাটিয়ার মাথার দিকে ছিল, সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, ইকবাল চাচা, ওদিকে তো বিরাট হইচই শুরু হয়ে গেছে। শহীদের জানাজায় শরিক হওয়ার জন্য সবাই গোরস্তানে জড়ো হচ্ছে। এমন সুবর্ণ সুযোগ তো সচরাচর আসে না। আর গাঁয়ের মা-চাচিরা গেরিলা দেখার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমি তোমাদের গোপনীয়তা বজায় রাখতে বলেছিলাম।

এমন ঘটনা চাইলেই কি গোপন রাখা যায়! যে দুই ভাই গ্রামের ভেতর গিয়েছিল, তাদের চেহারা দেখেই সবাই বুঝে ফেলেছে। আর ইসমাইলকে কোদাল হাতে গোরস্তানে যেতে দেখে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়েছে। খোদার কসম, আমি কাউকে কিছু জানাইনি।

ঠিক আছে, চলো। আপনারাও আসুন দয়া করে। এই বাচ্চারা, তোমরা বাড়িতে যাও। ইকবাল মির পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় আগে আগে হাঁটতে থাকেন। তারপর চলে শফিকের খাটিয়া। খাটিয়ার পেছনে গেরিলাদল এবং সবার পেছনে শিশু-কিশোরদের দঙ্গল। আদনান আর আতিকুল্লাহ চলার পথে ফিসফিস করে গোপন আলাপ সেরে নেয়। সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। মেশিনগান রাখতে হবে লোড করে। গ্রামে ঢোকার প্রধান রাস্তাটায় পাহারা বসাতে হবে। কেউ গ্রাম থেকে বাইরে যাচ্ছে কি না, তার ওপরও চোখ রাখতে হবে।

লাশ বহনকারী যুবকের কথাই ঠিক। একটু আগে ওরা মানুষের কোলাহলের জন্য হাহাকার করছিল, অথচ এই তুষারঝরা শীতেও রহমতবাগ গোরস্তান পরিণত হয়েছে মানুষের বাজারে। তাদের মধ্যে আছে সব বয়সের মানুষ। তারা সসম্ভ্রমে আদনানদের দিকে তাকায়, সঙ্গীর সাথে ফিসফিস করে। এরই মধ্যে জাফরান, কাঠবাদাম ও এলাচের সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। গেরিলাদের জন্য এক কিশোর কেটলিভরতি গাওয়া নিয়ে এসেছে। তুষারঢাকা দুর্গম পথের দীর্ঘ সফরের পর বড্ড প্রার্থিত ওই সুবাসিত গাওয়া। কিন্তু গোরস্তানে লাশ ও লাশের জানাজা সামনে রেখে গাওয়ার পেয়ালায় চুমুক দেওয়া কতটুকু সংগত হবে, সেই ভাবনা বুকের ভেতর খচখচ করে। ইকবাল মির বলেন, আপনাদের খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। গাওয়া পান করে নিন। চাঙা বোধ করবেন।

কাতার সোজা হতে হতে ওরা গাওয়ার পেয়ালায় ঠোঁট লাগায়। জানাজার আগে উপস্থিত জনতার সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখে আদনান। শফিকের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ওর কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে। সবশেষে ও

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

দোয়া চায় মুসল্লিদের কাছে, বিশেষত শফিক ও কাশ্মীরের আজাদির জন্য। জানাজা পড়ান স্থানীয় মসজিদের ইমাম। শফিককে চিরনিদ্রায় শায়িত করার পর খোদার দরবারে হাত তোলে সবাই। মোনাজাতে এক বিরল দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। অচেনা যুবক শফিক, যার সাথে এই মানুষগুলোর কোনো দিন দেখা হয়নি, ভবিষ্যতেও দেখা হবে না কোনো দিন, সেই অদেখা-অচেনা ছেলেটার জন্য কান্নায় ভেঙে পড়ে তারা। মনে মনে ভাবে আদনান, স্বজাতির মুক্তির জন্য শ্বাপৎসংকুল পথে পা রাখে যে জানবাজ তরুণ, ব্যক্তিক জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডির উর্ধ্বে উঠে যায় সে। সে হয়ে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক, সকলের গর্বের ধন। তার জন্য জল বিসর্জন দেওয়া চোখের অভাব হয় না। শফিকের সৌভাগ্যে মনে মনে ঈর্ষান্বিত হয় আদনান। অস্ফুট স্বরে বলে, শফিক, বিদায় বন্ধু। হয়তো তোমার পদরেখার সাথে মিলিত হবে আমাদের পায়ের ছাপ।

দাফন-কাফন শেষ হয় কিন্তু পাতলা হয় না মানুষের জটলা। সকলেই কথা বলতে চায় যোদ্ধাদের সাথে। তাদের অভিজ্ঞতা শুনতে চায়। তারা কোথা থেকে এল, কোথায় যাবে, শফিক মারা গেল কীভাবে, এ পর্যন্ত তারা কতজন সৈন্যকে হত্যা করেছে, তাদের অস্ত্রগুলো কীভাবে কাজ করে ইত্যাদি। কিন্তু এই সব জিজ্ঞাসা যে যুদ্ধনীতির পরিপন্থী এবং এই সব প্রশ্নের জবাবের মধ্যে যে তাদের বিপদ লুক্কায়িত আছে, গ্রামের সরল মানুষগুলো তা বুঝতে চায় না। শেষে কঠোর হতে হয় ইকবাল মিরকে। সহযোগীদের নিয়ে তিনি সবাইকে সরিয়ে দেন। ভিড় পাতলা হয়ে এলে সারিবদ্ধ কয়েকটি কবরের ওপর চোখ পড়ে আদনানের। অন্যান্য কবরের সমাধিলিপিতে মৃতের নাম-ঠিকানা থাকলেও এই কবরগুলোতে তা নেই। শুধু এক দুই তিন— এভাবে বারোটি কবরে মোট বারোটি সংখ্যা বসানো। আদনান গভীর দৃষ্টিতে কবরগুলোর দিকে তাকায়। সংখ্যার নিচে তাদের মৃত্যুর সন-তারিখ আছে, কিন্তু জন্মতারিখ নেই।

ইকবাল মির বিষণ্ন কণ্ঠে বলেন, ওরা সেই সব যুবক, যারা রহমতবাগে আশ্রয় নিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের আক্রমণে শহীদ হয়েছে। আমরা ওদের নাম-ঠিকানা জানি না, বয়সও জানি না, শুধু জানি ওরা মারা গেছে। ওই এক দুই তিন সংখ্যাই ওদের পরিচয়।

ইকবাল মিরের কথার পরিপ্রেক্ষিতে আদনান কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। খানিক সময় নিয়ে একটু পর সে বলে, একটুকরো কাঠকয়লা দিতে পারবেন?

ওর কথা হুট করে ধরতে পারেন না ইকবাল মির। কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকেন তিনি, তারপর বলেন, ও, কাঠকয়লা! ব্যবস্থা করছি। ব্যবস্থা করছি।

অকল্পনীয় দ্রুততায় এক কিশোরের হাতে কাঠকয়লা চলে আসে গোরস্তানে। আতিকুল্লাহর সাথে ধরাধরি করে আদনান একটি সাদা পাথর

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

শফিকের মাথার কাছে রাখে। তারপর পাথরের গায়ে কাঠকয়লার কালিতে খোদাই করে সমাধিলিপি :

নাম : শফিক গুল।

পিতা : আলতাফ গুল।

গ্রাম : গুরিহাকা, পেহেলগাম।

জন্ম : ১৯৭০।

মৃত্যু : জানুয়ারি ১৯৯২।

বন্ধু, আমাদের আজাদি তোমার নামে উৎসর্গিত হবে।

ষোলো

বাবা-মাকে না জানিয়ে, অনেকটা গোপনে ঘর ছেড়েছিল আদনান। ভেবেছিল, জানলে তারা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আদনানের ধারণা ছিল, বাবা-মার বারণ, অনুরোধ আর চোখের জল উপেক্ষা করতে পারবে না ও। আর তাই ট্রেনিং শেষে কয়েকটি স্পটে যুদ্ধ করে ঘরে ফিরতে একধরনের ভয়, জড়তা আর অপরাধবোধ ওকে নাকাল করে রেখেছিল। না জানি কতটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রচিত হবে তার ঘরে ফেরা উপলক্ষে। কিন্তু বাড়ির চৌহদ্দিতে পা রেখে ওর সকল আশঙ্কা বাতাসে মিলিয়ে গেল। বাবা-মা কীভাবে যেন জেনে গিয়েছিলেন ওর সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার খবর। সময়টা এমন, যখন হাজার হাজার যুবক লাইন অব কন্ট্রোল পাড়ি দিয়ে ট্রেনিং নিতে যাচ্ছে আজাদ কাশ্মীরে। দেশের নামে প্রতিজ্ঞা করে তারা অস্ত্র তুলে নিচ্ছে হাতে। এ সময় কারো যুবক ছেলের ঘর ছাড়া মানেই যুদ্ধে যাওয়া। তারপরও বাবা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওর ক্যাম্পাসে গিয়েছিলেন। সেখানেও ছেলেকে না পেয়ে তিনি সুনিশ্চিত হয়েছিলেন, ছেলে তার যুদ্ধে গেছে।

বিবাহ নামক পবিত্র সম্পর্কের মাধ্যমে অচেনা দুই নারী-পুরুষ যখন এক ছাদের নিচে বসবাস শুরু করে, সহসা মানুষ দুটি পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। প্রতিটি কথা-কাজে-কর্মে তারা একে অন্যের ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, সঙ্গীবিহীন তাদের পথচলা যেন এক চাকার সাইকেল। ভালোবাসা এবং নির্ভরশীলতার এই তীব্র তুমুল অভিঘাতের মাঝে যখন তাদের ভেতর দিয়ে নতুন প্রাণের কলরব জাগে, তখন সেই নতুন প্রাণই হয়ে ওঠে তাদের সকল আরাধ্যের কেন্দ্রবিন্দু। আগে যেখানে তাদের বেঁচে থাকা ছিল

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পরস্পরের জন্য, এখন তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন হয়ে ওঠে সন্তান। আরাধ্য সেই সন্তান পিতৃচ্ছায়া আর মাতৃস্নেহ ছেড়ে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে চলে যাক, যেখানে মৃত্যু প্রতিমুহূর্তে হাতছানি দিয়ে ডাকে, কোনো বাবা-মাই তা কামনা করে না। কিন্তু যুদ্ধ যখন অবিকল্প হয়ে ওঠে, যখন যুদ্ধই নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই বাবা-মাই সন্তানকে ঠেলে দেয় বুলেটের সামনে, আজাদির সূর্য ছিনিয়ে আনতে। আদনান ওর বাবা-মাকে ভুল জেনেছিল। অসীম স্নেহ-মমতা দিয়ে আদনানকে যারা বুকের মধ্যে আগলে রেখেছেন সারাটা জীবন, সেই বুকের এক পাশেই যে দ্রোহের তপ্ত লাভা ধিকধিক করে জ্বলছিল, বেড়ে ওঠার ব্যস্ততায় কোনো দিন তা পরখ করে দেখেনি আদনান। আজ আজাদ কাশ্মীর থেকে ট্রেনিং নিয়ে ঘরে ফিরে সেই তপ্ত লাভার আঁচ খানিকটা অনুভব করতে পারল ও। ঢিলেঢালা সবুজ পিরহান পরে গুরিহাকার কঙ্কর বিছানো পথ ধরে আসছিল ও। তুষারে ঢেকে ছিল ওদের ধানখেত আর স্কুলমাঠ। একটি কুকুর জবুথবু হয়ে বসে ছিল দেবদারুগাছের শিকড়ের খোলে। মোড়ের ফার্মেসির হাতুড়ে ডাক্তার প্রেশার মাপছিল এক নারীর। মজিদ চাচার রুটির দোকানে রুটি সেঁকছিল এক অচেনা কিশোর। দিনের প্রথম ট্যাক্সি পেহেলগামে যাওয়ার জন্য স্টার্ট নেওয়ার চেষ্টা করছিল আর ব্যস্ত হেলপার 'পেহেলগাম পেহেলগাম, ছেড়ে গেল পেহেলগাম' বলে চিৎকার করছিল। দাদাজির ঝাঁপ ফেলা মুদিদোকান অসীম শূন্যতা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একাকী। পথচারী, দোকানি এবং তাদের খদ্দেররা বিস্ময় নিয়ে তাকাচ্ছিল আদনানের বদলে যাওয়া অবয়বের দিকে। ওর অপরিপাট্য চুল, সময় এবং সেলুনের অভাবে অযত্নে বড় হওয়া গোঁফ-দাড়ি আর স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশিই ঢোলা পিরহান লোকদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য ছিল যথেষ্ট। তবে জেকেএলএফ যোদ্ধাদের মতো পিরহানের সবুজ রং এবং কালাশনিকভের কারণে পেটের কাছে পিরহানের ফুলে ওঠা তাদের মস্তিষ্কে বার্তা দিচ্ছিল— অচেনা হলেও এ যুবক যে এক সশস্ত্র যোদ্ধা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অমনি সবার চোখেমুখে ফুটে উঠল মুগ্ধতা এবং সম্ভ্রমবোধ। তারা যোগফল মেলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল— জঙ্গিদের মদদ দেওয়ার অজুহাতে গেল সপ্তায় গুরিহাকার পাঁচটি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে প্যারামিলিটারি। নিশ্চয়ই তারই প্রতিশোধ নিতে অগ্রগামী সৈন্য হিসেবে এসেছে এই যুবক।

ধীরে ধীরে সবাই দোকান ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল। চায়ের দোকানদার প্রৌঢ় জুলফিকার সংকোচ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করল, বেটা, কী তোমার পরিচয়? যাবেই-বা কোথায়?

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আদনান হাত বাড়িয়ে দিল জুলফিকার চাচার দিকে— চাচাজি, কেমন আছেন?

আনন্দে কেঁপে উঠল জুলফিকার চাচার বুক। যে হাতে গ্রেনেড ছোড়ে এই যোদ্ধা, বাঘা বাঘা সৈন্যদের হত্যা করেছে যে হাত, সেই হাত সে বাড়িয়ে দিয়েছে এক সামান্য দোকানদারের দিকে। কী সৌভাগ্য তার! জুলফিকার চাচার চোখমুখ বেয়ে আনন্দ উপচে পড়তে থাকে। উচ্ছ্বাসে চেপে ধরে সে আদনানের হাত। গভীরতর স্পর্শে করমর্দন করতে করতে সে পড়তে থাকে এই যোদ্ধার চেহারার প্রতিটি বাঁক। তারপর দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলে, তোমাকে কেমন চেনা চেনা লাগছে।

এ সময় পেছন থেকে কেউ একজন বলে ওঠে, এই, তুমি আদনান নও? অতঃপর আদনানের জবাবের তোয়াক্কা না করেই সে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে আর চিৎকার করতে থাকে, তোমরা কে কোথায় আছ, ফয়জুল্লাহর বেটা আদনান যোদ্ধা হয়ে ফিরে এসেছে। তার গায়ে জেকেএলএফের ইউনিফর্ম। ইউনিফর্মের নিচে কালাশনিকভ। কেউ দেখতে চাইলে মোড়ের বাজারে চলে এসো।

জুলফিকার চাচা জড়িয়ে ধরে আদনানকে। তার চোখে জল। চোখ মুছতে মুছতে সে বলে, তুমি কত ভালো ছাত্র ছিলে। গুরিহাকা স্কুলে প্রত্যেক ক্লাসে ফার্স্ট হতে। অথচ সেই তোমাকেও বই-খাতা ফেলে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হলো। তারপর চাচা আকাশের দিকে তাকায়। বিড়বিড় করে বলে, খোদা, এই সব ছেলের কোরবানির বদৌলতে হলেও তুমি কাশ্মীরকে আজাদ করো।

এরপর লোক জড়ো হতে আর সময় লাগে না। ছোট্ট গ্রামীণ বাজার মুহূর্তে ভেঙে পড়ে আদনানের গায়ের ওপর। ফয়জুল্লাহ মাস্টারের ছেলে আদনান যোদ্ধা হয়ে ফিরে এসেছে, এই মুহূর্তে এর চেয়ে উত্তেজক খবর আর কিছু নেই। বিব্রত ভাব নিয়ে আদনান চারপাশে তাকায়, মানুষের মুখ দেখে, কিন্তু চেনা মুখগুলোই কেমন অচেনা লাগে। যুদ্ধে যাওয়ার আগে যে মানুষগুলোকে দেখেছিল সুঠাম-সতেজ, যৌবনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, সেই মুখগুলো এখন ক্লান্ত। অচিরেই কারণটা ধরতে পারে ও। যে মানুষগুলোকে ও ইতিপূর্বে চুল-দাড়িতে কলপ করতে দেখেছে, তাদের চুল-দাড়ি এখন সাদা। চুল-দাড়ির এই আকস্মিক শুভ্রতায় সকলকে দেখাচ্ছে বয়স্ক। সবাই একযোগে কেন কলপ পরিত্যাগ করল, ভেবে পায় না আদনান। জুলফিকার চাচাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে— কেন আপনি কলপ করা ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সেই সুযোগ দেয় না সাত-আট বছরের এক ছেলে। ছেলেটি

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আদনানের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, তুমি যদি গেরিলা হও, তবে তোমার কালাশনিকভ কোথায়? এক মাস আগে সদর রাস্তায় আমরা গেরিলাদের একটি দল দেখেছিলাম। তাদের হাতে কালাশনিকভ ছিল। তারা আমাদের কালাশনিকভ ধরতে দিয়েছিল। আরেকটু বড় হয়ে আমিও যুদ্ধে যাব। তখন আমারও অমন কালাশনিকভ থাকবে।

ছেলেটির কথায় হেসে ফেলে আদনান। ওর মায়াময় গালে হাত বুলিয়ে পিরহানের ভেতর থেকে বের করে কালাশনিকভ। এবার ছেলেটি তো বটেই, অন্যরাও বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে ওই ধাতব যন্ত্রের দিকে। আদনান ছেলেটির দিকে বাড়িয়ে ধরে অস্ত্রটি। বলে, গুলি করবে?

ছেলেটি আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে দূর থেকেই কালাশনিকভে হাত ছোঁয়ায়। এ সময় ভিড় ঠেলে ওর বন্ধুরাও ছুটে আসে। তারাও ভয় আর বিস্ময় নিয়ে ছুঁয়ে দেখে নিষিদ্ধ বস্তুটি। প্রথম ছেলে ট্রিগারের দিকে ইশারা করে বন্ধুদের বলে, এখানে চাপ দিতে হয়। দ্বিতীয় ছেলে ব্যারেলের দিকে ইশারা করে বুদ্ধিদীপ্ত গলায় বলে, আর এখান থেকে গুলি বের হয়। আদনান কিছু বলে না। সে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে নতুন প্রজন্মের অস্ত্রবিষয়ক কৌতূহল ও রোমাঞ্চ।

এই বাচ্চারা, তোমরা সরো সরো। একজন বয়স্ক মানুষ খেঁকিয়ে উঠে ওদের তাড়িয়ে দেয়। রুটির দোকানদার মজিদ চাচা বলেন, এত দিন কোথায় ছিলে, আদনান? তুমি কি ট্রেনিং নিয়েছ?

আদনান নীরস গলায় বলে, আপনারা যেভাবে ঘিরে ধরেছেন, ভিড় দেখে আর্মি চলে এলে আমাকে মরতে হবে। আমাকে বাড়ি যেতে দিন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই আদনান পা রেখেছে গুরিহাকায়। তারপরও সে নিরাপত্তার আশঙ্কা দেখিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, কারণ, অল্পবয়সী ছেলেগুলোর সাথে বড়দের দুর্ব্যবহার ওর ভালো লাগেনি। আর তাই ট্রেনিং নিয়েছে কি না, প্রশ্নের জবাবের দিকে না গিয়ে ও বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। তখন হর্ন বাজিয়ে ছুটে আসে সেই ট্যাক্সিটি, পেহেলগামে যাওয়ার জন্য যে ট্যাক্সি একটু আগে যাত্রী ডাকছিল। ড্রাইভার জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলে, ওহে গেরিলা, গাড়িতে ওঠো। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই। তুমি উঠলে আমার গাড়ি ধন্য হবে।

আদনান এবার সত্যি সত্যি বিব্রত হয়। সে ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বলে, আরে না না, ওই তো আমার বাড়ি। হেঁটেই যেতে পারব।

এক অশীতিপর বৃদ্ধ মানবদেয়াল ঠেলে এগিয়ে আসে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ তার দেহ। ঝাপসা হয়ে আসা চোখে সীমাহীন বেদনা ও হতাশার ছায়া।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

সে আদনানের হাতে চুম্বন করে বলে, আমার নাতিটাও যুদ্ধে গিয়েছিল। সে আর ফেরেনি। শুনেছি সীমান্তের এক যুদ্ধে সে শহীদ হয়েছে। গেল সপ্তায় তার ছেলে হয়েছে। আজ রাতে তুমি যদি আমাদের বাড়িতে দাওয়াত নাও, ছেলেটিকে কোলে তুলে আদর করো, বড় খুশি হব। ছেলেটি কোনো দিন বাবার আদর পাবে না। মাথার ওপর নিরাপত্তার ছায়া পাবে না। বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে বৃদ্ধ।

আদনান বৃদ্ধের নুয়ে পড়া মাথা বুকের সাথে চেপে ধরে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আল্লাহ আপনার নাতিকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। তার রক্তের বিনিময়ে ত্বরান্বিত করুন আমাদের আজাদি। শহীদের পরিবারকে সবর করার তৌফিক দান করুন। দাদাজি, কোথায় বাড়ি আপনার?

বাতেকানে। বৃদ্ধ চোখ মুছতে মুছতে বলে।

আমি আপনার দাওয়াত কবুল করলাম।

বৃদ্ধের ধূসর চোখ এবার বসন্তের মতো সজীব হয়ে ওঠে। সে আদনানের হাত মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে, যেভাবে শিশুরা বাবার আঙুলে মুঠোর কামড় বসায়, তারপর বলে, তুমি কী খেতে পছন্দ করো?

দাদাজি, আমি খেতে যাব না। এক শহীদের নাবালেগ সন্তানকে দেখতে যাব। আপনি শুধু দোয়া করবেন, তাতেই আমি তৃপ্ত হব। সকলের সাথে করমর্দন করে আদনান বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়। ধীরে ধীরে ভিড় পাতলা হয়ে আসে। কিন্তু সেই পিচ্চিগুলো, কালাশনিকভ ছুঁয়ে দেখে যারা উৎফুল্ল হয়েছিল, তারা পিছু ছাড়ে না আদনানের। ওরাও আদনানের সাথে সাথে ওর বাড়ির দিকে যেতে থাকে। ওদের মধ্যে যাকে সবচেয়ে চতুর ও সাহসী মনে হয়, সে বলে, তোমার সাথে যুদ্ধে নেবে?

আদনান ওর নরম গাল টিপে দিয়ে বলে, নেব, তবে তার আগে তোমাকে যে আরো বড় হতে হবে!

ছোট হলেও আমাদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ আছে। আমরা পারব।

তোমরা ট্রেনিং নিয়েছ? আদনান সত্যি সত্যি অবাক হয় ওদের কথায়।

হ্যাঁ। আমরা ট্রেনিং নিয়েছি। আমাদের ক্রিকেট ব্যাট ছিল। সেই ব্যাটগুলো কেটে আমরা বন্দুক বানিয়েছি। আগে ক্রিকেট খেলতাম, এখন এই ব্যাটের বন্দুক দিয়ে আমরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলি।

আদনান থমকে দাঁড়ায়। এক শতাব্দীর পুরোনো বিস্ময় ওকে আচ্ছন্ন করে আষ্টেপৃষ্ঠে। এ কোন নিয়তি নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে এই শিশুগুলো! যুদ্ধ যাদের খেলাধুলার অধিকার কেড়ে নেয়, তাদের চেয়ে অভাগা শিশু আর কারা হতে পারে! হতবুদ্ধি ভাব কেটে গেলে বাচ্চাগুলোর দিকে বড় মায়া নিয়ে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তাকিয়ে থাকে আদনান। কখন যে ওর চোখ ছলছল করে ওঠে, বুঝতেও পারে না। ও হাঁটু মুড়ে বসে সবগুলো শিশুকে বাহুর মধ্যে টেনে নেয়। কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বলে, যে মাটি তোমাদের মতো স্বাধীনচেতা সন্তান জন্ম দিতে পারে, সে মাটি কখনো পরাধীন থাকতে পারে না।

বাড়ির সামনের হালটে ঔৎসুক্য নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অনেক মানুষ। তাদের মধ্যে আদনানের বাবা-মার ব্যাকুল মুখও দেখা যাচ্ছিল। তার মানে ওর আগমনী সংবাদ ওর আগেই পৌঁছে গেছে বাড়িতে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই উপস্থিত জনতা, নারী কিংবা পুরুষ, সকলে স্লোগান দিতে শুরু করে। তারা অভিবাদন জানায় আদনানকে— মোবারক হো, আদনান। খুবই খুশির খবর যে তুমি অক্ষত শরীরে আমাদের মাঝে ফিরে এসেছ। আমাদের নবীজি তোমার সঙ্গে আছেন। আমরা সব সময় তোমার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেছি। খোশ আমদেদ। মারহাবা। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এক জানবাজ মুজাহিদকে পেয়েছি।

নাজনীন দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরেন সন্তানকে। পুত্রের সারা শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, কেমন আছিস, বেটা? সুস্থ আছিস তো! কত দিন পর তোকে দেখলাম! এভাবে কেউ না বলে যুদ্ধে চলে যায়!

বাইরের মানুষের সামনে মায়ের আদরের প্রাবল্য বিব্রত করে আদনানকে। শৈশবে প্রায়ই ও মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাত। মায়ের গায়ের গন্ধে মাতাল করা ঘুম নামত ওর চোখে। তারপর তো ও বড় হয়ে গেল। বড় হয়ে যাওয়া মানেই শৈশবের পবিত্রতা হারিয়ে ফেলা। বড় হয়ে যাওয়া মানেই বাবা-মার স্নেহের চৌহদ্দি থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া। ছোটবেলায় সন্তানের সাথে বাবা-মার ভালোবাসার সম্পর্কে থাকে দৃশ্যমানতা এবং অদৃশ্যমানতার ঘনঘটা। এরপর সন্তান যত বড় হয়, ভালোবাসার দৃশ্যমান অক্ষরগুলো মুছতে থাকে। একপর্যায়ে জেগে থাকে শুধুই নির্লিপ্ততা। সেই নির্লিপ্ত জীবনে আদনান বহুকাল মায়ের শরীরের গন্ধ পায়নি। এতকাল পর মায়ের গায়ের গন্ধ ওর কাছে মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খুশবু। বিব্রত ভাব সত্ত্বেও ও কতক্ষণ মায়ের কাঁধে নাক ডুবিয়ে থাকে। কত দিন পর ও মাকে এভাবে জড়িয়ে ধরল, মনে করতে পারে না। আজ যখন জড়িয়ে ধরার ফুরসত এল, আদনানের কোমরে তখন মেশিনগান। ধাতব যন্ত্রটি ক্রমাগত মায়ের পেটে ঠোকর মারছে। মা কি বুঝতে পারছেন, তার সন্তান এক ভয়ংকর মারণাস্ত্র নিয়ে ঘরে ফিরেছে?

ফয়জুল্লাহ এগিয়ে আসেন। আদনান পূর্ণ চোখে তার জীবিত আইডল বাবার মুখের দিকে তাকায়। বাজারের মুখগুলো থেকে বাবার মুখকে সে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আলাদা করতে পারে না। বাবার ক্লিনশেভ মুখে কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি, ক্রমবর্ধনশীল। তার মুখটাও কেমন বুড়িয়ে যাওয়া উপক্রম। কৌতূহল এবার আর দমিয়ে রাখতে পারে না আদনান। ও কুশল বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করে, দাড়ি কেন রেখেছেন, আব্বুজি? আর বাজারের লোকদের দেখলাম, তারাও কলপ করা ছেড়ে দিয়েছে।

জবাবে যা বলেন বাবা, তা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় আদনান। প্যালামিলিটারি বাহিনী তরুণ-যুবকদের দেখলেই সন্দেহ করে, ধরে নিয়ে যায়। সৈন্যদের সন্দেহ থেকে বাঁচতে সবাই বৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে।

উপত্যকাবাসীর দুর্ভাগ্যের নতুন আরেক অধ্যায় উন্মোচিত হয় আদনানের সামনে। কতটা নিপীড়িত হলে একটা জাতি বৃদ্ধ হওয়ার প্রতিযোগিতায় নামে। আদনান চোখের কোনা মোছে। ফয়জুল্লাহ ছেলের হাত ধরে স্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, ও ক্লান্ত। ওকে ঘরে যেতে দাও, নাজনীন। পড়শিরা ওকে দেখার এবং কথা বলার জন্য বেকারার হয়ে আছে।

রাজকীয় মর্যাদায় দুপাশ থেকে প্রহরা দিয়ে ছেলেকে বাড়ির দিকে নিয়ে যান বাবা-মা। পেছন পেছন আসতে থাকে পাড়ার যত ছেলে-বুড়ো সবাই। তাদের মধ্যে দেখা যায় অনেক অচেনা মুখও। নিজের ঘরের বদলে আদনানের গন্তব্য যখন নির্ধারিত হতে দেখে মেহমানখানা, আদনানের বিস্ময় আরো বেড়ে যায়। ট্রেনিং থেকে ও কি তবে সন্তানের বদলে মেহমান হিসেবে ঘরে ফিরছে! ঘরের বদলে মেহমানখানায় নিয়ে যাওয়ার মানে কী! ধবধবে সাদা চাদর বিছানো মেহমানখানার ঠিক মাঝখানে মখমলের কুশন দিয়ে উঁচু করে বানানো হয়েছে এক আসন। এমন আসনে কেবল কাশ্মীরি বরদেরই বসতে দেওয়া হয়। নূরজাহানের বিয়েতেও তৈরি করা হয়েছিল এমন আসন এবং নূরজাহানের বরকে বসতে দেওয়া হয়েছিল সেই আসনে। ফয়জুল্লাহ ছেলেকে টানতে টানতে রাজকীয় সেই আসনের কাছে নিয়ে যান এবং হাত ধরে বসান। ফয়জুল্লাহর চোখেমুখে আজ গর্বের যে দ্যুতি, আদনান বাবার ওই মুখ আগে কখনো দেখেনি। আসন গ্রহণের পরপরই মেহমানখানার দরজায় জুতা-স্যান্ডেলের পাহাড় রচিত হয়। আদনানের একবার মনে হয়, ওদের এই মেহমানখানা আজ রমজান মাসের ইশার ওয়াক্তের মসজিদে পরিণত হয়েছে এবং তারাবিহ শেষে ফেরার পথে অনেকের জুতা অদলবদল হয়ে যাবে। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ফয়জুল্লাহ মেহমানখানার চারপাশে দেয়াল ঘেঁষে কার্পেটের ওপর সবাইকে বসিয়ে দেন। কিন্তু ভিড়ের আতিশয্যে স্থানসংকুলান হয় না সবার। তখনো কারো কারো কৌতূহলী মুখ উঁকি মারে দরজায়। ইতিউতি তাকিয়ে তারা ভেতরে প্রবেশের ফাঁকফোকর খোঁজে। আর আদনান

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বিব্রত মুখ নিয়ে বসে থাকে সকলের আগ্রহ ও কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে। বাড়িতে এমন কাণ্ড ঘটবে জানলে আসার আগে ও নিশ্চয় দশবার ভাবত।

গাওয়া, হরিষা, কেক, ফিরনি এবং কয়েক পদের ফল নিয়ে মেহমানখানায় হাজির হন নাজনীন। আদনানকে এবার প্রতিবাদ করতেই হয়— আম্মুজি, আমি এ বাড়ির ছেলে। অপরিচিত কোনো মেহমান নই।

কিন্তু আদনানের বাক্যযুগল মায়ের কানে পশেছে বলে মনে হয় না। সন্তানের মুখের কাছে ফিরনির চামচ বাড়িয়ে ধরে তিনি আকুতি নিয়ে বলেন, খাও বেটা। তোমার মুখটা বড় শুকনো।

ক্ষুধা ছিল। মায়ের হাতে পরিবেশিত সুস্বাদু খাবার সেই ক্ষুধাকে করেছিল দ্বিগুণ। কিন্তু সবার সামনে খেতে ও ইতস্তত বোধ করে। খাওয়া, সে তো একান্ত ঘরোয়া কর্মবৃত্তি। চেনা-অচেনা অসংখ্য মানুষের উদগ্র চোখের সামনে ও একলা কীভাবে খাবার খায়! এ সময় ফয়জুল্লাহ সকলের হাতে হাতে গাওয়ার কাপ পরিবেশন করলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে আদনান। খাবারে সঙ্গী জুটলে সেখানে আর কোনো সংকোচ থাকে না। নিষ্ফল বাক্যব্যয় না করে আদনান তাই মায়ের হাতের খাবার মুখে পুরতে শুরু করে। অন্যরা গাওয়ায় ঠোঁট লাগাতে লাগাতে খুব আগ্রহ নিয়ে দেখে তাদের পরিচিত ছেলেটির পরিতৃপ্ত আহার, যে ছেলেটি রাতারাতি দুম করে যোদ্ধা হয়ে গেছে।

আদনান কি সত্যিই যোদ্ধা হতে পেরেছে? জিজ্ঞাসার এই চিহ্ন প্রায়ই মুখের সামনে ঝুলে থাকে আদনানের। আজাদ কাশ্মীর থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে ও শ্রীনগর আনোয়ার ভাইয়ের কাছে ছিল কিছুদিন। আনোয়ার ভাই ওকে নিয়ে গিয়েছিল জেকেএলএফের অন্যতম নেতা ইয়াসিন মালিকের কাছে। ইয়াসিন মালিকের সাক্ষাৎ সব সময়ই কাঙ্ক্ষিত ছিল আদনানের কাছে। অভিজ্ঞ মানুষটির কয়েক মুহূর্তের সান্নিধ্য ওকে তুমুলভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এরপর তো ইয়াসিন মালিকের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় কয়েকটি স্পটে গেরিলা হামলার সহযোগী হয়েছে ও। ইয়াসিন মালিকের জন্য মনে মনে দোয়া করে আদনান— আল্লাহ যেন উপত্যকার ওপর এই মানুষটার ছায়া দীর্ঘ করেন।

যোদ্ধা হতে চাওয়া সেই পিচ্চিগুলো এগিয়ে আসে আদনানের কাছে। কেন আসে? ফিরনির লোভনীয় সুবাস কি ওদের লালায়িত করছে! ও শিশুগুলোর সামনে ফিরনির বাটি এগিয়ে দিলে ওরা না না করে ওঠে। যেন ওরা হঠাৎ বড় হয়ে গেছে, এমন ভঙ্গিতে হড়বড় করে বলে, তুমি আরাম করে খাও আর লোকদের সময় দাও। আমরা বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছি। আর্মির গাড়ি দেখামাত্রই তোমাকে খবর দেব। ফিরনির চেয়ে তোমার নিরাপত্তা

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বলেই ওরা ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে যায়। শিশুগুলো স্তম্ভিত করে দেয় আদনানকে। হতবুদ্ধির মতো কতক্ষণ ও হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ওদের বলিষ্ঠ প্রস্থানের দিকে। যুদ্ধ এই শিশুগুলোকে যে বড় বানিয়ে দিয়েছে অথচ আদনান তাদের নেহাতই বাচ্চা ভেবেছিল, সেই লজ্জায় আদনান কুঁকড়ে যায়। আনন্দ-বেদনার যুগপৎ প্রাবল্যে সবার অলক্ষ্যে ওর চোখ ভিজে ওঠে। ও বিড়বিড় করে বলে, গুরিহাকায় তোমরাই আমার গুপ্তচর, আমার সহকারী গেরিলাযোদ্ধা।

খাওয়া শেষ হলে অপরিচিত এক প্রৌঢ় এগিয়ে আসেন— তার ছেলে জাফর, সীমান্তের ওপারে গিয়েছিল ট্রেনিং নিতে, জাফরের সঙ্গে আদনানের দেখা হয়েছে কি না জানতে চান তিনি। আদনান স্মৃতি হাতড়াতে থাকে। জাফর নামের কোনো উজ্জ্বল মুখ মনে আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই নামের কোনো যুবকের সাথে ওর দেখা হয়নি।

আপনার ছেলে হয়তো কোনো রণাঙ্গনে যুদ্ধরত আছে। আশা করি শিগগিরই আপনাদের সাথে যোগাযোগ করার মতো অবসর তার হবে। ধৈর্যের সাথে আপনি বাড়িতে অপেক্ষা করুন। আদনান লোকটাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় ভিড়ের ভেতর থেকে শফিকের মাকে বেরিয়ে আসতে দেখে বুক হিম হয়ে যায় আদনানের। গুরিহাকায় পা রাখবার পর থেকে এই একটা ভয়ই ওকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। তরতাজা সন্তান শহীদ হওয়ার সংবাদ একজন মাকে সে কীভাবে পরিবেশন করবে! এর চেয়ে ভারী, বেদনাদায়ক কোনো সংবাদ কি আছে পৃথিবীতে! হায় শফিক, তুমি যদি না মরতে অথবা তোমার সাথে যদি দেখা না হতো কিংবা তোমার মৃত্যুসংবাদ বহনের ভার যদি আমার কাঁধে না পড়ত!

শফিকের মাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায় আদনান। তার সন্তান একদা আদনানদের বাড়ির রাখাল ছিল, সেই পরিচয় এখন গৌণ। এখন তিনি শহীদজননী— এটাই তার মুখ্য পরিচয়। শফিকের মা জড়িয়ে ধরেন আদনানকে— বেটা, আমার শফিকের কোনো সংবাদ আছে তোমার কাছে?

আদনান নিশ্চল বৃক্ষ হয়ে যায়। সহস্রাব্দের পুরোনো পর্বতের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে ও। সময় গড়ায় আর আশঙ্কা বাড়তে থাকে শফিকের মায়ের। তিনি আদনানের কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, তুমি ভয় পেয়ো না, বেটা। যেদিন বুঝেছি বেটা আমার যুদ্ধে গেছে, সেদিন থেকেই সব ধরনের সংবাদ শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আদনান মাথা নিচু করে সিক্ত গলায় বলে, সীমান্তের এক যুদ্ধে শহীদ হয়েছে শফিক। আমি নিজ হাতে ওকে দাফন করেছি। কত যে সৌভাগ্যবান আপনার শফিক, ওর জন্য শত শত অচেনা মানুষ চোখের জল ফেলেছে। শহীদের গোরস্তানের সেই জান্নাতি দৃশ্য এখনো আমার চোখে ভাসে। আদনানের আর্দ্র কণ্ঠ অথচ অদ্ভুত শক্ত নারী শফিকের মা। যতটা প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা করেছিল আদনান, তার কিছুই প্রতিফলিত হয় না সদ্য সন্তানহারা এই মায়ের ভেতর থেকে। শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বিড়বিড় করেন— খোদা, শফিককে আমি তোমার জন্য উৎসর্গ করেছিলাম। ওকে তুমি কবুল করেছ, আমি শহীদের জননী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছি, এ জীবনে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।

শফিকের মায়ের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে চোখ মোছে আদনান। এ সময় রায়হানের সাথে দেখা হয়ে যায় ওর। যদিও একে ঠিক দেখা হওয়া বলে না। দূর থেকে পরস্পরের চেহারা দেখা। রায়হান কোথাও বেরোচ্ছিল। যাওয়ার আগে হট্টগোল দেখে মেহমানখানায় উঁকি মেরেছে। আদনানকে ঘিরে জনতার ভালোবাসার জোয়ার দেখে তার ভ্রু কুঁচকে যায়। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে সে বেরিয়ে যায় বাইরে। আদনান ভাইয়ের দিকে হাত উঁচিয়ে একটা হাসিমুখ উপহার দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই সে অদৃশ্য হয়ে যায়। আদনান একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

আদনানের উদ্যোগে ওদের ঈদগাহ মাঠে শফিকের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের সকল পুরুষ ভেঙে পড়ে ঈদগাহ মাঠে। শূন্য খাটিয়া সামনে রেখে ইমাম সাহেব বড় দরদ দিয়ে শফিকের জানাজার নামাজ পড়ান। মেয়েরা মাঠের শেষ প্রান্তে কাঠবাদামগাছের নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। জানাজা শেষ হতেই তারা স্লোগান দিতে শুরু করে— শফিকের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না। নারীদের মিছিলটি ঈদগাহ মাঠের চারপাশ প্রদক্ষিণ করে। মিম্বরের সিঁড়িতে বসে আদনান অপলক চোখে কাশ্মীরি বোনদের যুদ্ধংদেহী মুখাবয়ব দেখে। তাদের শক্ত চোয়াল, উত্থিত মুষ্টি আর বজ্রকণ্ঠের স্লোগানে রক্তে নাচন ওঠে আদনানের। মারিয়াম এবং নূরজাহানের কথা মনে পড়ে ওর। ওরা থাকলে আজকের মিছিলটি পূর্ণতা পেত। ওরাও যে এই গাঁয়েরই সন্তান!

ধীরে ধীরে মিইয়ে আসে মিছিলের উত্তাপ। নারী-পুরুষ সকলে যে যার কাজে ফিরে যায়। আদনান তখনো বসেই থাকে ঈদগাহর মিম্বরের ওপর, একা। প্রত্যেক ঈদের আগে দাদাজানের সাথে ঈদগাহ মাঠ পরিষ্কার করতে আসত আদনান। শেষবার ওর সঙ্গী হয়েছিল মারিয়ামও। কতটা রঙিন ছিল

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

সেই দিনগুলো! আদনান মাঠের বেয়াড়া ঘাসগুলো কাঁচি দিয়ে কাটছিল আর মারিয়াম ঝুড়ি ভরে সেই উচ্ছিষ্ট ঘাস মাঠের বাইরে ফেলছিল। সবুজ ঘাসের পটভূমিকায় গোলাপি পিরহানে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে ছুটতে থাকা মারিয়ামকে মনে হচ্ছিল অপ্সরী। সেই মারিয়াম আজ নিরুদ্দেশ। দাদাজি মৃত। যদিও ঈদগাহ মাঠটা আগের মতোই আছে, তবে সেই ঈদ আর নেই। বছর ঘুরে যা আসে, তা ঈদ নয়, ঈদের তারিখ। এখন ঈদ মানেই ঘরে ঘরে কান্নার মাতম। এমন কোনো ঘর নেই, যে ঘরের কোনো যুবক অথবা কিশোর নিহত কিংবা নিখোঁজ হয়নি। প্রতিটি ঈদ তাই প্রিয়জনের শূন্যতা তীব্রভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই তো কাশ্মীরে ঈদ এখন বেদনার প্রতিশব্দ। আদনান ওঠে। সবুজ ঘাসে পা ডুবিয়ে ও কতক্ষণ ইতস্তত হাঁটে। এই ঈদগাহ মাঠের পরতে পরতে ও শৈশবের গন্ধ খুঁজে পায়। হঠাৎ মেহরাবের পেছন থেকে মলিন পোশাকের এক তরুণীকে বের হয়ে আসতে দেখে ও চমকে ওঠে। সহসা ওর হাত চলে যায় পিরহানের নিচে, কালাশনিকভের বাঁটে। যখন দেখে, এ এক নিরীহ তরুণী ছাড়া কিছু নয়, যার হিজাবে ঢাকা মুখে এক শতাব্দীর বিষণ্নতার ছায়া, তখন লজ্জিত ভঙ্গিতে হাতটাকে সরিয়ে নেয় ও। তরুণীটি ছোট ছোট পদক্ষেপে যত এগিয়ে আসে, তার বিষণ্ন মুখখানা ততই পরিচিত হয়ে ওঠে। আদনান কোথায় যেন দেখেছে এই মুখ।

মেয়েটি আদনানের সামনে এসে উইলোগাছের মতো মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। তারপর অনুচ্চ স্বরে বলে, আমি আতিকা। অনেক বছর আগে আপনার সাথে একবার কথা হয়েছিল।

স্মৃতি হাতড়ায় আদনান। মেয়েটির চেহারার সূত্র ধরে ও ফিরে যায় কৈশোরে, মুমূর্ষু দাদির আপেল খাওয়ার আহ্লাদ পূরণে একবার দুটি মেয়ে এসেছিল ওদের আপেলবাগানে, সেই মেয়ে দুটির মধ্যে এই মেয়েটিও ছিল— একটু একটু মনে পড়ে আদনানের।

কী নাম যেন বললে?

আতিকা।

গ্রাম?

বাতেকান।

এই সেই মেয়ে, যার দাদির জন্য আপেল দিতে গেলে রায়হান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরের দিন আপেল নিয়ে বন্ধুদের সাথে ওদের গ্রামে গিয়েছিল আদনান, ততক্ষণে ওর দাদি ইহজীবনের সফর শেষ করেছেন। দাদিকে নয়, দাদির জানাজা পেয়েছিল ওরা।

শফিক সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

শফিক সম্পর্কে! শফিক তোমার পরিচিত? বিস্ময় ঝরে পড়ে আদনানের কণ্ঠে।

শফিকের সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আগামী শরতে বিয়ে হবে, এমন কথাবার্তা চলছিল। শুনেছি আপনারা একই ক্যাম্পে ট্রেনিং নিয়েছেন। মৃত্যুর সময় আপনি কি ওর পাশে ছিলেন?

আবার সেই কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি আদনান। শহীদের মায়ের কাছ থেকে পলায়ন করে এসে এখন শহীদের হবু স্ত্রীর মুখোমুখি ও। এই বেদনার ভার কেন যে ওকে বইতে দিলেন খোদা!

আমরা শুধু ট্রেনিংয়ের সাথি ছিলাম না, ছোটবেলায় আমরা খেলাধুলারও সাথি ছিলাম। ও একসময় আমাদের বাড়ির রাখাল ছিল বটে, কিন্তু আল্লাহ জানেন, আমার হৃদয়ে ওর স্থান ছিল ভাইয়েরও চেয়েও উঁচুতে।

ও আপনার কথা প্রায়ই বলত।

ও আমাদের অগ্রগামী সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হায়, মৃত্যুর সময় আমি যদি ওর পাশে থাকতাম! অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে সজল চোখ আড়াল করে আদনান। এরপর শফিকের মৃত্যু এবং ওর লাশ খুঁজে পাওয়ার ঘটনা আতিকাকে জানায় সে।

কয়টা গুলি লেগেছিল? আতিকার জিজ্ঞাসা আর্তনাদের মতো শোনায়। ওর দুচোখ বেয়ে দরদর করে জল গড়াতে থাকে।

দুটো। কিন্তু ওর চেহারা এমন প্রশান্ত ছিল, যেন ও জান্নাতের সবুজ গালিচায় ঘুমাচ্ছে। মুখটা হাসি হাসি।

বিয়ের আগেই আমি বিধবা হয়ে গেলাম! হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে আতিকা। আহাজারি করতে করতে ও ধপাস করে বসে পড়ে মাটিতে। তারপর মাটির দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে। বিপাকে পড়ে আদনান। এই নির্জন প্রান্তরে হবু স্বামীর নিহত হওয়ার সংবাদে ভেঙে পড়া এক তরুণীকে ও কীভাবে সামলাবে! একবার মনে হয় হাত ধরে ওকে তোলে। পরক্ষণে বিপরীত লিঙ্গসৃষ্ট দ্বিধা ওকে অসাড় করে দেয়। উপায়ান্তর না দেখে মেয়েটিকে ও নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়। মেয়েটি পিঠ ফুলিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর আদনান ওর সামনে পায়চারি করে। দূরে, আকাশপানে কালো ধোঁয়া উড়তে দেখা যায় হঠাৎ। বুক কেঁপে ওঠে আদনানের। কোথাও কি আর্মি নেমেছে? কোনো গেরিলার ঘর কি পুড়ছে ওই লেলিহান অগ্নিশিখায়! ওর ইচ্ছা করে ঘটনাস্থলে ছুটে যেতে, ব্রাশফায়ার করে সবগুলোকে যমের খাবার বানিয়ে দিতে। কিন্তু পরামর্শ ও পরিকল্পনা ছাড়া একাকী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপর বিধিনিষেধ আছে কেন্দ্র থেকে। তাই চেয়ে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

চেয়ে দেখা ছাড়া করণীয় কিছু থাকে না। একটু পর নিজেকে সামলে নেয় আতিকা। ওড়নায় চোখ মুছে কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে ও উঠে দাঁড়ায়। লজ্জিত কণ্ঠে বলে, বেসামাল আচরণের জন্য আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করবেন।

তোমার হৃদয়ে শোকের যে উত্তপ্ত বাতাস বইছে, এই শোক প্রতিটি কাশ্মীরির হৃদয়ে হৃদয়ে। তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কোনো বাক্য আমার আয়ত্তে নেই। শুধু এটুকু বলি, আমাদের এ জীবন আজাদির জন্য উৎসর্গিত। প্রিয়জনের জীবন, রক্ত আর বোনের সম্ভ্রমের ওপর যদি নতুন প্রজন্মের নিরাপদ আবাস গড়ে ওঠে, তবে আমাদের সকল কোরবানি সার্থক হবে। তোমাকে যখন এসব বলছি, তখনো হয়তো কোনো এক মজলুমের ঘর পুড়ছে। আকাশপানে উড়তে থাকা ওই কালো ধোঁয়া তার সাক্ষী। ত্যাগের নিয়তি নিয়ে যারা ভূপৃষ্ঠে চোখ মেলে, এই পৃথিবী তাদের থেকে শুধু কোরবানি নিতেই পছন্দ করে। এবার বাড়ি যাও, বোন। শফিকের রক্ত যেন বৃথা না যায়, সেই দোয়া করো।

সূর্যাস্তের মতো ধীরে, পাহাড়ের মতো অবিচলতা নিয়ে ঘরে ফিরে যায় আতিকা। মেয়েটির পাশে শফিকের অস্তিত্ব কল্পনা করতেই বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে বেদনা। একটি যুদ্ধ স্বপ্নের কত সংসার অঙ্কুরেই নষ্ট করে দিচ্ছে। আতিকার জন্য মন খারাপ হয় আদনানের। নিয়তি ওদের দুজনকে একই বেদনার চোরাবালিতে নিক্ষেপ করেছে। আতিকার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে শফিক আর আদনানের মারিয়াম। হঠাৎ বৃষ্টি নামে। বৃষ্টিবিধৌত ঝাপসা প্রান্তর থেকে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায় আতিকা। কিন্তু আদনান তখনো জানে না, দ্বিগুণ বিস্ময় রচনা করে এক সপ্তাহের ব্যবধানে মেয়েটি আবার ফিরে আসবে গুরিহাকায়, আদনানের কাছে।

সতেরো

সেদিন বিকেলে গুরিহাকা, বাতেকানসহ আশপাশের কয়েক গ্রামের তরুণ-যুবকেরা দেখা করতে আসে আদনানের সাথে। তাদের একটাই চাওয়া—আদনান যেন প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের যোদ্ধা বানিয়ে তোলে। প্রশিক্ষিত হয়ে তারা আদনানের সহযোদ্ধা হতে চায়।

আদনান ভেবেছিল, বাবা-মার সাথে দেখা করে সেদিনই শ্রীনগরে ফিরে যাবে। যুক্ত হবে জেকেএলএফ পরিচালিত রণাঙ্গনে। কিন্তু এই ছেলেগুলোর চোখেমুখে বারুদের এমন ফুলকি, প্রতিশোধের এমন আগুন, আদনান না

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

করতে পারল না। ও কথা দিল, আগামী সপ্তাহ থেকে ও আগ্রহীদের প্রশিক্ষণ দেবে। এ কয় দিনে তারা যেন গুছিয়ে নেয় আর এর মাঝে ও শ্রীনগর থেকে ঘুরে আসতে পারে। সকলকে উদ্বুদ্ধ করে সেদিনই আদনান ফিরে গেল শ্রীনগর। উর্ধ্বতন কমান্ডারের সাথে পরামর্শ করে বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র এবং আতিকুল্লাহ ও ইমতিয়াজকে সাথে নিয়ে ফিরে এল পাঁচ দিন পর। প্রশিক্ষণের জায়গা ওদের আপেলবাগান নির্ধারিত হলো। বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখল অজিতদের পরিত্যক্ত ঘরে। অজিতরা উপত্যকা ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে বাবার কাছে বাড়ির চাবি রেখে গেছে। বাবা চাবির মতো ওদের বাড়িটাকেও আগলে রেখেছেন। এমন দিন নেই, যেদিন তিনি বাড়ির সামনে দুবার চক্কর দেন না। তিনি আশায় আছেন, খুব শিগগির তার এই হিন্দু প্রতিবেশী ফিরে আসবে নিজের বাড়ি। শৈশব থেকে একত্রে বড় হওয়া বন্ধুর কাছে অক্ষত বাড়িটা ফিরিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় দিন গুজরান করছেন তিনি। আদনান বাবার কাছ থেকে অজিতদের বাড়ির চাবি নিজের কাছে নিয়ে রাখল। যত দিন আদনান বাড়িতে আছে, বাড়িটা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার।

প্রশিক্ষণের প্রথম দিনেই একঝাঁক যুবকের সাথে হাজির হলো আতিকা, সে-ও নেবে অস্ত্রের ট্রেনিং। যে পথে জীবন উৎসর্গ করেছে তার বাগ্‌দত্তা, সেই একই পথে জীবন বিলাতে চায় সে-ও। আতিকার ইস্পাতকঠিন মুখ ও মুখের প্রতিজ্ঞা স্তম্ভিত করে দিল আদনানকে। যুদ্ধ ওদের জীবন থেকে অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধটা না এলে এ জাতির কলিজায় সুপ্ত থাকা বারুদের সন্ধান কোনো দিন পেত না ও।

আপেলবাগানে ট্রেনিং শুরু হলো শনিবার থেকে। কিন্তু এই ট্রেনিং যে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হবে না, অনুমেয়ই ছিল। নিকটবর্তী প্যারামিলিটারি ক্যাম্পে খবর চলে যাবে, তারা আক্রমণ করবে, তাদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে, তারপরও দেড় মাসের পরিকল্পনা তৈরি করে আগ্রহীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করল আদনান। প্রশিক্ষক হিসেবে আতিকুল্লাহ ও ইমতিয়াজের সাথে রইল সে নিজে। ট্রেনিংয়ের সময়টাতে গ্রামে ঢোকার রাস্তায় একদল যুবক কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পাহারা দিতে লাগল। মিলিটারি, প্যারামিলিটারি, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স কিংবা বিএসএফের আনাগোনা দেখলেই তারা খবর পৌঁছে দেবে আদনানদের কাছে, এ-ই তাদের দায়িত্ব।

সে মাসের মাঝামাঝি এক ভোরে ক্র্যাকডাউন পড়ল গুরিহাকায়। মসজিদে তখন ফজরের নামাজ চলছে। অধিকাংশ নারী নামাজ শেষে জায়নামাজে বসে কোরআন তিলাওয়াত করছে। ভোরের নতুন আলোর উচ্ছলতায় ছবির মতো ফুটে ওঠার অপেক্ষায় দূরের নৈসর্গিক পর্বতরাজি।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

শিশনাগ খালের পানি চিরায়ত সেই কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে বিরামহীন। এমনই এক মনোরম সময়ে প্যারামিলিটারির দুই জোড়া জিপ চাকায় কর্কশ শব্দ তুলে থেমে গেল আদনানদের ঈদগাহ মাঠে। চারজন সৈন্য ঝটপট ছুটে গেল মসজিদে। ইমাম সাহেব তখন মাত্রই বাঁ দিকে সালাম ফিরিয়েছেন। তখনো মোনাজাত বাকি। তার আগেই ইমাম সাহেবের মাথা বরাবর উঠে এল বন্দুকের নল। মাইকে ঘোষণা দাও— গ্রামের সকল পুরুষ যেন এক্ষুনি ঈদগাহ মাঠে হাজির হয়। কেউ যদি না আসে, তবে তার ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। জলদগম্ভীর স্বরে আদেশ করল এক সৈন্য।

সেই স্নিগ্ধ ভোরে গমগম করে বেজে উঠল মসজিদের মাইক। গুরিহাকার হাত-মুখ না ধোয়া জনতা ঘুম ঘুম চোখে যুগপৎ ভয় এবং আতঙ্কের ছায়া নিয়ে হাঁটতে লাগল ঈদগাহ মাঠের দিকে। এর আগে ঈদের নামাজ ছাড়া সম্মিলিতভাবে তারা কোনো দিন ঈদগাহে গমন করেনি। যুদ্ধের বছরগুলো বাদ দিলে তাদের প্রত্যেক বছরের ঈদগাহ গমন ছিল খুশির ঐশ্বর্যে ভরপুর। চোখেমুখে আনন্দের ছটা, পোশাকে আতরের সুবাস, বাবার আঙুল ধরা শিশুদের কলরব ছিল পরিচিত দৃশ্য। কিন্তু আজ তাদের ঈদগাহের গমন যেন পুলসিরাতের সফর। একটুখানি পা টললেই অনিবার্য অগ্নিসমাধি। সেই পুলসিরাতের ওপর দিয়ে লোকেরা হাঁটে আর নিঃশব্দে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে। তাদের কেউ কেউ খুঁজে ফেরে আদনানের মুখ। আদনানকে ধরার জন্যই বোধ হয় এই ক্র্যাকডাউন। ছেলেটার জন্য মন খারাপ হয় তাদের। মিরাকল কিছু না ঘটলে আজকের সূর্যোদয়ই হয়তো আদনানের জীবনের শেষ সূর্যোদয়।

ঈদগাহ মাঠে ঢোকার মুখে ধাতব হেলমেট পরিহিত বন্দুকধারী সৈন্যদের দীর্ঘ সারি। তাদের সামনে দিয়ে প্রবেশ করতে হবে মাঠে। লোকেরা ঠকঠক করে কাঁপে, ভয়ে নাকি শীতে, বোঝা যায় না। আইডি কার্ড উঁচু করে ধরতে বলা হয় সবাইকে। আইডি কার্ড এখন পোশাকের চেয়েও অপরিহার্য এক নাম এই উপত্যকায়। পোশাকশূন্য ব্যক্তির দিকে ফিরেও তাকাবে না সৈন্যদের বুলেট, কিন্তু আউডি কার্ডশূন্য ব্যক্তির রক্ষা নেই। লোকেরা দুই হাত মাথার ওপর তুলে সৈন্যদের সামনে দিয়ে ঈদগাহে প্রবেশ করে। তাদের কার্ড ধরা হাতটি ঈষৎ উঁচু, শূন্য হাতের তুলনায় এবং এই উঁচানো হাতে ধনী-গরিব কিংবা শক্তিমান-দুর্বলে কোনো পার্থক্য নেই। এ এক হাশরের মাঠ যেন। মর্যাদায় এখানে সকলে সমান। এখানে কেবল আমলনামা বা আইডি কার্ডের অস্তিত্ব বান্দার প্রাণ রক্ষা করতে পারে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আইডি কার্ড উঁচু করে ধরেই লোকদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এ সময় আবারো গমগম করে বেজে ওঠে মসজিদের মাইক। পুরো গ্রাম প্যারামিলিটারি ঘিরে রেখেছে, কেউ যেন পালানোর চেষ্টা না করে। যারা এখনো ঈদগাহ মাঠে উপস্থিত হয়নি, তাদের উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর নারীদের নির্দেশ দেওয়া হয় ঘরে অবস্থান করার। পুরুষদের জেরা শেষ হলে বিদ্রোহীদের সন্ধানে ঘরে ঘরে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করবে প্যারামিলিটারি। কোনো নারী যদি পুরুষ সদস্য অথবা গোলাবারুদ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করা হবে— ঘোষণা করা হয় এটাও।

ঈদগাহের মেহরাবের সামনে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে বাহিনীর কমান্ডার। সেলফ লোডেড রাইফেল হাতে কয়েকজন সৈন্য তাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। অফিসারের ঠিক পাশে মুখোশ পরিহিত এক স্থানীয় কাশ্মীরি। ভারতপন্থী ইখওয়ানি গ্রুপের সদস্য সে। প্রত্যেককে এই মুখোশধারী ইখওয়ানির ছাঁকনির ভেতর দিয়ে যেতে হবে। যাকে বিদ্রোহী বলে সন্দেহ হবে, ইখওয়ানি হাত তুলে ইশারা করবে, অমনি সে আটকে যাবে জালে। তার ওপর নেমে আসবে কেয়ামত। এই মুহূর্তে এই ঈদগাহ মাঠে আজরাইল দৃশ্যমান হলে লোকদের প্রতিক্রিয়া কী হতো, জানা নেই, তবে ওই ইখওয়ানির দিকে তারা আজরাইল দেখার অভিব্যক্তি নিয়ে তাকায়। মুখোশ পরা লোকটার বেখেয়ালি ইশারায় যে কারো ওপর জারি হতে পারে মৃত্যুপরোয়ানা। তারা কালেমা পড়ে, তিন কুল পড়ে; আয়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিয়ে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। কেউ কেউ আইডি কার্ড সাধ্যের শেষ সীমায় উঁচু করে নিজের পবিত্রতার প্রমাণ জাহির করে। ইখওয়ানিকে নিয়ে তাদের এত ভয় অথচ কাউকে ধরিয়ে দিতে সেই ইখওয়ানির হাত উঁচু হয় না। পিঁপড়ার সারির মতো লোকদের লাইন যখন নির্বিঘ্নে ইখওয়ানিকে অতিক্রম করে চলে যায়, তখন তাদের সন্দেহ হয়— এই লোক আদৌ কি ভারতপন্থী, নাকি সে ভেতরে-ভেতরে আজাদির সমর্থক! এই সব ভাবাভাবির ভেতর ফয়জুল্লাহ মাস্টার যখন লোকটার ছাঁকনির ভেতর প্রবেশ করে, তখন বিচারকের হাতুড়ির মতো উঁচু হয়ে যায় লোকটার হাত। আর সঙ্গে সঙ্গে দুপাশ থেকে দুজন সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে ফয়জুল্লাহর ওপর। পেছন থেকে কয়েকজন আর্তনাদ করে ওঠে দুঃখে। যারা ইতোমধ্যে পুলসিরাত অতিক্রম করে ফেলেছে, তারা ফয়জুল্লাহর পরিণতি দেখে বড় মায়া নিয়ে তাকায়। যারা পুলসিরাত অতিক্রমের অপেক্ষায়, তাদের বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যায়। সেই তখনই ফয়জুল্লাহকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় মেহরাবের ভেতর।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

সেখানে কয়েকজন সৈন্য মারধরসহযোগে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আদনান কোথায় জানতে চায় তারা।

আদনান যুদ্ধে গেছে— স্বীকার করেন ফয়জুল্লাহ। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কোথায় আছে, জানেন না তিনি।

পুরো ঈদগাহ মাঠ চষে ফেলা হয় আদনানের সন্ধানে। ঈদগাহ মাঠে নেই সে। তখন কয়েকজন সৈন্য ছুটে যায় আদনানদের বাড়িতে। সেখানেও পাওয়া যায় না তাকে। তখন সমস্ত ক্রোধ নেমে আসে ফয়জুল্লাহর ওপর। চড়-থাপ্পড়, কিল-ঘুষিতে একজন সম্ভ্রান্ত শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা হয়। বয়স্ক দেখাবে বলে যে দাড়িতে তিনি কলপ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেই সাদা দাড়ি উপড়িয়ে তাকে করা হয় চূড়ান্ত রকমের অপদস্থ।

যখন ঈদগাহ মাঠে আদনানের বাবার ওপর কেয়ামত আপতিত হচ্ছে, আদনান তখন লুকিয়ে আছে অজিতদের বাড়িতে। সাথে আছে আতিকুল্লাহ ও ইমতিয়াজ। গ্রামে ফেরার পর থেকে এক রাতও সে বাড়িতে ঘুমায়নি। রাত গভীর হলে সবাই যখন ঘুমের আয়োজন করে, আদনান তখন দুই বন্ধুকে নিয়ে অজিতদের দেয়াল টপকে ঢুকে পড়ে বাড়িতে, গোপনে। গেটে ঝুলতে থাকে তালা। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই পরিত্যক্ত এই বাড়ি তিন বিদ্রোহীর গোপন আস্তানা হয়ে উঠেছে। ওদের এই আস্তানার খবর ফয়জুল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানে না। এমনকি জানেন না নাজনীনও।

ভোরে ওরা যখন নামাজ পড়ছিল, মাইকের ঘোষণা গলিত সিসা হয়ে ওদের কানে ঢুকেছিল। অমনি ক্রোধে শক্ত হয়ে গিয়েছিল আদনানের চোয়াল। ওর দুচোখ দিয়ে বের হচ্ছিল আগুনের ফুলকি। ক্র্যাকডাউন মানেই বিভীষিকা। গ্রামবাসীর ওপর অকারণ নিপীড়ন-নির্যাতন, নারীদের সম্ভ্রমহানি। কখনো কখনো ঘরবাড়ি, ফসলের খেত, ফলের বাগান জ্বালিয়ে দেওয়া। আদনানের একবার মনে হয়, আস্তানা থেকে বেরিয়ে শয়তানগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে যুদ্ধ ওদের বিপদই বাড়াবে শুধু। যে সন্দেহ নিয়ে ওরা ক্র্যাকডাউন বসিয়েছে, প্রতিরোধের মুখে পড়লে সেই সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হবে। এতে সীমাহীন বিপর্যয়ের মুখে পড়বে গ্রামবাসী। তখন বিদ্রোহীদের খোঁজে গুরিহাকায় সামরিক অভিযান পরিচালিত হবে। ব্যাপক জীবনহানি ঘটবে। নারীরা ধর্ষিত হবে। যুবকদের বন্দী করা হবে। সন্দেহ হলেই পুড়িয়ে দেওয়া হবে বসতবাড়ি। আর অনিবার্যভাবে বন্ধ হয়ে যাবে চলমান গেরিলা প্রশিক্ষণও। তা ছাড়া যেকোনো ক্র্যাকডাউনে বিপুলসংখ্যক সৈন্য অংশগ্রহণ করে। ওদের তিনজনের পক্ষে এই মুহূর্তে সবাইকে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। ফলে গুরিহাকা ঈদগাহ মাঠে যখন লাঞ্ছিত হন

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ফয়জুল্লাহ, যখন বিক্ষুব্ধ সৈন্যরা তল্লাশির নামে আদনানদের বাড়ির আসবাব ভেঙে তছনছ করে, তখনো আদনানকে চুপচাপ বসে থাকতে হয় গোপন কক্ষে। খটকা শুধু একটা ব্যাপার নিয়ে— আর্মির কাছে ওদের খবর কে পৌঁছাল?

উপত্যকাজুড়ে ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে এ মাটির গাদ্দার ইখওয়ানি গ্রুপ। ভারতীয় সৈন্যদের জলখাবার খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে তাদের দেহ আর হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে তাদের অপতৎপরতা। যেকোনো মুক্তির সংগ্রামে বাইরের শত্রুর সাথে যদি ঘরের শত্রুকেও মোকাবিলা করতে হয়, তবে তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছুতে হয় না। আদনানরা ইদানীং সেই দুর্ভাগ্যের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া দিন যত যাচ্ছে, গোলযোগ ততই ঘনীভূত হচ্ছে। জেকেএলএফ ছাড়াও আজাদির জন্য লড়াই করছে আরো অনেকগুলো দল-উপদল। হিজবুল মুজাহিদিন, আল্লাহ টাইগারস, হরকতুল আনসার, জামাতুল মুজাহিদিন, আল ওমর, আল জিহাদ ইত্যাদি নামের নানা দল। একই রণাঙ্গনে যখন অনেকগুলো দল ভিন্ন ভিন্ন নামে লড়াই অব্যাহত রাখে, বিশৃঙ্খলা সেখানে অনিবার্য হয়ে ওঠে। আজাদিকামী দুটো দল আধিপত্য বিস্তার করাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়িয়েছে, এমন খবরও প্রকাশিত হয়েছে গণমাধ্যমে। ব্যক্তিগত ক্রোধ থেকে কোথাও কোথাও ঘটছে গুপ্তহত্যার মতো ঘটনা। এই সব খবর কেবল বেদনাই বাড়িয়েছে আদনানের। তবে আশার কথা হলো, সম্প্রতি সবগুলো দল একটি প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে, হুররিয়ত কনফারেন্স যে প্ল্যাটফর্মের নাম। লড়াইরত প্রতিটি দলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য একটাই— কাশ্মীরের আজাদি। তবে আজাদি অর্জিত হলে তখন কী হবে, তা নিয়ে আছে তুমুল বিতর্ক। জেকেএলএফ চায় স্বাধীন-সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ কাশ্মীর গড়তে। অন্যান্য দল, বিশেষত হিজবুল মুজাহিদিন চায় কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সাথে জুড়তে। এ নিয়ে মাঝে মাঝে দলগুলোর ভেতর প্রবল বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়। জেকেএলএফের বক্তব্য— কাশ্মীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী একটি দেশ। ভারতীয় শাসনের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে তারা কিছুতেই পাকিস্তানের দাসত্বের নিচে গর্দান রাখতে পারে না। মুক্তিকামী বিদ্রোহী দলগুলোর এই বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারছে না খোদ হুররিয়াত কনফারেন্সও। এ নিয়ে জেকেএলএফের ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেছে আদনান। নেতৃবৃন্দ ওকে আশ্বস্ত করেছে— স্বাধীনতা-পরবর্তী করণীয় বিষয়ে এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দরকার নেই। আগে আমরা সবাই মিলে দেশটাকে হায়েনামুক্ত করি। তারপর দেশ গঠনের কর্মপদ্ধতি ঠিক করা যাবে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

এখনই যদি আমাদের পাকিস্তানবিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠে, তবে দুই পরাশক্তির মাঝখানে পড়ে আমরা চ্যাপ্টা হয়ে যাব।

পাকিস্তান ভাবনায় নেতৃবৃন্দের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হবে অচিরেই। পাকিস্তান সরকার শিগগিরই জেনে যাবে জেকেএলএফের গোপন অভিলাষের খবর। যে পাকিস্তান অস্ত্র ও আশ্রয় দিয়ে জেকেএলএফকে পরিপুষ্ট করছে, সেই তারাই শত্রু হয়ে উঠবে জেকেএলএফের। এমনকি আগামী বছর ১১ ফেব্রুয়ারি, মকবুল ভাটের ফাঁসির দিনে, জেকেএলএফ কমান্ডার আমানুল্লাহ খান স্বাধীনতার দাবিতে আজাদ কাশ্মীর থেকে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে মার্চ করতে গেলে তাকে বাধা প্রদান করবে পাকিস্তান সরকার। তারা কারফিউ জারি করে জেকেএলএফ সদস্যদের ওপর নির্বিচারে গুলি করবে। এই ঘটনায় নিহত হবে বারোজন গেরিলা। শুধু তা-ই নয়, জেকেএলএফকে দমন করার জন্য তারা হিজবুল মুজাহিদিনকে লেলিয়ে দেবে। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তানের হিংস্রতার শিকার জেকেএলএফ কিছুদিনের মধ্যেই অস্তিত্বের সংকটে পড়বে। আমরা দম বন্ধ করে সেই বেদনাবিধুর দিনগুলো দেখার অপেক্ষায় থাকি।

সম্ভাব্য সকল জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও যখন আদনানকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, তখন ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরে যায় সৈন্যরা। যাওয়ার আগে রেখে যায় এক লোভনীয় টোপ— আদনানকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে, তার জন্য থাকবে দশ হাজার রুপি এনাম। দোকানি জুলফিকার জিপের চাকার দাগের ওপর থু ফেলে সখেদে উচ্চারণ করে, দশ হাজার কেন, তামাম দুনিয়া লিখে দিলেও আদনান বেটার খবর আমি দেব না।

সৈন্যদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ফয়জুল্লাহকে ঘিরে ধরে গ্রামবাসী। তাদের একটাই কথা— মাস্টার সাব, তুমি মন খারাপ কোরো না। ওরা আমাদের কিছু বলেনি, শুধু তোমাকে বলেছে, এতেই প্রমাণিত হয়, তুমি ব্যতিক্রমী ও অনন্য হয়ে উঠেছ। তুমি আমাদের থেকে আলাদা। কারণ, তোমার ঘরে আদনান আছে, আমাদের ঘরে নেই। তোমার বেটা ওদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। কত বড় যোদ্ধা হলে তার জন্য এনাম ঘোষণা করে! তুমি মন খারাপ কোরো না। তোমার শরীরের জুলুমের প্রতিটি দাগ একদিন বিজয়ের চিহ্ন হিসেবে আদৃত হবে।

গ্রামবাসীর সমাদরে বিব্রত হন ফয়জুল্লাহ। তিনি আমতা-আমতা করে বলেন, আমি ঠিক আছি। আমাদের কত ভাই, কত সন্তান শহীদ হয়েছে। আমি তো প্রাণে বেঁচে আছি। তোমরা শুধু আমার বেটার জন্য দোয়া করো। জালিমের নখের আঁচড়ও যেন ওকে স্পর্শ না করে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কিন্তু ছেলেটা গেল কোথায়, যার জন্য এত কিছু! একজন বিড়বিড় করে বলে।

শুনেছি সে বিরাট যোদ্ধা হয়ে ফিরেছে। তাকে ধরা ভারতীয় বাহিনীর কাজ নয়। দেখো, এতক্ষণে সে হয়তো শ্রীনগরগামী বাসে চড়ে বসেছে। প্রমথজনের কথার পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করে আরেকজন।

ফয়জুল্লাহ দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, সে খোদার জিম্মায় আছে। খোদা তাকে হেফাজতে রাখবেন।

ঈদগাহ থেকে লোকেরা ধীরে ধীরে ফিরতে শুরু করে। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই যে আতঙ্ক আজ তাদের গ্রাস করেছিল, সেই ভয়ের অপচ্ছায়া সহসা দূর হয় না চেহারা থেকে। তারা বুঝতে পারে, গুরিহাকার ওপর শকুনের চোখ পড়েছে। শকুনের সেই কুদৃষ্টি থেকে সহজে মুক্তি মিলবে না তাদের।

বুকভরা উৎকণ্ঠা নিয়ে মহল্লায় পা রাখেন ফয়জুল্লাহ। সদর দরজা পেরিয়ে ঘরের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে তার দুচোখে অন্ধকার নামে। নাজনীন কাঁদছেন। বিধ্বস্ত ঘরের এলোপাতাড়ি আসবাবের মধ্যে বসে তিনি অঝোরে কাঁদছেন। তিল তিল করে গোছানো তার সংসারের প্রতিটি কণা ভেঙে খানখান করে দিয়ে গেছে শয়তানগুলো। নাজনীন হঠাৎ উঠে দাঁড়ান, একেকবার একেক আসবাবের কাছে ছুটে যান, হাত বোলান আর অভিশাপ দেন তাদের ওপর, যারা কেয়ামত নামিয়েছে। দরজায় দাঁড়িয়ে ফয়জুল্লাহ তীক্ষ্ণ চোখে স্ত্রীর চেহারা পড়তে থাকেন। যে উৎকণ্ঠা নিয়ে তিনি ঘরে ফিরেছেন, আসবাবের জন্য স্ত্রীর বেদনা দেখে সেই উৎকণ্ঠার ভার বুক থেকে নেমে যায়। না, স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ কিছু ঘটেনি। স্ত্রীর মুখজুড়ে শুধু সম্পদ হারানোর বেদনা। সম্ভ্রম হারানোর বেদনার রং ভিন্ন। সেই রং তার মুখে নেই।

স্ত্রীর কাছে যাবেন, সান্ত্বনা দেবেন, অথচ ভয় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ফয়জুল্লাহকে। এই মুহূর্তে তার নিজের চেহারাও আসবাবের চেয়ে ভিন্ন নয়। এমতাবস্থায় স্বামীর বিপন্ন মুখ দেখলে আরো বেশি ভেঙে পড়বেন নাজনীন। ফয়জুল্লাহ তাই দরজার মুখে দাঁড়িয়েই থাকেন। এ সময় দ্বিতীয় দরজা দিয়ে মায়ের সামনে হাজির হয় রায়হান। কাত হয়ে পড়ে থাকা পিতলের ঘড়ায় সজোরে লাথি মেরে সে বলে, এসবের জন্য দায়ী আদনান। একমাত্র আদনান। ওর কারণেই আব্বুজি সবার সামনে আজ লাঞ্ছিত হয়েছে। ওর কারণেই ঘরের আসবাব ধ্বংস হয়েছে। এবার তবু জানে বেঁচে গেছি আমরা, পরেরবার ওরা জানটাও রেখে যাবে না।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ফয়জুল্লাহ নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না আর। কয়েক বছরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উপযুক্ত জ্বালামুখ পেয়ে নিমেষে বের হয়ে আসে। এক পৃথিবীর ক্রোধ নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন আত্মজের ওপর। বুঝতে শেখার পর থেকে যে আত্মজের গায়ে তিনি টোকাটিও দেননি কোনো দিন, সেই তাকে আজ তিনি ক্রমাগত চড়-থাপ্পড় মারতে থাকেন। চিৎকার করে বলেন, আদনানকে তুই দোষারোপ করছিস অথচ আদনান আমার গর্ব। ও আমার মুখ উজ্জ্বল করেছে। তুই আদনানের নখের যোগ্যও নস।

এলোপাতাড়ি কিল-থাপ্পড়ের মুখে যুগপৎ বিস্মিত ও হতভম্ব হয় রায়হান। তার মাথাভরতি চুল ঝড়ের কবলে পড়া পপলারগাছের পাতার মতো অবিন্যস্ত দেখায়। তার ঠোঁট ফেটে রক্ত বের হয়। তার ধবধবে ফরসা গাল পাকা বেদানার মতো লাল হয়ে ওঠে। বাবার রুদ্রমূর্তি আজ তাকে এতটাই অসাড় করে, আত্মরক্ষার কথাও ভুলে যায় সে। বাবার এই অগ্নিরূপ সে আগে কোনো দিন দেখেনি। আর যা কিছু ভয়ংকর-নতুন, তা মানুষকে বিস্মিত করবেই। কিছুক্ষণ পর হতবুদ্ধি ভাব কেটে গেলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে রায়হান। ওর ক্রোধ তখন আদনান এবং বাবা— দুজনের ওপরই গড়িয়ে পড়ে। নিজেকে মনে হয় অনাহূত, এ বাড়ির স্নেহ-মমতায় যার কোনো হিস্যা নেই। বাবাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ও ছিটকে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। যাওয়ার আগে রেখে যায় একটি হুমকি— যার জন্য আপনি আমাকে আঘাত করলেন, তার পরিণতি না দেখে আমি মরব না। আমি ওকে দেখে নেব।

নাজনীন ছুটে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরেন। এ তুমি কী করলে! অত বড় বেটার গায়ে হাত তুললে!

ফয়জুল্লাহ দাঁতে দাঁত পিষে বলেন, যা করেছি বেশ করেছি। এটাই ওর প্রাপ্য। এরপর দুজন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বিক্ষিপ্ত আসবাবের মধ্যে বসে শুধু কাঁদেন। কাঁদেন আর কাঁদেন। হাউমাউ করে কাঁদেন। বাতাসের ঝাপটায় জানালার পর্দা সরে যায়। ঘোলাটে কাচের ভেতর থেকে দেখা যায় কাশ্মীরের উজ্জ্বল সকাল আর পর্বতের মাথায় নেমে আসা মেঘের আলিঙ্গন। কণ্ঠলগ্না ওই মেঘ আর পর্বতের সংগম দেখে কত কথা মনে পড়ে ফয়জুল্লাহর। তাদের সোনার তারে বাঁধানো সংসারের আজ এ কী দশা! মেয়েটা ধর্ষিত হয়ে কথা বলা দূরে থাক, বাবা-মাকে মুখ পর্যন্ত দেখায় না। বাবা আজ শত শত মানুষের সামনে অপদস্থ হলো। এক ছেলে বিদ্রোহী হয়ে আর্মির কোপানলে পড়েছে। আরেক ছেলে হয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ের পথচ্যুত। এই সংসারে একদা যে খুশির ফল্গুধারা বইত, পরিবারটির দুই মহিরুহের আজকের এই বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে কে বিশ্বাস করবে!

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পরদিনের সূর্য উদিত হলো একটি মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। শিশনাগ খালের মধ্যে জলমগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে এক অজ্ঞাত যুবকের লাশ। যুবকের মাথায় এবং বুকে দুটো গুলি। রক্তাক্ত এই লাশ যুগপৎ ব্যথিত ও কৌতূহলী করে জনতাকে। পথের ধারে যখন কারো মৃতদেহ পাওয়া যায়, কীভাবে মারা গেল, তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে ওঠে কে মারা গেল! এই একই প্রশ্ন তাড়িত করে গুরিহাকাবাসীকেও। তারা লাশটিকে ডাঙায় তুলে তার পরিচয় উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে— ছেলেটা কে? কয়েকজন সদ্যমৃত যুবকের তরতাজা চেহারা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত জানায়— এই যুবক গুরিহাকার কেউ নয়। তখন আশপাশের গ্রামের সম্ভাব্যতা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলে। খোঁজ নিতে নিতে জানা যায়, যুবকের বাড়ি বাতেকানে। রায়হানের বন্ধু। প্রায়ই তাকে রায়হানের সাথে গুরিহাকার চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে দেখা যেত। কিন্তু সে কেন লাশ হয়ে পড়ে থাকবে শিশনাগ খালে! এখন যারা লাশ হয়, তারা অধিকাংশই ভারতবিরোধী বিদ্রোহী। রায়হানের সাথে এই যুবকের ওঠাবসা ছিল মানে সে ভারতঘেঁষা রাজনীতির সাথে জড়িত। এখন সুদিন তো তাদেরই। তবু সে কেন মরল? এই সব ভাবাভাবির ভেতর হঠাৎ কেউ একজন চিৎকার করে ওঠে— আরে, এই ছেলেই তো গতকাল ফয়জুল্লাহ মাস্টারকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

তুমি কীভাবে বুঝলে? তার মুখে তো মুখোশ ছিল! জনতা মন্তব্যকারীকে ছেঁকে ধরে।

পিরহান! পিরহান! সেই ইখওয়ানি আর এই লাশের পিরহান হুবহু এক। দুজনের উচ্চতাও সমান।

এবার অন্যরাও পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে। একপর্যায়ে তারা একমত হয়, এই লাশ সেই ইখওয়ানিরই। শুরুতে লাশের খবরে যারা ব্যথিত হয়েছিল, তারা এবার নিজেকে ধিক্কার জানায়। আর যা-ই হোক, কোনো ইখওয়ানি দালালের মৃত্যুতে তারা শোকাহত হতে পারে না। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে তারা সক্রোধে আবার লাশটাকে পানিতে নিক্ষেপ করে।

আঠারো

স্কুলের দেয়ালের পাশে ঝোপের মধ্যে কী যেন নড়ছে। হয়তো কোনো শিয়াল কিংবা বেজি। কোনো গেরিলা কিংবা গোয়েন্দাও কি লুকিয়ে থাকতে পারে না! আদনান থমকে দাঁড়ায়। মাথার ওপর তারকাখচিত আকাশ ঝলমল করছে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেঘকে মনে হচ্ছে দ্বিতীয় পাহাড়। কনকনে ঠান্ডার দিন পেরিয়ে কাশ্মীর প্রবেশ করেছে এপ্রিলের মৃদুমন্দ উষ্ণ আবহাওয়ায়। তবু রাত্রিবেলার পৃথুলা বাতাসে শীত শীত লাগে। তখন অজান্তেই কানের ওপর টেনে নিতে হয় গরম কম্বল। পিরহানের নিচে কালাশনিকভের অস্তিত্ব দেখে নিয়ে একটা ফারগাছের আড়ালে বসে পড়ে আদনান। ঝোপের ভেতরের নড়াচড়াটা সন্দেহজনক। নায়ক, প্রতিনায়ক এবং খলনায়কে ছেয়ে গেছে কাশ্মীরের প্রতিটি অঞ্চল। কে কোথায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে আর কার বিরুদ্ধে কে অস্ত্র তুলে নিচ্ছে, বুঝে ওঠা দুষ্কর। পরপর দুটি সফল অভিযান শেষে নূরজাহানের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে আদনান তাই বাড়তি সতর্ক। যে পরিকল্পনা নিয়ে ও গুরিহাকায় প্রশিক্ষণকেন্দ্র খুলে বসেছিল, কোনো এক গাদ্দারের বিশ্বাসঘাতকতায় তা সম্পন্ন করা যায়নি। সেদিনের সেই ক্র্যাকডাউনের পর প্রশিক্ষণ জারি রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তারপরও এক সপ্তাহ চুপচাপ থাকার পর পাহারাসংখ্যা বাড়িয়ে ওরা আবার শুরু করেছিল গোপন কার্যক্রম। প্রশিক্ষণ চলাকালে, আগের মতোই, কয়েকজন বন্দুকধারী গেরিলা সতর্ক পাহারা দিত গুরিহাকার প্রবেশমুখে। যেন মিলিটারি কিংবা প্যারামিলিটারির আগমনী সংবাদ আগেই পৌঁছে যায় প্রশিক্ষণকেন্দ্রে। প্যারামিলিটারি এসেছিল। তবে গুরিহাকার অনুমেয় প্রবেশপথে নয়। তারা এসেছিল বাতেকানের ভেতর দিয়ে, শিশনাগ খাল পেরিয়ে, কোনো ধরনের বাধাবিঘ্ন ছাড়াই। আতিকার ছোট ভাই ট্রাকের শব্দ শুনেই ছুটে আসতে চেয়েছিল প্রশিক্ষণকেন্দ্রে, বিপদসংকেত দিতে। কিন্তু নিয়তি সেই সুযোগ তাকে দেয়নি। প্যারামিলিটারির নিখুঁত নিশানা খালপাড়ে তার কবর রচনা করেছে।

আতিকার কিশোর ভাই পারভেজ, এখনো যার ঠোঁটের ওপর গোঁফের আভাস ফোটেনি, আজাদির সংগ্রামে যারা জীবন উৎসর্গ করেছে, শহীদের সেই দীর্ঘ মিছিলে নাম লিখিয়েছে সে। তবে মৃত্যুর আগে জগদ্বাসীর জন্য রেখে গেছে দৃষ্টান্তরহিত বীরত্বের স্বাক্ষর। নিজের জীবনের বিনিময়ে সে রক্ষা করেছে আদনানসহ অসংখ্য গেরিলার জীবন।

সেই পড়ন্ত দুপুরে আদনানদের সবটুকু মনোযোগ লেপিত ছিল প্রশিক্ষণের মাঝে। যদি না ফায়ারের শব্দটুকু হতো, ওরা জানতেও পারত না পাশের গ্রামের ভেতর দিয়ে, খাল পেরিয়ে, যমদূত এগিয়ে আসছে ওদের হৃৎপিণ্ডের কাছে। কিন্তু পারভেজের সাহসী সিদ্ধান্ত প্যারামিলিটারি সদস্যদের মেশিনগানে শব্দ তুলতে বাধ্য করে আর ওই শব্দ শুনেই সতর্ক হয়ে যায় আদনানরা। একটুক্ষণ কান পেতে থাকার পর শব্দ বলে দেয়, ফায়ারের উৎস

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পাশের গ্রাম। তখনই ঘটনার অর্ধাংশ পরিষ্কার হয়ে যায়। ক্র্যাকডাউনের পর থেকেই আদনান বুঝে গিয়েছিল, এখানে গাদ্দার আছে। সেদিনের সেই মুখোশধারী ইখওয়ানিকে হত্যা করলেও আদনান ধরে নিয়েছিল, সংখ্যায় সে শুধু একা নয়। তার সঙ্গীসাথিরা আশপাশেই আছে ওত পেতে। আর এ কারণেই তথ্য পাচার রোধ এবং প্রশিক্ষণকেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য আঞ্চলিক ক্যাম্প থেকে বাড়তি কিছু সৈন্য আনিয়ে রেখেছিল আদনান।

শিশনাগ খালের ওপাশে প্যারামিলিটারির হেলমেট নড়ে উঠতেই রিজার্ভ গেরিলাদের নিয়ে প্রতিরোধযুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে আদনান। প্রশিক্ষণার্থীদের দ্রুত সরে যেতে বলে ওরা অস্ত্র হাতে শুয়ে পড়ে খালপাড়ের বড় বড় পাথরের আড়ালে। পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাব্য আনন্দ নিয়ে ধীরে ধীরে খালের ঢালু পাড় বেয়ে নামতে থাকে ইউনিফর্মধারী সৈন্যরা। অথচ তারা বুঝতেও পারে না তাদের একটি ফায়ার প্রতিপক্ষকে প্রস্তুতি নেওয়ার এবং পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগ করে দিয়েছে। অর্ধেক সৈন্য ওপারে ট্রাকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে আর বাকি অর্ধেক খাল পাড়ি দিয়ে গুরিহাকায় প্রবেশের চেষ্টা করে। পানির ভেতর জেগে থাকা পাথরের ওপর পা ফেলে ফেলে যখন সৈন্যরা খালের অর্ধাংশ পেরিয়ে আসে, তখনই গর্জে ওঠে আদনানের কণ্ঠ— ফায়ার!

অমনি বজ্রনিনাদে ফেটে পড়ে গেরিলাদের কালাশনিকভ— ঠা ঠা দ্রিম দ্রিম।

ভারতীয় সৈন্যদের তখন না ঘর না বাহির অবস্থা। সামনে তাদের কোনো প্রতিরক্ষাদেয়াল নেই, যার আড়ালে দাঁড়িয়ে তারা আক্রমণ অথবা আত্মরক্ষা করতে পারে। নিরুপায় যারা ফায়ার করতে করতে সামনের দিকে অগ্রসর হয়, আদনানরা পাথরের আড়ালে বসে তাদের বুক ঝাঁঝরা করে দেয় আর যারা পালাতে যায় পেছন ফিরে, তাদের ঝাঁঝরা হয় পিঠ। এভাবে সকাতরে গুলি খেয়ে সলিলসমাধি হয় অর্ধেক সৈন্যের। সৈন্যদের রক্তে লাল হয়ে ওঠে শিশনাগের দুগ্ধফেনিল পানি। শিশনাগের এই রক্তিম রূপ আগে কখনো দেখেনি আদনান। চোখের সামনে অর্ধেক লোকক্ষয়ের পর ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা বাকি অর্ধেক সৈন্যরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্রকে ধ্বংস এবং কয়েকজন গেরিলাকে ধরতে এসে এমন প্রতিরোধের মুখে পড়বে, এমন সুপ্রশিক্ষিত গেরিলাদলের মুখোমুখি হবে, ভাবতেও পারেনি তারা। আর তাই সিদ্ধান্তহীনতায় কেবলই তারা কালক্ষেপণ করতে থাকে। পাথরের আড়াল থেকে আদনানরা উঁকি মেরে তাদের ভ্যাবাচেকা মুখগুলো দেখে আর হাসি বিনিময় করে। অভিযানের অর্ধেক এত

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

দ্রুত শেষ হয়ে যাবে এবং এর ফলাফল পুরোটাই নিজেদের পক্ষে আসবে, বিষয়টি কল্পনারও অতীত ছিল। আনন্দে ওদের স্লোগান দিতে ইচ্ছা করে— জেকেএলএফ জিন্দাবাদ। ভারতীয় দখলদার মুর্দাবাদ।

ওরা যখন অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত এবং উচ্ছ্বসিত, ঠিক তখনই খালের ওপার থেকে উড়ে আসে এক গ্রেনেড এবং প্রকাণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে গেরিলাদের দেহে কাঁপন ধরায় গ্রেনেডটি। এরপর আরো একটি। গ্রেনেডের ছোবলে আদনানদের একটি আপেলগাছে আগুন ধরে যায়। খালপাড়ের মাটিতে বিশাল এক গর্ত তৈরি হয় এবং দুজন গেরিলাকে আড়াল করে রাখা একটি পাথরখণ্ড গর্তের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে। প্রচণ্ড ঝড় আচানক ঘরের টিন উড়িয়ে নিলে যেমন বিপন্নতা গ্রাস করে গৃহবাসীকে, প্রতিরক্ষার দেয়াল হারানো দুই গেরিলা একই বিপন্নতায় আক্রান্ত হয়। তৃতীয় গ্রেনেড নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগেই ভয়ের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে অরক্ষিত দুই গেরিলা দৌড়ে আশ্রয় নেয় আপেলবাগানের মাঝখানে। একটু আগে বিজয় উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল যারা, তিনটি গ্রেনেড হজম করে সেই তারাই এখন বিপর্যস্ত। যুদ্ধের নিয়মই বোধ হয় এমন— প্রতিমুহূর্তে সে সংকট এবং সম্ভাবনার নিয়তি রচনা করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

আদনান ভাবে। মাথা ঠান্ডা রেখে ভাবে। এই সংকটাপন্ন মুহূর্তে খালপাড় থেকে পেছন দিকে সরে আসাই মনে হয় নিরাপদ হবে। প্যারামিলিটারি সদস্যরা বোধ হয় এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষায় ছিল। আদনানরা যেই না পিছু হটতে শুরু করে, অমনি তারা ফায়ার করতে করতে খালের ভেতর নেমে আসে এবং খাল পার হওয়ার চেষ্টা করে। আতিকুল্লাহ চিৎকার করে বলে, আমাদের পিছু হটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। এখন আমাদের সবাইকে মরতে হবে। আতিকুল্লাহ আরো কিছু বলতে যায়, কিন্তু শিসতোলা একটি বুলেট বাহুতে বিদ্ধ হয়ে তার কথা থামিয়ে দেয়। আতিকুল্লাহ আর্তনাদ করে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। গড়াতে গড়াতে একটি আপেলগাছকে সে আশ্রয় বানায়। এই চরম উত্তেজনাময় মুহূর্তে মাথার ভেতর নতুন পরিকল্পনা সাজানোর চেষ্টা করে আদনান, কিন্তু সবকিছু কেমন জট পাকিয়ে যায়। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে প্যারামিলিটারি এপারে চলে আসবে এবং সন্দেহ নেই, এপারে এলেই তারা ভয়ংকর ধ্বংসলীলা চালাবে। এতে ধ্বংস হবে যেমন সে ও তার সৈন্য, ধ্বংস হবে গুরিহাকা গ্রামও। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয় ওর। আজ সবাই যদি মারা যায়, তবে এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী সে নিজে। এই সব ভাবতে ভাবতে আত্মবিশ্বাস আরো তলানিতে নামে। নিজেদের প্রতিরোধব্যবস্থাকে মনে হয় বালু দিয়ে সাজানো এক প্রাচীর, ফুঁ দিলে যা ধসে পড়বে। হঠাৎ

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আতিকুল্লাহর যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে ওর চোখ পড়ে। অমনি রক্তের মধ্যে নাচন ওঠে ওর। না, এভাবে ও সবাইকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে না। ওরা যদি ব্যর্থ হয়, গেরিলাদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুরো গ্রামকে ওরা শ্মশান বানিয়ে ছাড়বে। নব-উদ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় আদনান। চিৎকার করে ও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নির্দেশ দেয়, আপেলগাছের আড়ালে সবাই যেন পজিশন নেয়। সৈন্যরা খাল পেরিয়ে এপারে আসামাত্র ফায়ার করতে হবে।

আতিকুল্লাহর যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়ছে। যন্ত্রণার সাথে বাড়ছে রক্তক্ষরণও। পিরহান ছিঁড়ে ওর ক্ষতস্থান বেঁধে দেয় ইমতিয়াজ। সাহস দেওয়ার উদ্দেশে কাঁধ চাপড়ে বলে, যুদ্ধ শেষ হলেই তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। ততক্ষণে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকো।

প্রতিটি আপেলগাছের গোড়ায় একজন গেরিলা, প্যারামিলিটারির মৃত্যুদূত। প্রত্যেকে প্রতিপক্ষের খাল পেরিয়ে আসার অপেক্ষায় আছে। সহযোদ্ধাদের অবস্থান দেখতে গিয়ে আদনানের চোখ আটকে যায় আপেলগাছের শাখায় শাখায়। কালাশনিকভের ওপর মাথা রেখে ও আপেলের সবুজ পাতার দিকে তাকায়। এই চেনা এবং প্রিয় বাগান যে কোনো দিন যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে, কোনো দিন কি ভেবেছিল ও? পুড়ে যাওয়া গাছটার জন্য ওর মন খারাপ হয়। দাদাজি বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই গাছটির জন্য অশ্রু বিসর্জন দিতেন। এই গাছগুলো যে কত প্রিয় ছিল দাদাজির! বাবা বলেন, এই গাছগুলো ছিল তোমার দাদাজির সন্তানের মতো।

আপনার কখনো ঈর্ষা হয়নি? একদিন গল্পে গল্পে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল আদনান।

বাবার মন সেদিন কোনো কারণে প্রফুল্ল ছিল। তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমরা গাছ এবং সন্তান লালন-পালন করি ভবিষ্যতের আশায়। সেই হিসেবে ঈর্ষা তো হতোই একটু-আধটু।

নিজেদের তো রক্ষা করতেই হবে, গাছগুলোকেও রক্ষা করতে হবে। মনে প্রতিজ্ঞা করে আদনান। কালাশনিকভের গায়ে হাত বুলিয়ে ও অপেক্ষায় থাকে সৈন্যদের। ঘাতকের হেলমেট ভেসে ওঠামাত্র ফায়ার করতে হবে—নির্দেশ দেওয়া আছে সকলকে।

আদনানদের অপেক্ষা ফুরায় না, তার আগেই খালের ভেতর থেকে ফায়ারের শব্দের সাথে প্যারামিলিটারি সদস্যদের আর্তনাদ ভেসে আসে। হতভম্ব হয়ে যায় সবাই। কেউ কি আগবাড়িয়ে কমান্ডারের নির্দেশ উপেক্ষা করে গুলি করল! নাকি আসমান থেকে মদদগার ফেরেশতা নেমে এল এই

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আপেলবাগানে! ভ্যাবাচেকা খেয়ে তারা একে অন্যের দিকে তাকায়। একটু পরই খোলাসা হয় ঘটনা। যুদ্ধ শুরুর আগেই প্রশিক্ষণার্থীদের গাঁয়ের মধ্যে আশ্রয় নিতে বলেছিল আদনান। আদনানের নির্দেশ মোতাবেক আশ্রয়ও নিয়েছিল সবাই। শুধু একজন ব্যতীত। আতিকা। বিচক্ষণ আতিকা বুঝে ফেলেছিল, সৈন্যরা তাদের গ্রামের ভেতর থেকে প্রশিক্ষণকেন্দ্রে আক্রমণ করতে চলেছে। এই অনুমান থেকে সে ছুটে গিয়েছিল রাহাপোরা বাজারের দিকে, যেখানে সশস্ত্র গেরিলারা প্রহরা দিচ্ছিল। আতিকা সবকিছু খুলে বলেছিল প্রহরারত গেরিলাদের এবং পরিচিত ভৌগোলিক জ্ঞান থেকে সে পরামর্শ দিয়েছিল, লুকিয়ে বাতেকান গাঁয়ে ঢুকতে পারলে পেছন থেকে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করা যাবে। এতে উভয়মুখী আক্রমণের মুখে দিশাহারা হয়ে পড়বে শয়তানগুলো।

আতিকার পরামর্শ পছন্দ হয় তাদের। আতিকার বাতলানো পথে বাতেকানে ঢুকে তারা ওত পেতে থাকে সৈন্যদের পেছনে। গ্রেনেড ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে প্যারামিলিটারি যখনই খাল পেরিয়ে আদনানদের আপেলবাগানে ঢুকতে যায়, তখনই গেরিলারা পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে।

অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণের মুখে সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যায় সৈন্যদের। কে বা কারা পেছন থেকে হামলা করছে, কিছু বুঝতে পারে না তারা। জীবন বাঁচাতে তারা দৌড়ে আপেলবাগানে ঢুকতে গেলে গর্জে ওঠে আদনানদের কালাশনিকভগুলো। পেছনে গেরিলা, সামনেও গেরিলা; দুপাশে বয়ে গেছে শিশনাগ খাল— চতুর্মুখী আক্রমণের মুখে খালের মাঝখানে অকাতরে প্রাণ হারাতে থাকে সুপ্রশিক্ষিত, প্রতাপশালী প্যারামিলিটারি।

এরপর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় থেমে যায় যুদ্ধ। গুরিহাকা এবং বাতেকানের লোকেরা খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করে এক ভয়ংকর যুদ্ধের বিভীষিকা। যখন বুঝতে পারে, এই যুদ্ধে নিরঙ্কুশ জয় হয়েছে কাশ্মীরিদের, বাঁধভাঙা প্লাবনের মতো তারা ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। ফয়জুল্লাহর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন আজ। তার বেটার নেতৃত্বে আস্ত এক সুসজ্জিত বাহিনীকে স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছে গেরিলারা। খুশির প্রাবল্যে নিজেদের আপেলবাগানে তিনি সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। আনন্দের ঝরনাধারার মতো নাজনীনের চোখ দিয়ে খুশির বৃষ্টি ঝরতে থাকে। এমন স্মরণীয় দিনে প্রয়াত শ্বশুরের কথা খুব মনে পড়ে তার। মানুষটা যদি বেঁচে থাকতেন, নাতির এই সাফল্যে তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। তিনি আদনানকে জড়িয়ে ধরে কাঁদেন আর দোয়া পড়ে ওর বুকে ফুঁ দিতে থাকেন। জনতা আদনানকে কাঁধে তুলে মিছিল করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

সবাইকে নিবৃত্ত করে আদনান। আতিকুল্লাহ আহত। বিজয় উদ্‌যাপন করবার আগে দরকার ওর চিকিৎসা।

কোত্থেকে এক ভ্যান চলে আসে। লোকেরা ধরাধরি করে আতিকুল্লাহকে ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় বাশারত ডাক্তারের কাছে। আতিকুল্লাহর সঙ্গী হয় দুজন গেরিলা। এ সময় আতিকাকে এক অদ্ভুত কাজে লিপ্ত হতে দেখা যায়। সে খালের কিনারায় গিয়ে প্যারামিলিটারির লাশের উদ্দেশে থুতু নিক্ষেপ করে আর চোয়াল শক্ত করে বলে, লানত তোদের ওপর। তোরা নিপাত যা।

ঘৃণা উদ্‌গিরণের এই অভিনব পন্থা সংক্রমিত করে অন্যদেরও। তারাও দলে দলে ছুটে যায় খালের কাছে আর থুতু নিক্ষেপ করে বলে, লানত তোদের ওপর। তোরা নিপাত যা।

হঠাৎ কেউ একজন থুতু নিক্ষেপ করতে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে, এটা পারভেজ না?

মুহূর্তে প্যারামিলিটারি সদস্যদের লাশের ভেতর এক কিশোরের মৃতদেহ ভেসে ওঠার সংবাদ চাউর হয়ে যায়। কেউ একজন ব্যথিত কণ্ঠে মন্তব্য করে, এটা তো রশিদের বেটা পারভেজ। কিন্তু সে কীভাবে মরল!

অপরজন আফসোস নিয়ে বলে, ছেলেটা নিশ্চয়ই কোনোভাবে গোলাগুলির ভেতর আটকা পড়েছিল।

একমুহূর্তের মধ্যে গেরিলা, প্যারামিলিটারি, বিজয়, সাফল্য— সবকিছুর ওপর প্রবল হয়ে ওঠে পারভেজ নামটি। পারভেজের কী হয়েছে, কী হয়েছে পারভেজের— বলতে বলতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ে আসে আতিকা, খালের পাড়ে। খালের কিনারায় ছোট ভাইয়ের রক্তাক্ত দেহ ভাসতে দেখে তার সংজ্ঞা হারানোর উপক্রম হয়। সে পানির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাইয়ের নিথর দেহখানা বুকের সাথে চেপে ধরে আহাজারি করতে থাকে। আদনান তখন আপেলবাগানে গেরিলাদের সাথে জরুরি বৈঠক করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় ভেসে আসে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। আহাজারিটা যে আতিকার, বুঝতে পারে আদনান। শফিকের মৃত্যুসংবাদে এভাবেই তো সে আহাজারি করে লুটিয়ে পড়েছিল ঈদগাহ মাঠে। নতুন করে আবার কী হলো অভাগী মেয়েটার। আতিকার বুকফাটা আর্তনাদ স্থির থাকতে দিল না আদনানকে। সবাইকে নিয়ে ও ছুটে গেল খালের পাড়ে। জলমগ্ন অবস্থায় এক রক্তাক্ত কিশোরকে জড়িয়ে ধরে আতিকাকে আর্তনাদ করতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল আদনান। একজন ওর কানের কাছে ফিসফিস করল, ওর ভাই। দুই পক্ষের গোলাগুলির ভেতর শহীদ হয়েছে সম্ভবত।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বিজয়ের এই অনাবিল আনন্দের মাঝে ভাইয়ের মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে বোনের কলজেচেরা আর্তনাদ বড় বেদনা হয়ে বেজে চলল আদনানের হৃদয়ে। কুদরত কেন দুঃখ দেওয়ার জন্য এই মেয়েটিকেই বেছে নিচ্ছে বারবার! আদনানের মনে পড়ল যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের মুহূর্তটি। নির্বিঘ্নে ও আপেলবাগানে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল আগামী দিনের যোদ্ধাদের। হঠাৎ ফায়ারের শব্দ হয়। তারপরই তো ওরা সতর্ক হওয়ার সুযোগ পায়। নয়তো আকস্মিক আক্রমণে ওরা সবাই বেঘোরে প্রাণ হারাত। সেই ফায়ারেই কি তবে শহীদ হয়েছে পারভেজ? প্যারামিলিটারি কেন কিশোর পারভেজকে বেছে নেবে গুলি করার জন্য? পারভেজ কি প্যারামিলিটারি আসার খবর দেওয়ার জন্য খাল পার হচ্ছিল? এ জন্যই কি ওরা বাধ্য হয়ে গুলি করেছে?

আদনান ধীরে ধীরে আতিকার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বড় ভাই যেভাবে শোকাকুল বোনের মাথায় স্নেহের হাত রাখে, একই মমতা নিয়ে আদনান হাত রাখে আতিকার মাথায়। ধরা গলায় বলে, পারভেজের জন্য কাঁদবে না, বোন। আমরা যা পারিনি, তা করে দেখিয়েছে পারভেজ। সাহসিকতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সে। ওর প্রাণের বদৌলতে আমরা প্রাণে বেঁচে গেছি। ওর জন্য তোমার গর্ব করা উচিত, আতিকা।

নাজনীনসহ কয়েকজন পড়শি আতিকাকে সামলায়। পারভেজের কিশোর দেহখানা খাল থেকে তুলে, যুদ্ধের ডামাডোলের কারণে, অতি দ্রুত আদনানদের আপেলবাগানে দাফন করা হয়। এপিটাফে লেখা হয় : এইখানে এক বেহেশতি কিশোর ঘুমায়, যার জীবন আমাদের জীবনকে রক্ষা করেছে।

উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এলে গেরিলাদের নিয়ে পরামর্শে বসে আদনান। আর্মিদের সবচেয়ে নিকবর্তী ক্যাম্প নাম্বুলে। অনুমান বলে, সেখান থেকেই তারা অভিযান পরিচালনা করতে এসেছিল। আজকের অভিযানে যতগুলো সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে, তাতে ধরেই নেওয়া যায়, ক্যাম্পের অর্ধেক সৈন্য নিহত হয়েছে। বাকি অর্ধেক নিশ্চয়ই বিজয় সংবাদ শোনার জন্য অপেক্ষায় আছে। এই অপ্রস্তুত অবস্থাতেই মৃত্যুদূত হয়ে অবতীর্ণ হতে হবে ওদের ধমনির ওপর।

সঙ্গী গেরিলারা ভেবেছিল যুদ্ধ শেষ। তারা অস্ত্র রেখে গা এলিয়ে অলস ভঙ্গিতে বসে ছিল আদনানের সামনে। এমন সময় আদনান নতুন যুদ্ধের ঘোষণা করলে সবাই নড়েচড়ে বসে। শুইয়ে রাখা অস্ত্র নতুন করে তারা হাতে তুলে নেয় এবং বলে, আমরা প্রস্তুত। তুমি শুধু বলো কী করতে হবে আমাদের। আদনান সবাইকে যুদ্ধ-পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেয়। বেসামরিক জনতা, তাদের মধ্যে আদনানের বাবা-মাও আছে, তারা বিস্ময়াভিভূত চোখে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

দেখে, যুদ্ধক্লান্ত গেরিলারা আবার জেগে উঠেছে সিংহের মতো আড়মোড়া ভেঙে। তারা আদনানের নেতৃত্বে খালের মধ্যে নেমে পড়ে। খালের অল্প জলে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা আর্মিদের শরীর থেকে পোশাক খুলে নেয় এবং অস্বাভাবিক দ্রুততায় সেই পোশাক নিজেদের শরীরে চড়ায়। এখন আর দেখে বোঝার উপায় নেই তারা জেকেএলএফ সদস্য নাকি প্যারামিলিটারি। প্যারামিলিটারির ছদ্মবেশধারী আদনানরা ঝটপট খালের ওপারে গিয়ে সামরিক ট্রাকে চড়ে বসে। আদনানের নির্দেশে ড্রাইভিং সিটের দখল নেয় শমসের। নাম্বুলের উদ্দেশে গ্রামের সরু পথ ভাঙতে থাকে ট্রাক। হঠাৎ দেখায় মনে হবে, সফল অভিযান শেষ করে প্রফুল্ল চিত্তে ক্যাম্পে ফিরছে প্যারামিলিটারি ট্রাক।

নাম্বুলের ক্যাম্পে বাইশ জন প্যারামিলিটারি সদস্য উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছিল অভিযানে অংশ নেওয়া সৈন্যদের ফিরে আসার। একটি প্রাইমারি স্কুলের পরিত্যক্ত অংশে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী এই ক্যাম্পটি। ক্যাম্পের মাথার ওপর দিন কি রাত, পতপত করে ওড়ে ভারতীয় নিশান। প্রবেশপথের দুপাশে বালুর বস্তার প্রাচীর। দুই বস্তার ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে থাকে অনেকগুলো মেশিনগানের নল। দুজন অস্ত্রধারী সব সময় ক্যাম্পের প্রবেশমুখে পালাক্রমে পায়চারি করে। পথচারীরা কয়েকটি কুকুরকে প্রায়ই অলস ভঙ্গিতে শুয়ে থাকতে দেখে বালুর বস্তার গা ঘেঁষে। জায়গাটি যে খুবই ভয়ংকর, কুকুরগুলোর নির্বিকার ভঙ্গি দেখে বোঝার উপায় নেই।

সূর্যের গায়ে পাকা আপেলের মতো লাল রং ধরেছে। যেকোনো সময় টুপ করে ঝরে পড়তে পারে ওই পাকা সূর্যটা। সারা দিন বাতাস বইছিল। বিকেলের পর থেকেই কেমন স্তব্ধ হয়ে আছে চারপাশ। বাতাসের অভাবে সারা দিন প্রবল প্রতাপে উড়তে থাকা নিশানটি নেতিয়ে পড়েছে। যে দুজন পাহারায় নিয়োজিত ছিল, তারা স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে পায়চারি করে আর একটু পরপর সামনের পিচঢালা কালো রাস্তার দিকে তাকায়, যে রাস্তাটি কয়েক মাইল দূরে গিয়ে একটি পর্বতের কোল ঘেঁষে অনন্তনাগের দিকে চলে গেছে।

তারা এখনো ফিরছে না কেন? অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রথম পাহারাদার বলে। তার গলার স্বরে দুশ্চিন্তা।

ফিরবে ফিরবে। সবগুলো জঙ্গিকে কুপোকাত করে ফিরতে একটু সময় তো লাগবেই।

ওই তো, ওরা আসছে। চিৎকার করে ওঠে প্রথমজন। তার চোখেমুখে উচ্ছ্বাস। প্রথমজনের অনুসরণে দ্বিতীয়জন রাস্তার দিকে তাকায়। সবুজ পর্বতের ক্যানভাসে ভেসে উঠতে দেখা যায় জলপাই রঙের ট্রাক। যেন এই

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

মুহূর্তে পর্বত ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ট্রাকটি। বালুর প্রাচীরের ওপাশে কয়েকটি হেলমেটকে নড়েচড়ে উঠতে দেখা যায়। ক্যাপ্টেনের ফিরে আসাকে উদ্‌যাপন করতে ফাঁকা গুলি ছোড়ে এক হেলমেটধারী। দুপুর থেকে উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন পার করছিল তারা। বিশেষত, বিকেলের পর থেকে ওয়্যারলেস-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তাদের দুশ্চিন্তা দ্বিগুণ হয়েছিল। নেটওয়ার্কজনিত কোনো সমস্যা ভেবে তারা নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েছিল এবং অপেক্ষা করছিল সুসংবাদ শোনার। অবশেষে তাদের অপেক্ষার অবসান হলো। ফিরে আসছেন ক্যাপ্টেন বিজয়ী সৈন্যদের নিয়ে। ট্রাকের গতিই বলে দিচ্ছে যুদ্ধফেরত সৈন্যরা বিজয়ের গৌরবে উজ্জীবিত হয়ে আছে। আজকের রাত হবে মৌজ-মাস্তির রাত।

ট্রাকটি আরো কাছাকাছি হলে বিজয়ী সৈন্যদের বরণ করে নিতে কয়েকজন সৈনিক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায় প্রবেশপথে। হাত তুলে তারা অভিবাদন জানায়। জবাবে গাড়ির ভেতর থেকেও বেরিয়ে আসে হাত। কিন্তু সেই হাতে অভিবাদন নয়, আপেলের মতো থোকা থোকা গ্রেনেড। সৈনিকেরা স্বপ্নেও ভাবেনি কী ঘটতে চলেছে। আদনানরা ট্রাকের ভেতর থেকে একযোগে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। আবাবিল পাখির মতো উড়তে উড়তে সেই ঝাঁকবদ্ধ গ্রেনেড গিয়ে পতিত হয় নব্য-আবরাহার আস্তানার ওপর। মুহূর্তে অ্যাকশনধর্মী বলিউড সিনেমার শুটিং স্পটে পরিণত হয় ক্যাম্পটি। বিস্ফোরণের মুহুর্মুহু শব্দে ফেটে পড়ে গোটা এলাকা। সৈন্যদের অগ্নিদগ্ধ দেহ আকাশে উত্থিত হয়ে আবার ছিটকে পড়ে মাটিতে। সন্ধ্যার আকাশ সত্যিকার আগুনের লেলিহান শিখায় রক্তিম হয়ে ওঠে।

সূর্য ডুবতে ডুবতে ক্যাম্পটাকে পুরোপুরি দখলে নিয়ে নেয় জেকেএলএফ সদস্যরা। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে অগ্নিদগ্ধ, বিক্ষত সৈনিকদের লাশ পড়ে থাকে যত্রতত্র। আদনান ভারতীয় পতাকা নামিয়ে উড়িয়ে দেয় কাশ্মীরিদের নিজস্ব পতাকা। উড়তে থাকা ওই পতাকার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ সজল হয়ে ওঠে। ও বিড়বিড় করে— গোটা কাশ্মীর দখলদারমুক্ত করতে না পারলেও এই একটি ক্যাম্প আমরা দখলদার মুক্ত করেছি। আল্লাহ, তুমি আমাদের সহায় হও। নবীজি, আমাদের সঙ্গে থাকো।

জীবিত সৈন্যের খোঁজে গেরিলারা পুরো ক্যাম্প তন্ন তন্ন করে ফেলে। তবু কোনো জীবিত সৈন্যের অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর না হলে ওদের যুদ্ধের উত্তেজনা শেষ হয়। তখন নতুন এক প্রাপ্তির আনন্দ ঝলমলিয়ে ওঠে ওদের চেহারায়। এই অভিযান যে বিপুল পরিমাণ উন্নত মানের অস্ত্রের মালিক বানিয়ে দিতে পারে, মাথাতেই ছিল না ওদের। যুদ্ধের ডামাডোল শেষে ক্লান্ত শরীরে ওরা যে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

যার জায়গায় বসে বিশ্রাম নিতে গেলে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে দুই গেরিলা— এত অস্ত্র!

শ্রান্তি ভাঙে সবার। শব্দের উৎসের কাছে ছুটে যায় সবাই আর নিজেদেরকে আবিষ্কার করে গুপ্তধনের সামনে। উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে হাঁটতে ওদের পথ আচমকা কোনো এক স্বর্ণের খনির সামনে থেমে গেলে এর প্রতিক্রিয়া কী হতো, জানা নেই। তবে এই মুহূর্তে ওদের চোখেমুখে পল্লবিত খুশির ঝলকানি বলে দেয়, এই প্রাপ্তি ওদের প্রত্যাশারও অধিক। ওদের খুশির কারণ একটাই— মুফতে পাওয়া অস্ত্র দিয়ে ওরা আরো বড় বড় অপারেশন পরিচালনা করতে পারবে। ভবিষ্যতের আশায় ওরা মহানন্দে অস্ত্রগুলো জড়ো করতে শুরু করে। কেউ কেউ গুনগুন করে গানও গায়। এক গেরিলা বলে, এমন ভারী অস্ত্র সঙ্গে থাকলে পৃথিবীর যেকোনো শক্তিকেই পরাভূত করা সম্ভব। আদনান গেরিলাটির কাঁধে হাত রেখে বলে, শুধু ভারী অস্ত্র হলেই পৃথিবী জয় করা যায় না। অস্ত্রের সাথে চাই সাহস আর দেশপ্রেম। যেটা আমাদের আছে।

কোন ফাঁকে যে সূর্য পুরোপুরি অস্ত যায়, টেরটিও পায় না ওরা। ওদের মগ্নতা ভাঙে তখন, যখন বালুর বস্তার ওপর দাঁড়িয়ে দরাজ গলায় আজান শুরু করে ইমতিয়াজ। আর্মি ক্যাম্পে আজান— উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে একজন। আজ সবার কী যে হয়, নিয়মিত নামাজিদের সাথে অনিয়মিত নামাজিরাও অজু করে জামাতে শামিল হয়। বালকবেলার মক্তবের বিদ্যাকে পুঁজি করে ইমামতিতে দাঁড়ায় আদনান। আজ ওর এত কান্না আসে, এত বেদনা জাগে, অবরুদ্ধ আবেগে বুক ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। নামাজে শুধু আল্লাহকেই স্মরণ করা নিয়ম অথচ নামাজের পুরোটা সময় ওর হৃদয়ে জেগে থাকে নূরজাহানের স্মৃতি। ওর খুব ইচ্ছা করে নূরজাহানের সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলতে, আমি প্রতিশোধ নিয়েছি। তোর সম্ভ্রমের প্রতিশোধ নিয়েছি, নূরী।

ঝোপের ভেতরের শিয়ালটি এখনো নড়ছে। আদনান থমকে দাঁড়িয়ে সরু চোখে শিয়ালটিকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। শিয়ালটি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালে তা এক মানবীর রূপ ধারণ করে। বিস্ময়াভিভূত আদনানের দুচোখ বড় বড় হয়ে যায় সেই ভৌতিক দৃশ্য দেখে। ও এমনভাবে কেঁপে ওঠে অথবা নড়ে ওঠে, ফারগাছটি ওকে আড়াল করে রাখতে ব্যর্থ হয়। তবু ও মেয়েটির চোখে ধরা পড়ে না, কারণ, মেয়েটির পূর্ণ মনোযোগ তখন স্কুলের দেয়ালের ওপর। সঙ্গের ব্যাগ থেকে রংতুলি বের করে সে দেয়ালের গায়ে কী সব

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আঁকতে শুরু করেছে। কৌতূহলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় আদনানের। এই নিস্তব্ধ রাতে একাকী এক মেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেয়ালের গায়ে কী অঙ্কন করে চলেছে! পায়ের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারায় আদনান। ওর নির্দেশ কিংবা অনুমতির তোয়াক্কা না করেই চলতে শুরু করে ওর পা, মেয়েটির উদ্দেশে। মেয়েটির মগ্নতা ভাঙার কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই হুঁশ হয় আদনানের। নিজেকে ঝোপের ভেতর চালান করে দিয়ে ও দেখতে থাকে মেয়েটির কর্মকাণ্ড। আকাশে পিতলের থালার মতো ঠান্ডা ও গোলগাল এক চাঁদ। তারই বিচ্ছুরিত আলোয় মেয়েটির হলুদ পিরহান ও গোলাপি ওড়না কেমন চকচক করছে। বাতাসের ঝাপটায় সরসর শব্দ তুলছে ফারগাছের পাতা। একটা উল্কাপিণ্ড খসে পড়তে পড়তে অদৃশ্য হয়ে যায় অজানা কোনো লোকে। রহস্যময় এই মেয়ের শেষ না দেখে ছাড়বে না আদনান, যদিও জরুরি এক কাজে পথে নেমেছে ও। স্কুলের পেছনের এই রাস্তাটাই নূরজাহানের শ্বশুরবাড়ির দিকে গেছে। একটুও আগেও ওর একমাত্র গন্তব্য ছিল নূরজাহান। কিন্তু পথের মাঝে উদিত হওয়া অপার রহস্যময় এই মেয়েটি ওর গন্তব্য বদলে দিয়েছে। শত বেদনার মাঝেও ক্ষুদ্র এক অর্জনের ঘটনা ঘটেছে কাশ্মীরিদের জীবনে। পরপর পরিচালিত কয়েকটি অভিযানে আদনানরা পঞ্চাশের অধিক ভারতীয় সেনাকে হত্যা করেছে। গেরিলাদের এই সাফল্যে জনজীবনে জেগেছে আনন্দের জোয়ার। ঘরে, বাইরে, চায়ের দোকানে কিংবা মসজিদ চত্বরে— সবখানে শুধু যুদ্ধের গল্প। যোদ্ধাদের কাছে তাদের প্রত্যাশাও বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। আজাদির সন্তানগুলো জীবন হাতে নিয়ে এভাবে লড়ে গেলে মুক্তি একদিন আসবেই। মিডিয়ায় আঞ্চলিক কমান্ডার হিসেবে আদনানের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। পেহেলগাম, অনন্তনাগ, পুলওয়ামার ঘরে ঘরে উচ্চারিত হচ্ছে আদনানের নাম। ভারতঘেঁষা এক পত্রিকা অনুমানের ভিত্তিতে আদনানের এক ভুয়া কার্টুন ছেপেছে। ভুয়া সেই কার্টুন দেখে বন্ধুদের সে কী হাসাহাসি! সেই কার্টুন না আদনানের হয়েছে, না তাদের পরিচিত কোনো গেরিলার। প্রতিযোগিতার মানসিকতা থেকে ভুলভাল নিউজ করে জনগণকে এভাবেই বিভ্রান্ত করে মিডিয়া।

যে যুদ্ধ কাশ্মীরিদের উৎকণ্ঠাময় জীবনে স্বস্তির বাতাস বইয়ে দিয়েছে, সেই যুদ্ধের ছাট কি লাগছে নূরজাহানের গায়ে? বুকের ওপর অপরাধবোধ ও গ্লানির যে পাহাড় দাঁড়িয়ে ছিল অনেক দিন ধরে, তা সরানোর জন্য যুদ্ধটার বড় প্রয়োজন ছিল। আদনান আজ কিছুটা হলেও গ্লানিমুক্ত। ওর নত মাথা আজ কিঞ্চিৎ হলেও উঁচু হবে বোনের সামনে। আজ ও চিৎকার করে দিতে পারবে নূরজাহানের সম্ভ্রমের বদলা নেওয়ার সুখবর। বদলার এই খবরটুকু

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পৌঁছানোর জন্যই পথ চলেছে আদনান। কিন্তু মাঝপথে এক তরুণীর গোলকধাঁধায় পড়ে ওর গন্তব্য দুই ভাগ হয়ে যায়। ও সিদ্ধান্ত নেয়, এই তরুণীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করে তবেই ও পথ চলবে নূরজাহানের উদ্দেশে। এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে সময় গড়িয়ে যায়, বুঝতে পারে না আদনান। ততক্ষণে স্কুলের দেয়ালের গায়ে এক মানবমুখের ছবি অঙ্কিত হয়ে গেছে— মকবুল ভাট। ব্যাকব্রাশ চুল। ঘন কালো গোঁফ। আত্মবিশ্বাসী চোয়াল। অভিমানী চোখ। নিচে লেখা : আজাদি। লানত হিন্দুস্তান।

মুক্তিসংগ্রামের গায়ে নতুন এক পালক যুক্ত হয়েছে কাশ্মীরে— গ্রাফিতি। যারা আঁকতে পারে, তারা গভীর রাতে পুলিশ, প্যারামিলিটারির চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রতিবাদী গ্রাফিতি এঁকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ গ্রাফিতিতে শোভা পাচ্ছে মকবুল ভাটের ছবি। বিশেষত, শ্রীনগরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও দেয়াল ছেয়ে যাচ্ছে প্রতিবাদী গ্রাফিতিতে। যদিও ভোর হতেই সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের উদ্যোগে মুছে ফেলা হচ্ছে সেই সব গ্রাফিতি। কিন্তু পরের রাতে, ভিন্ন কোনো দেয়ালে, ভিন্ন কোনো শিল্পীর হাতে প্রাণ পাচ্ছে কাশ্মীরিদের অনুপ্রেরণার প্রতীক মকবুল ভাটের মুখাবয়ব। সেই রাতে, চাঁদের আলোয় বসে, হিম হিম বাতাসের প্লাবনে আদনানের হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে ওঠে। আজাদির জন্য যুদ্ধ গৃহ নির্মাণের মতো ব্যাপার। একটি গৃহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে আসে ইট-বালু-সিমেন্ট-রড-কাঠ। প্রত্যেকটির উৎস ভিন্ন, কাজের উপযোগিতাও ভিন্ন। তবু সবাই একসাথে হয় একটি লক্ষ্য পূরণের জন্য। সেই লক্ষ্য— একটি নিরাপদ আবাস নির্মাণ। যেখানে নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায় বসবাস করবে গৃহকর্তা। আজাদির জন্য আদনান সরাসরি অস্ত্র ধরেছে। কেউ পত্রিকায় কলাম লিখে আজাদির পক্ষে জনমত তৈরি করছে। কেউ গজল বেঁধে গণমানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে। কেউবা গ্রাফিতি এঁকে প্রতিবাদের মিছিলে শামিল হচ্ছে। প্রত্যেকের কাজের জায়গা ভিন্ন; কিন্তু উদ্দেশ্য এক— মুক্ত-স্বাধীন কাশ্মীর নির্মাণ। সেই বিবেচনায় এরা প্রত্যেকেই যোদ্ধা, আজাদির পক্ষের অগ্রগণ্য সেনানী।

প্রথম দেয়ালের গ্রাফিতি অঙ্কন শেষ করে মেয়েটি দ্বিতীয় দেয়ালের কাছে যায়। ঋজু ভঙ্গিতে চারপাশ দেখে নিয়ে ব্যাগ থেকে বের করে নতুন রংতুলি। এই গভীর রাতে একটি মেয়ের একাকী বাইরে বের হওয়াই দুঃসাহসের ব্যাপার। তার ওপর সে গ্রাফিতি একে রাষ্ট্রদ্রোহ কাজ করে চলেছে। শুধু রাতজনিত ভীতিই নয়, প্যারামিলিটারির ভয়ও তাকে কম্পিত করবার কথা। অথচ সে নির্বিকার, নিরুদ্বিগ্ন; উত্থিত তরবারির মতো অনমনীয়। তরুণীর সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে যায় আদনান। এক মুঠো মাটি তুলে সে নাকের সামনে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ধরে। চোখ বন্ধ করে মাটির গায়ের গন্ধ শোঁকে। তারপর মাটির উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলে, যে মাটির বুকে এমন সাহসী নারীর জন্ম হয়, সেই মাটিকে আমি ঈর্ষা করি। হে মাটি, তোমায় সালাম।

দেয়ালের গায়ে তুলির শেষ টানের মাধ্যমে পরের গ্রাফিতিও শেষ হয় অল্প সময়ের মধ্যে। আঁকাআঁকিতে মেয়েটি যে খুবই দক্ষ, সন্দেহ নেই। সে এখন দ্রুত হাতে রংতুলি ব্যাগে ভরছে। মেয়েটি একটু বাঁ পাশে সরতেই চাঁদের আলোয় পূর্ণ দেয়াল আদনানের চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। অমনি থরথর করে কেঁপে ওঠে ওর সমস্ত সত্তা। দ্বিতীয় দেয়ালের গায়ে এক তরুণের প্রতীকী ছবি, তার নিচে লেখা : আদনান ফাইয়াজ, তুমি আমাদের প্রেরণা। আজাদি, জিন্দাবাদ।

নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারায় আদনান। রহিত হয়ে যায় চিন্তা করার ক্ষমতা। এখানে ও কী করছে, কোথায়ই-বা যাবে, ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হয় ও। ততক্ষণে মেয়েটি পথ চলতে শুরু করেছে। ঝোপের পাশ দিয়েই তার পথ, একটু পর সে মেয়েটির হাতে ধরা পড়ে যেতে পারে, অনুভূতিশূন্য আদনানকে সেসবের কিছুই বিচলিত করে না। ও শুধু অপলক চোখে চেয়ে থাকে নক্ষত্রের মতো পাশাপাশি ফুটে থাকা গ্রাফিতি দুটোর দিকে। একটিতে মকবুল ভাট আর একটিতে সে। এক তরুণীর ভালোবাসার আঁচড়ে স্বপ্নের নায়ক মকবুল ভাটের সমান্তরালে উঠে আসার আনন্দ ওকে বিবশ করে ফেলে।

কে! কে ওখানে? নিস্তব্ধ রাত ঝনঝন করে বেজে ওঠে মেয়েটির কণ্ঠে। ভয়ের মৃদু কম্পনও কি ছলকে পড়ে না ওই কণ্ঠ বেয়ে?

আদনান নিশ্চুপ।

কী হলো, কথা বলছেন না কেন! মেয়েটি সাহস ধরে রাখার শেষ চেষ্টা করে।

আদনান তবু নিশ্চুপ।

মেয়েটির রংতুলির ব্যাগ থেকে এবার বেরিয়ে আসে এক ছোরা, চাঁদের আলোয় ঝিলিক দিয়ে ওঠে তার ধার এবং আদনানের ভাবলেশহীন চোখে লাগে তার ঝলক। এবার তন্ময়তা ভাঙে আদনানের। হারিয়ে ফেলা সত্তাকে পুনরুদ্ধার করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় ও। মুখে বলে, আমি এক পথিক।

ছোরা শাণিয়ে ধরে মেয়েটি এবার কঠোর কণ্ঠে বলে, আর এক পা যদি অগ্রসর হন, তবে এই ছোরা আপনার কলিজার ভেতর সেঁধিয়ে দেব। আপনি এখানে কী করছেন?

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে আদনান। মকবুল ভাটের পাশে নিজের গ্রাফিতি দেখার যে অপার বিস্ময়, ততক্ষণে তা হজম করে ফেলেছে ও। দুই কদম এগিয়ে এসে খানিকটা সরস ভঙ্গিতে ও বলে, আপনার গ্রাফিতি আঁকা দেখছি। আপনার আঁকার হাত চমৎকার।

সকাল হলেই শত শত মানুষ এটা দেখতে পাবে। গ্রাফিতি দেখাই যদি আপনার উদ্দেশ্য হবে, তবে রাতের বেলা কেন পিছু নিয়েছেন? আপনি কি সরকারের গোয়েন্দা? দেখুন, গোয়েন্দা হোন আর যা-ই হোন, আমি ওসবে পরোয়া করি না।

আদনানের একবার ইচ্ছা করে পরিচয় উন্মুক্ত করে মেয়েটিকে হতভম্ব করে দেয় : আমি সেই যুবক, যার গ্রাফিতি আঁকবার জন্য তুমি এই কুহকী রাতে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছ। কিন্তু পরিচয় প্রকাশ করে না ও। যে গেরিলার নাম পত্রিকায় ছাপা হয়, যার জানের বদলে পুরস্কার ঘোষিত হয়, তাকে যত্রতত্র পরিচয় দিলে চলে না। তাতে জীবনের ঝুঁকিই বাড়ে শুধু। যদিও গ্রাফিতিটি বলছে, এই মেয়ে ওর সহযোদ্ধা এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। দুজনের চিন্তা ও আদর্শ অভিন্ন। তবু পরিচয় প্রকাশে ও সতর্কতা অবলম্বন করে।

কী হলো! কথা বলছেন না কেন! কে আপনি?

ঝোপের ভেতর থেকে এবার পুরোপুরি বেরিয়ে আসে আদনান। পিরহানের নিচে কালাশনিকভ লুকিয়ে রেখে বলে, দেওয়ার মতো পরিচয় আমার নেই। আগেই বলেছি, আমি এক পথিক। আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছি। পথিমধ্যে আপনার গ্রাফিতি আঁকা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। অনুমতি ছাড়া আপনার কাজ দেখে ফেলায় ক্ষমা চাচ্ছি। গোটা কাশ্মীরজুড়ে আজাদির যে ঢেউ জেগেছে, আপনার গ্রাফিতিও সেই ঢেউয়ে শামিল হোক, অভিঘাত তুলুক, জালিমের সিংহাসন নাড়িয়ে দিক, এই দোয়া করি। এবার আসি। আর হ্যাঁ, জায়গাটা নিরাপদ নয়। যত দ্রুত ঘরে ফিরে যাবেন, ততই আপনার জন্য মঙ্গল। যন্ত্রের মতো কথাগুলো বলে আদনান হাঁটতে শুরু করে আর মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকে হতবুদ্ধ হয়ে। শুরুতে সে আদনানকে চোর-ডাকু ভেবেছিল। চোর-ডাকু না হলেও সে যে ইখওয়ানি গ্রুপের কোনো গোয়েন্দা, এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ, এই দুঃসময়ে রাত্রিবেলা চোর-ডাকু কিংবা সরকারি সুবিধা পাওয়া বখাটেরা ছাড়া কেউ বাইরে থাকে না। কিন্তু এ যুবক তার অনুমিত সকল সম্ভাবনাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তার চেহারায় না আছে চোর-ডাকাতের ছাপ, না তার কথার স্বরে আছে গাদ্দারির দুর্গন্ধ।

শুনুন। পেছন থেকে ডাক দেয় মেয়েটি।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আদনান জানত রহস্যের যে প্রহেলিকা ও ছড়িয়ে দিয়েছে, ডাক আসবে। ডাক আসেই। ও থামল। পেছন ফিরে বলল, বলুন।

আমি নিশ্চিত, আপনি সাধারণ কোনো পথিক নন। কাশ্মীরে এমন কোনো সুখের সুবিমল বাতাস বইছে না যে রাত করে কেউ আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে যাবে। এখন তো সময় দুয়ার আটকে রেখে প্রহর গোনার : কখন অবসান হবে এই রুদ্ধদিনের! আপনি কি জেকেএলএফ সদস্য?

কী করে বুঝলেন?

পিরহানের নিচে লুকিয়ে রাখা কালাশনিকভ দেখে।

আপনার নাম?

উম্মে খাদিজা।

বাড়ি কোথায়?

কোকোরনাগ।

আরে, আমিও তো ওখানেই যাচ্ছি। মেয়েটির বাড়ি আর নিজের গন্তব্য অভিন্ন হওয়ায় উচ্ছ্বাস ধরে রাখতে পারে না আদনান।

উম্মে খাদিজা মাথার ওপর ওড়না তুলে ধীরপায়ে এগিয়ে আসে আদনানের কাছে। বলে, কোকোরনাগ কি সত্যি আপনার আত্মীয় বাড়ি, নাকি বিশেষ কোনো অভিযানের মতলব আছে?

কোকোরনাগে আমার বোনের বিয়ে হয়েছে। ওকে দেখতে যাচ্ছি। ওর স্বামীর নাম আহমদ। আহমদ মির। আপনি চেনেন?

এবার বিষাদে ছেয়ে যায় উম্মে খাদিজার মুখ। সেই বিষাদে নেই কোনো লোকদেখানোর ভান। সে বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, আহমদ আমার চাচাতো ভাই। নূরজাহানকে আমি ভাবি বলে ডাকি। ভাবির মতো দুর্ভাগ্য নিয়ে আর কোনো নারী যেন পৃথিবীতে না আসে।

মেয়েটি নূরজাহানের পরিচিত বলে আদনানের আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। ও সরু গলায় জিজ্ঞেস করে, কেমন আছে আমার বোন?

ভালো নেই সে। সারাক্ষণ সংসারের কাজ নিয়ে পড়ে থাকে, কিন্তু আহমদ ভাই ছাড়া কারো সাথে কথা বলে না। হঠাৎ দেখায় মনে হয়, সে এক বোবা নারী, যার কণ্ঠে কোনো ভাষা নেই। ভাষা নেই যার হৃদয়েও। একটা মানুষ কথা না বলে কীভাবে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে! আপনি যাচ্ছেন। হয়তো আপনাকে দেখে সে স্বাভাবিক হবে।

প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম, শিগগিরই সে আঘাত কাটিয়ে উঠবে। কিন্তু সেই ঘটনার পর তো অনেক দিন চলে গেল। এখনো সে আগের মতোই আছে। মাঝে কয়েকবার আমার বাবা-মা এসেছিল। বাবা-মার সাথেও সে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কথা বলেনি। হয়তো সে আর কোনো দিনই স্বাভাবিক হবে না। শেষের দিকে আদনানের স্বর কেমন আর্দ্র হয়ে ওঠে।

মহল্লার সবাই আহমদ ভাইকে আরেকটা শাদির কথা বলে। এমনকি চাচা-চাচিও। ভাবি এই জায়গায় ভাগ্যবান যে তিনি একজন মহৎ স্বামী পেয়েছেন। দ্বিতীয় শাদির কথা শুনলেই আহমদ ভাই রেগে যান। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, ভাবির সাথেই বাকিটা জীবন কাটাবেন। বলতে গেলে একাই তিনি ভাবিকে আগলে রেখেছেন। স্বামীটা অন্য রকম হলে ভাবির কষ্টের আর সীমা থাকত না।

আমি আপনার দুঃসাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তবে দুঃসাহস সব সময় ভালো নয়। আমার বোনটা আপনার মতো দুঃসাহসী হলে এত দিনে সে আত্মঘাতী কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলত। সামনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কথাটা বলে আদনান। রাত গভীর হচ্ছে। এখানে কালক্ষেপণ করা নিরাপদ হবে না।

কী এমন দুঃসাহস দেখলেন! উম্মে খাদিজাও আদনানের সাথে পা মেলায়।

এই যে লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রাফিতি এঁকে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। একে তো পুলিশ-মিলিটারির ভয়, তার ওপর আছে রাতের ভয়।

আপনারা অস্ত্র হাতে রণাঙ্গনে লড়াই করছেন, সেই তুলনায় এ তো কিছুই নয়।

এটাও অনেক বড় যুদ্ধ। আপনাদের আঁকা এই গ্রাফিতি পুলিশের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। বেশ কিছুদিন হলো শ্রীনগর যাওয়া হওয়া না। সেখানেও নাকি যুদ্ধের নতুন এক দ্যোতনা তৈরি করেছে এই গ্রাফিতি। পুলিশ গ্রাফিতিশিল্পীদের ধরার জন্য নাকি উঠেপড়ে লেগেছে। সে জন্যই বললাম, এটা অনেক বড় দুঃসাহসের কাজ।

হঠাৎ স্কুলের দেয়ালের পেছনে মানুষের ছায়া দেখে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে আদনান। উম্মে খাদিজাকে হ্যাঁচকা টানে এক গাছের আড়ালে নিয়ে গিয়ে অস্ত্র বের করে ও। মানবছায়ার দিকে নিশানা ঠিক করে উম্মে খাদিজাকে চুপ থাকতে ইশারা করে। কিন্তু উম্মে খাদিজা চুপ থাকে না। ও হড়বড় করে বলে, কী হলো! কী করছেন!

আদনান ফিসফিস করে বলে, দেয়ালের পেছনে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলোয় তার ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

আদনানকে বিস্ময়ের চূড়ান্তে পৌঁছে কাচভাঙা হাসিতে গড়িয়ে পড়ে উম্মে খাদিজা।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আপনি হাসছেন যে!

হোসাইন, বেরিয়ে আয়। এখনো ক্রমাগত হাসছে মেয়েটা। ওড়নায় মুখচাপা দিয়ে হাসতে হাসতে সে বলে, আপনার অস্ত্রটা নামান এবার। ও আমার ছোট ভাই। গ্রাফিতি আঁকার জন্য শুরুতে একাই বের হয়েছিলাম, লুকিয়ে। কিন্তু বাড়ির আঙিনা পার হতেই ভূতের ভয় করতে লাগল। গাছের মাথায় কিংবা পায়ের তলায় সরসর শব্দ হয় আর আঁতকে আঁতকে উঠি। পুলিশ-আর্মি না, ভূতের ভয়ই আমাকে কাবু করে ফেলল। তখন আর কী করি, হোসাইনকে সাথে আনলাম আর দেয়ালের ওপাশে লুকিয়ে রাখলাম। যেন পুলিশ এলে আমাকে একাই খুঁজে পায় আর ও নিরাপদ থাকে। উম্মে খাদিজার বিবরণ শেষ হতে হতে হোসাইন চলে আসে ওদের কাছে। বারো-তেরো বছরের কিশোর। চোখে-মুখে ফুটে আছে উৎকণ্ঠা ও কৌতূহল। বেহেনজি, কে ইনি?

পরে বলব। এখন বাড়ি চল।

তোমার কাজ শেষ?

হ্যাঁ।

ওরা তিনজন কোকোরনাগের উদ্দেশে হাঁটতে থাকে। চাঁদের আলোয় পথের ওপর গাছের ছায়ার আলপনা ছড়ানো। ওরা অলক্ষ্যে প্রকৃতির সেই আলপনা মাড়িয়ে চলে যায়। রাস্তার দুপাশে একটু পরপর কাঠের পুরোনো বাড়ি। কোনোটা একতলা, কোনোটা দোতলা। প্রত্যেকটা বাড়ির টিনের ছাদ এক দিকে ঢালু, যেন শীত মৌসুমে সহজেই তুষার গড়িয়ে পড়তে পারে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় দুটো নিশাচর পাখি। ঝোপের ভেতর থেকে ব্যাঙের ডাক আর ঝিঁঝি পোকার কোলাহল ভেসে আসে। ঝিরিঝিরি ঠান্ডা বাতাস বয়। রাতের মিহিন হাওয়ায় দুলতে থাকে গুল্মলতা। সে হাওয়ায় উড়তে থাকে উম্মে খাদিজার বেয়াড়া চুল।

আপনি গ্রামেই থাকেন? উড়তে থাকা চুলের পালক কানের পাশে গুঁজে ওড়না ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস করে উম্মে খাদিজা।

না। শ্রীনগর থাকতাম। যুদ্ধটা এসে সাজানো জীবন লন্ডভন্ড করে দিল। অনেক দিন ধরে গ্রামে আছি। এলাকার যুবকদের যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়েছি। সম্প্রতি নাম্বুলের একটা ক্যাম্প আমরা দখল করেছি। এখন সেখানেই থাকি আর এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করি।

আপনি নাম্বুলজয়ী গেরিলা! আপনাদের নিয়ে পত্রিকায় অনেক নিউজ হয়েছে। আপনি আদনান ফাইয়াজকে চেনেন? উম্মে খাদিজার চোখমুখ বেয়ে উপচে পড়া উচ্ছ্বাসের ছটা এই রাতের বেলায়ও দেখতে পায় আদনান।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

মেয়েটির প্রশ্ন ওকে একই সাথে উত্তেজিত এবং সতর্ক করে। উত্তেজনা গোপন করে ও স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, চিনি। আমাদের কমান্ডার।

অনেক বড় যোদ্ধা তিনি। পেহেলগামের গর্ব। আপনি হয়তো খেয়াল করেছেন, আমার দ্বিতীয় গ্রাফিতিটা তাকে নিয়েই।

হ্যাঁ, দেখেছি। দেখা হলে আদনান ভাইকে জানাব। তিনি খুশি হবেন।

আপনি শ্রীনগর থাকতেন বললেন। ওখানে কী করতেন?

কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম।

আপনি কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র!

হ্যাঁ। কেন?

আমিও ওখানে পড়ি, ফাইন আর্টসে। ফার্স্ট ইয়ারে।

ফার্স্ট ইয়ার বলেই দেখা হয়নি আপনার সাথে।

তাই হবে হয়তো।

তার মানে শ্রীনগরের দেয়ালে দেয়ালে যারা মকবুল ভাটের ছবি এঁকে দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী যুদ্ধে শামিল হয়েছে, আপনিও তাদের একজন?

হ্যাঁ। সলজ্জ ভঙ্গিতে বলে উম্মে খাদিজা। ঝোলানো ব্যাগটাকে কাঁধবদল করে সে আবার বলে, কদিন হলো ছুটিতে এসেছি। ভাবলাম, এই নিশুপ্ত গ্রামেও প্রতিবাদের চিহ্ন রেখে যাই।

আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন, নিরাপদে রাখুন।

আল্লাহ আপনাকেও নিরাপদ রাখুন।

যাত্রার শুরু থেকে যে শঙ্কাটা বুকে বয়ে এনেছিল আদনান, সেই শঙ্কাই সত্য হয়। নূরজাহান কথা বলে না। কিছুতেই বলে না। সারা পাড়া তখন ঘুমিয়ে ছিল। উম্মে খাদিজা ও হোসাইন মিলে ডেকে তোলে নূরজাহান ও তার স্বামীকে। এই গভীর রাতে স্ত্রীর ভাইকে দেখে যতটা বিস্মিত হওয়ার কথা ছিল আহমদের, ততটা বিস্মিত হয় না সে। আদনান যুদ্ধে নাম লিখিয়েছে, জানে সে। আর রাতই যে যোদ্ধাদের বিচরণের উপযুক্ত সময়, এটাও জানে সে। আর এ কারণেই বিস্মিত না হয়ে মৃদু কুশল বিনিময়ের পর সে শ্বশুরবাড়ির নিকটাত্মীয়কে বসতে দেয় মেহমানখানায়। উম্মে খাদিজা ভাবি ভাবি বলে ছুটে যায় নূরজাহানের ঘরে। কিন্তু ননদের উচ্ছ্বাসের বিপরীতে নূরজাহানের ঘরে প্রতি-উচ্ছ্বাসের কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না। উচ্ছ্বাস দূরে থাক, নূরজাহান কাপড়ের পুঁটলির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে বিছানার ওপর।

উম্মে খাদিজা নূরজাহানের হাত ধরে নিয়ে আসে মেহমানখানায়, ভাইয়ের সামনে। কত দিন পর আদরের ছোট বোনকে দেখল আদনান!

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আগের চেয়ে আরো বেশি দীপ্তিমান হয়েছে তার মুখ। আরো বেশি কমনীয় হয়েছে তার চেহারা। সাংসারিক ঐশ্বর্যে আরো বেশি পৃথুলা হয়েছে তার শরীর। অথচ ভেতরটা তার ক্রমাগত পুড়ছে। পুড়ে পুড়ে কয়লা হচ্ছে। সেই কয়লা থেকে বেরোচ্ছে গুমোট ধোঁয়া। নতুবা এত দিন পর দেখা হওয়া ভাইয়ের সামনে সে কেন থমথমে মুখে বসে থাকবে! ভেতরটা যদি ক্ষতহীন থাকত, জীবনটা যদি স্বাভাবিক স্রোতে বইত, এতক্ষণে ভাইয়ের বুকে ওর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। ওর মায়াবী চোখ কান্না করে ভাইয়ের কাঁধ ভিজিয়ে ফেলার কথা। কিন্তু নূরজাহানের চোখে পূর্বের সেই মায়া নেই, কান্না নেই। আদনানের মনে হয়, ওর মায়াবী চোখ দুটোয় প্রতিস্থাপিত হয়েছে মার্বেলের দুটো গুঁটি, সেখানে কান্না ও মায়া দূরে থাক, দৃষ্টিও নেই।

কেমন আছিস, নূরী? কম্পমান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে আদনান।

নূরজাহান নীরব।

আমাকে চিনতে পারছিস?

নূরজাহান মৌন।

আমাদের কথা তোর মনে পড়ে?

নূরজাহান নিশ্চুপ।

বাড়ি যাবি?

নূরজাহান নির্বাক।

আব্বুজি-আম্মুজিকে তোর দেখতে ইচ্ছা করে না?

নূরজাহান নিস্তব্ধ।

কথা বলছিস না কেন, নূরী? আমি কী অন্যায় করেছি তোর কাছে? আর কত কষ্ট দিবি আমাদের! নূরজাহানের কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি মেরে চিৎকার করে ওঠে আদনান। ওর ওই সহসা চিৎকারে ভয়ে দুই কদম পিছিয়ে যায় উম্মে খাদিজা। আহমদ কাঁধে হাত রাখে আদনানের। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন নূরজাহানের শ্বশুর-শাশুড়ি। সকলে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে দুঃখ, বেদনা ও হতাশায় বিপর্যস্ত আদনানের মুখের দিকে। শক্তপোক্ত যোদ্ধা হাত আদনানের। ওই হাতের ঝাঁকুনিতে ভীতি ও আতঙ্কের প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে নূরজাহানের মুখাবয়বের প্রতিটি অঞ্চলে। একটুক্ষণ পর যখন ধাতস্থ হয় নূরজাহান, চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেন পৃথিবীসম ভারী এক জগদ্দল পাথর ওর বুকে চেপে বসে ছিল। দানব ওই পাথরটি সরাবার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সাইক্লোনের। আদনানের ঝাঁকুনি সাইক্লোন হয়ে অভিশপ্ত পাথরটি সরিয়ে দেয় নূরজাহানের বুক থেকে। আর তার পরপরই ফুলের পাপড়ি মেলবার মতো ধীরে মাথা তোলে নূরজাহান। পলকহীন সজল চোখে সে চেয়ে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

থাকে আদনানের দিকে। বড় মায়া, বড় বেদনায় ছাওয়া সেই চাহনি। অনিরুদ্ধ এক অভিমানও কি ছলকে ওঠে না ওই চাহনিতে! কত অভিমান, কত অভিযোগ, কত অনুযোগের গোপন বর্ণমালা যে কথা বলে ওই চোখে, আদনানের হৃদয় ভেঙে খানখান হয়ে যায়। বোনকে জাপটে ধরে সেই নিবিড় রাত্তিরে ও হু হু কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ভাইয়ের কণ্ঠলগ্না হয়ে এবার চিৎকার করে ওঠে নূরজাহানও। এমন অস্বাভাবিক সেই চিৎকার, সকলের মনে হয়, ওই চিৎকারের ঘায়ে পর্বতের চূড়া ভেঙে পড়বে। এরপর শুরু হয় কান্না। ওর বুকের ভেতর থেকে ভাতের বলক ওঠার শব্দ আসে। কান্নার গমকে ফুলে ফুলে ওঠে পিঠ। ওর চোখের বাঁধভাঙা প্লাবনে ভিজে যায় ভাইয়ের পিরহান। আদনান ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, আমি নিজের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোর সম্ভ্রমের প্রতিশোধ না নিয়ে কোনো দিন সামনে আসব না। কত দিন যে তোকে দেখতে ইচ্ছা করেছে! কতবার যে তোদের রাস্তা থেকে ফিরে গেছি। অক্ষমতার লজ্জার ভারে কতবার যে মুষড়ে পড়েছি। অবশেষে আমি সফল হয়েছি, নূরী। হায়েনাদের একটি ক্যাম্প আমরা দখল করেছি। তার আগে হত্যা করেছি সবগুলোকে। এরপরও কি তুই কথা বলবি না?

নূরজাহান ফুঁপিয়ে ওঠে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, পড়াশোনা ছেড়ে যুদ্ধে নাম লিখিয়ে মোটেও ঠিক কাজ করোনি তুমি। তুমি অনেক সম্ভাবনাময় ছাত্র ছিলে।

ছিলাম বলছিস কেন! যুদ্ধটা শেষ হোক, আবার আমি বই-খাতা নিয়ে বসব। এখনো আমি ছাত্র।

আব্বুজি-আম্মুজি কেমন আছে?

তোর এই অবস্থায় তারা কীভাবে ভালো থাকে। বিষণ্ণতা, কান্না তাদের নিত্যসঙ্গী। তারপরও তুই যদি বাড়ি যাস, তারা প্রফুল্ল হয়ে উঠবে। কাল যাবি আমার সঙ্গে?

নূরজাহান এবার শক্ত হয়ে ওঠে। কঠিন গলায় বলে, আমি আর কোনো দিন গুরিহাকায় যাব না। আমার এই মুখ গুরিহাকার আকাশকে দেখাতে পারব না।

তাহলে তাদেরই আসতে বলব। তুই আমাকে ভাই হিসেবে চিনেছিস, স্বীকৃতি দিয়েছিস, আপাতত এতেই আমি খুশি। আশা করি কদিন পর তুই গুরিহাকায় যেতেও রাজি হবি। একটু থেমে আদনান আবার বলে, ট্রেনিং নিতে আমি আজাদ কাশ্মীরে গিয়েছিলাম। সেখানে তোর মতোই এক বোনের সাথে পরিচয় হয়েছিল। বিলকিস তার নাম। বিলকিসকে বলেছি তোর কথা।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ও তোকে সালাম ও ভালোবাসা জানিয়েছে। আমাদের আজাদির জন্য সে প্রতিদিন নামাজ পড়ে দোয়া করে। আমাদের আজাদি অর্জিত হলে সে তোকে দেখতে আসবে বলেছে।

যোদ্ধা হয়ে তুমি কত মানুষের ভালোবাসা কুড়াচ্ছ। মারিয়ামের কোনো খবর পেয়েছ?

অনেক খুঁজেছি ওকে। সাধ্যের সবটুকু চেষ্টা দিয়ে খুঁজেছি। কিন্তু এখনো ওর দেখা পেলাম না।

সেই রাতটা নূরজাহানের বাড়িতেই কাটাতে হয় আদনানকে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এদিন ভিন্ন এক বউমাকে আবিষ্কার করে। লবণ-চা ও টোস্ট বিস্কুটের সামনে ভাই ও স্বামীকে গল্পে বসিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে নূরজাহান। ত্বরিত হাতে ও চুলায় ভাত চড়ায়। উম্মে খাদিজার সহযোগিতা নিয়ে ডাল, সবজি ও মুরগির মাংস রান্না যখন শেষ হয়, রাত অর্ধেক পেরিয়ে গেছে। নূরজাহানের তরকারির সৌরভে সারা বাড়ি ম-ম করছে। সেই সৌরভের ঝাপটা মেহমানখানায় লাগলে চাঞ্চল্য ভর করে আদনানের মনে। যে মেয়ে বিয়ের আগে পেঁয়াজটুকুও কাটতে পারত না, তার হাতে মসলার এমন সুগন্ধ! উদ্বেলিত আদনান রাঁধুনি বোনকে দেখার উদ্দেশে রান্নাঘরে টুঁ মারে। এসেই উম্মে খাদিজার রুদ্রমূর্তির মুখোমুখি হয় ও— আমার সঙ্গে প্রতারণা?

ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায় আদনান— কী প্রতারণা করলাম?

কে আপনি?

কেন, আপনার ভাবির ভাই!

আসল পরিচয়টা দেন।

ভগ্নিপতির বাড়িতে এই পরিচয়ই তো আসল পরিচয়।

ইশ্! কী যে লজ্জা লাগছে! আপনার সামনে আপনারই প্রশংসা করে গ্রাফিতি এঁকেছি। যদি জানতাম পেছনে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন, কক্ষনো ওটা আঁকতাম না।

এখন কি মুছে দিতে যাবেন?

সকাল হোক, তখন মুছব। বিখ্যাত গেরিলা আদনান ফাইয়াজের সংস্পর্শে আসার আনন্দে ঝলমল করে উম্মে খাদিজার মুখ। আড়চোখে মেয়েটার উচ্ছ্বাস দেখে দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নূরজাহান। বেদনার তুষাররাজির ভেতর থেকে ভেসে ওঠে মারিয়ামের মুখ। আদনানকে কাছে পেলে অভাগীটা এভাবেই পল্লবিত হয়ে উঠত।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

উনিশ

স্বপ্নের মতো এক অভিযানে নাম্বুলের যে ক্যাম্পটা দখল করেছিল আদনানরা, এক মাসও সেই ক্যাম্পের ওপর দখল রাখতে পারল না ওরা। পরদিন সকালে নূরজাহানের শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রফুল্ল মনে বিদায় নিয়েছিল আদনান। বোনটার মুখে হারিয়ে যাওয়া হাসি ফিরিয়ে আনতে পেরে ও ছিল উৎফুল্ল। যদিও ক্যাম্পটাকে আতিকুল্লাহর হাতে অর্পণ করে বোনের বাড়ি বেড়াতে এসে ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠেছিল শঙ্কা। সেই শঙ্কাই যে পরদিন সকালে কঠিন সত্য হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে, ভাবতেও পারেনি ও। খুব ইচ্ছা করছিল কোকোরনাগ থেকে সরাসরি বাড়ির পথ ধরতে। নূরজাহান ট্রমা কাটিয়ে উঠেছে, সে এখন মন খুলে কথা বলছে, হাসছে— এই মুহূর্তে এর চেয়ে আনন্দের খবর আর নেই। এই আনন্দ বাবা-মার সাথে ভাগ করতে বারবার প্রলুব্ধ করছিল মন। কিন্তু মনের ভেতর জেগে ওঠা শঙ্কার মেঘ বারবার বলছিল, আগে ক্যাম্পে চলো, আদনান। ক্যাম্পের পরিস্থিতি দেখে তারপর বাড়ি যেয়ো।

মনের এই ডাক উপেক্ষা করতে বারণ করতেন দাদাজি। তিনি বলতেন, মন হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার যোগাযোগের টেলিফোন। মনের ডাক অবহেলা করবে না।

মনের ডাককে অবহেলা করেনি আদনান। বাবা-মার সাক্ষাৎ ওকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করলেও শেষমেশ ও পা বাড়িয়েছিল নাম্বুলের দিকে। মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিল এই বলে, কোকোরনাগ আসার আগে তুমি তো বাড়ি হয়েই এসেছ। বেরোনোর আগে বাবা-মাকে বলেছিলে, নূরীকে দেখতে যাচ্ছি। দোয়া করো, নূরী যেন আমার সাথে দুর্ব্যবহার না করে।

নাজনীন বলেছিলেন, দেখিস, তোকে পেয়ে মেয়ে আমার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে।

আদনান বাড়ি যাওয়ার চিন্তা স্থগিত করে ক্যাম্পের পথ ধরে। কেন্দ্রের সাথে কথা হয়েছে ওর। ইয়াসিন মালিক থেকে শুরু করে জেকেএলএফের সকল নেতা খুশি আদনানের ওপর। ওর বীরত্বের গল্প চর্চিত হচ্ছে সবখানে। ও পরিণত হয়েছে সবার আস্থার প্রতীকে। এই আস্থার প্রতিদান দিতে চায় ও। কেন্দ্রীয় সহযোগিতায় এই অঞ্চলটাকে ও জেকেএলএফের অপ্রতিরোধ্য মুক্তাঞ্চল বানাতে চায়। নাম্বুলের দখলকৃত ক্যাম্প মুক্তাঞ্চলের প্রথম ঘাঁটি।

হৃদয়ে সুখের বাতাস বইছে আদনানের। বিজয় এবং নূরীর সুস্থ হয়ে ওঠার যুগপৎ আনন্দ ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে পথজুড়ে। ভেবেছিল, পথের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

মাঝে কোনো ট্যাক্সি কিংবা অটো পেয়ে যাবে ও। কিন্তু নির্জন রাস্তায় কোনো যানবাহনের চিহ্ন নেই। তবু পথের কোনো ক্লান্তি কিংবা অবসাদ আজ ওকে স্পর্শ করে না। ফুরফুরে মেজাজে ও পথ চলে একাকী। সামনের রাস্তাটা দুই দিকে ভাগ হয়ে গেছে। একটি গেছে গুরিহাকার দিকে, অন্যটি নাম্বুলের। তিন রাস্তার সংগমস্থলে আচমকা বিধ্বস্ত ইমতিয়াজকে আবিষ্কার করে ও। বিপন্ন মুখ। বিপর্যস্ত দেহকাঠামো। একটা মৃত উইলোগাছের নিচে বসে তাড়া খাওয়া ভেড়ার মতো হাঁপাচ্ছে সে। আদনানকে দেখেই ওর চোখেমুখে ছলকে ওঠে বেদনা। তড়িঘড়ি পা টেনে সে উঠে দাঁড়াতে যায়। কিন্তু ব্যথায় ককিয়ে উঠে আবার বসে পড়ে থপ করে।

এই নির্জন পথে একাকী এক জিনের বাচ্চাকে বসে কাঁদতে দেখলেও আদনান ততটা বিস্মিত হতো না, যতটা বিস্ময় উৎপাদন করে ইমতিয়াজ। বিশেষত, ওর চেহারার বিপন্নতা, পোশাকের বিধ্বস্ততা এবং উঠে দাঁড়াতে না পারার অক্ষমতা বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস হাতুড়িপেটা করে। ইমতিয়াজের পুরো দেহাবয়বের যে ছবি, তা কোনোভাবেই শুভ কিছুর বার্তা দিচ্ছে না। ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে আদনানের। ও দৌড়ে ইমতিয়াজের পাশে গিয়ে বসে। তারপর উৎকণ্ঠিত গলায় বলে, ইমতিয়াজ, তুমি! এ সময় এখানে কী করছ? সব ঠিকঠাক আছে তো?

অনেক কথা বলতে যায় ইমতিয়াজ। কিন্তু অনিরুদ্ধ কান্নার গমকে কিছুই বলতে পারে না সে। বাক্‌প্রতিবন্ধীদের মতো সে কেবলই হাঁসফাঁস করে। এক পর্যায়ে ওর বিপর্যস্ত, নিরাবলম্ব শরীর উইলোগাছের শাখার মতো নুয়ে পড়ে আদনানের গায়ের ওপর। আদনান তখন ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে ওঠে— কী হয়েছে, ইমতিয়াজ? জলদি খুলে বলো। আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ো না আর।

সব শেষ হয়ে গেছে, আদনান। ওরা কেউ বেঁচে নেই।

আদনানের গোলাপি মুখ থেকে ছলাৎ করে সরে যায় রক্ত— কী বললে তুমি! এ তুমি কী বললে!

বিমূঢ়তায় আদনানের চোখের সকল সবুজ ধূসর হয়ে যায়। চারপাশে নিসর্গের এত ছুটোছুটি, অথচ আদনানের মনে হয়, একমুহূর্ত আগে পৃথিবীর সব কোলাহল থেমে গেছে। বাতাস বইছে না। নদী ছুটছে না। পাতারা কাঁপছে না। ঘাসের ডগায় স্পন্দন জাগছে না। পাহাড়ের গায়ে সবুজের গহনা ঝলমল করছে না। ক্ষণকালের জন্য আদনান স্পন্দনহীন পাথরে পরিণত হয়। ও হয়ে ওঠে ইমতিয়াজের অনুলিপি। ইমতিয়াজের বিমূঢ়তা গ্রাস করে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ওকেও। ওর হাত খসে যায় ইমতিয়াজের কাঁধ থেকে। রণক্লান্ত বাঘের মতো ও গা এলিয়ে বসে পড়ে গাছের গোড়ায়। কীভাবে সবকিছু শেষ হয়ে গেল?

গতকাল রাতে নাম্বুলের উত্তরপাড়া থেকে কয়েকজন যুবক এসেছিল ক্যাম্পে। তারা সঙ্গে এনেছিল লোভনীয় খাবার। রুটি, ভাত, ভেড়ার মাংস, ফিরনি ও এলাচের সুবাস ছড়ানো গাওয়া। তারা পরিচয় দিয়েছিল জেকেএলএফের শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমর্থক হিসেবে। তাদের এলাকায় গেরিলারা ঘাঁটি গেড়েছে, এই খুশিতে তারা গেরিলাদের এসেছে খাবার খাওয়াতে। অনেক দিন সুস্বাদু খাবার পেটে পড়েনি গেরিলাদের। গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আসা ওই সুবাসিত খাবার তাদের ক্ষুধার পিঠে লোভের চাবুক কষেছিল আর কমিয়ে দিয়েছিল বিবেচনাবোধ। সাতপাঁচ না ভেবেই তারা হুটোপুটি করে বসে গিয়েছিল খাবারের দস্তরখানে। ওদিকে সন্ধ্যা থেকেই অসুস্থ বোধ করছিল ইমতিয়াজ। ক্যাম্পের একদম পেছনের কামরায় ও শুয়ে ছিল মাগরিবের পর থেকে। কয়েকজন ওকে ডেকে গিয়েছিল খাওয়ার জন্য। কিন্তু অসুস্থতা ওকে নিবৃত্ত রেখেছিল জাগতিক সকল ক্রিয়াকলাপ থেকে। খানিক পর বারান্দায় আহাররত যোদ্ধা বন্ধুদের হাসি-কল্লোল ভেসে আসছিল আর শেষ কামরায় খালি পেটে দুচোখে ঘুম নামানোর চেষ্টা করছিল ইমতিয়াজ। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, এই মুহূর্তে মনেও করতে পারে না ও। ঘুম ভেঙেছিল রাতের প্রথম প্রহর কেটে যাওয়ার পর। ততক্ষণে গা চপচপ ঘাম দিয়ে পালিয়েছে জ্বর, তবে যাওয়ার আগে রেখে গেছে জ্বর-পরবর্তী অবসাদ। প্রস্রাবের জন্য বিছানা ছাড়তে গেলে অদ্ভুত এক নৈঃশব্দ্য পরিব্যাপ্ত করে ওকে। প্রতিটি রাতেরই নিজস্ব শব্দ থাকে। হৃদয়ের কান পাতলে সেই শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। কিন্তু আজ রাতের কোনো শব্দ নেই, নেই প্রহরীদের শব্দও। এই ক্যাম্পকে এমন ভুতুড়ে নীরবতায় আচ্ছন্ন হতে দেখেনি ইমতিয়াজ, কোনো দিন। দখলের প্রথম দিন থেকেই ও দেখেছে, প্রতিটি মুহূর্তেই, হোক সেটা দিন কিবা রাত, একদল গেরিলা সশব্দে পাহারা দিয়ে চলে। আজ কেন তারা নীরব! খটকা লাগে ইমতিয়াজের। রাতের বাতাসে ভেসে আসে অশনিসংকেত। কম্বল সরিয়ে, কাঠের দরজা পেরিয়ে ও বেরিয়ে আসে বারান্দায়। হতভম্ব চোখে দেখে, তার সকল সহযোদ্ধা বিভিন্ন জায়গায় এলোপাতাড়ি পড়ে আছে। বেঘোর ঘুম। বুকের ভেতর ধক করে ওঠে ইমতিয়াজের। ভয়ে খাড়া হয়ে যায় রোমকূপ। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে যায় নিশ্বাস নিতে। একবার মনে হয় স্বপ্ন দেখছে। চোখ রগড়ে ও আবার তাকায় চারপাশে। সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। চিৎকার করে সবার নাম ধরে ডাকতে যায় ও। কিন্তু ওর চিৎকার গলার মধ্যে আটকে দেয় চোখঝলসানো

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অনেকগুলো আলোর উৎস এসে স্থির হয় ক্যাম্পের সামনে। সশব্দে লাইন ধরে থেমে যায় তারা। একটি জিপ ও তিনটি ট্রাক। যানবাহন তো নয়, ইমতিয়াজের অনুভবে দানবের ছবি ভাসে। দানব থেকে লুকাতে হবে— অবচেতন মন সাবধান করে ওকে। কাঁপতে কাঁপতে একটি পিলারের আড়ালে বসে পড়ে ও। তখনই গাড়ি থেকে ঝুপঝাপ করে নেমে আসে প্যারামিলিটারির দল। তাদের পথপ্রদর্শক রায়হান।

রায়হান! বিস্ময়, ক্রোধ, বিমূঢ়তায় অবশ হয়ে যায় আদনান। তারপর?

প্যারামিলিটারি আমাদের প্রত্যেক ঘুমন্ত সিংহকে গুলি করে হত্যা করে। আমি প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলাম। তাতে হয়তো কয়েকজনকে জাহান্নামে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু মরতে হতো আমাকেও। সে ক্ষেত্রে তোমার কাছে সংবাদ পৌছানোর শেষ সম্ভাবনাটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। আর তুমিও কিছু না জেনে হায়েনার গুহায় প্রবেশ করতে এবং মারা পড়তে। আমি জানতাম, কোকোরনাগ থেকে তুমি ক্যাম্পে ফিরবে। তাই তো পথের মাঝে তোমার জন্য বসে আছি। যদিও এই জায়গাটিও এখন নিরাপদ নয়।

আহত বাঘের মতো ভেতরে-ভেতরে গজরাতে থাকে আদনান। ইমতিয়াজ ভেবেছিল, আদনান চিৎকার করে আকাশ ভাঙবে। কিন্তু ওর মুখ থেকে চিৎকার দূরে থাক, কোনো শব্দই নিঃসৃত হয় না। ইমতিয়াজের উপলব্ধি হয়, বেদনার বিস্ময় ওকে হতবুদ্ধ করে দিয়েছে। এত শোক, এত ক্রোধ, বিপন্নতার এত বড় বোঝা কীভাবে বইবে ওর ছোট্ট কাঁধ। হাতে হাত ঘষে ও গাছের চারপাশে কেবলই ঘুরতে থাকে। ওর চোখ থেকে ছুটতে থাকে আগুনের ফুলকি।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আদনানের কাছে যায় ইমতিয়াজ। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, যে ক্ষতি আমাদের হয়ে গেছে, তার কোনো প্রতিবিধান নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে মস্তিষ্ক সচল না রাখলে ক্ষতি আরো বৃদ্ধি পাবে।

এক রাতের ব্যবধানে যার সকল সহযোদ্ধা, সকল অর্জন হারিয়ে যায়, আর এই হারানোর পেছনে প্রধান খলনায়কের ভূমিকায় যদি থাকে তার সহোদর; তবে সে কীভাবে শান্ত থাকতে পারে! কাঁদতে কাঁদতে গাছের গোড়ায় বসে পড়ে আদনান।

আমরা আবার শূন্য থেকে শুরু করব। দেখো, আবার আমাদের সবকিছু হবে।

শূন্য উদ্যানে নতুন ঘর নির্মাণ করা যায়। কিন্তু যে ঘর গড়তে গড়তে ভেঙে যায়, তার পুনর্নির্মাণের ধৈর্য ও উদ্যম অধিকাংশেরই থাকে না। হয়তো আমাদেরও তা থাকবে না। স্বগতোক্তি করে আদনান। এরপর ও

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ইমতিয়াজের দিকে ফিরে চোয়াল শক্ত করে বলে, শূন্য থেকে শুরু করতে পারব কি না জানি না। তবে এখন আমার একটাই কাজ। কাজটা না করে আমি মরেও শান্তি পাব না।

কী কাজ করতে চায় আদনান, জিজ্ঞেস করতে যায় ইমতিয়াজ; কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয় না। তার আগেই ক্যাম্পে যাওয়ার রাস্তার মুখে একটি জিপের মাথা ভেসে ওঠে। ধুলো উড়িয়ে এদিকেই আসছে। বিপদের গন্ধ পায় ইমতিয়াজ। ও আদনানকে নিয়ে রাস্তার ধারের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। তবে চোখ সরায় না গাড়ির ওপর থেকে। এই বিপন্ন সকাল আরো এক বিপন্নতা নিয়ে হাজির হয় আদনানের কাছে। জিপটি যখন ওর নিশ্বাসের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়, জিপের সামনের আসনে হাস্যোজ্জ্বল রায়হানকে দেখতে পায় ও। আদনানের হাত সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় কালাশনিকভের বাঁটে। ঠোঁটে শশ শব্দ তুলে ইমতিয়াজ চেপে ধরে ওর হাত। আদনান ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় ওকে। ততক্ষণে জিপটি বেরিয়ে গেছে কোকোরনাগের দিকে।

বলেছিলাম না, এই জায়গাটিও নিরাপদ নয়! ইমতিয়াজের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা। একটু থেমে সে আবার বলে, আচ্ছা, তুমি যে কোকোরনাগে গিয়েছিলে, রায়হান জানে?

বাড়িতে জানে। যখন এ নিয়ে আলাপ হয়, সেদিন রায়হানও বাড়ি ছিল।

তার মানে প্যারামিলিটারি এখন তোমাকে ধরতে কোকোরনাগ যাচ্ছে। তাদের পথপ্রদর্শক রায়হান।

তার আগে আমি ওকে ধরব এবং মারব। দাঁতে দাঁত পেষে আদনান।

এটা প্রতিশোধ নেওয়ার সময় নয়। আমাদের এই অঞ্চল এখন পুরোপুরি শত্রুকবলিত। ওরা যতক্ষণ না তোমাকে পাচ্ছে, খোঁজাখুঁজি করতেই থাকবে। আজাদির প্রয়োজনেই আমাদের দ্রুত এই এলাকা ত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু আমি যাব না।

এটা গোঁয়ার্তুমির সময় নয়, আদনান। কাশ্মীরের মুক্তির জন্য তোমার মতো লড়াকু যোদ্ধার প্রয়োজন আছে।

তুমি আমাকে লড়াকু যোদ্ধার পরিচয় দিলে। আমি সেই পরিচয়ের প্রতি সুবিচার করতে চাই। কাজটা না করে আমি এই অঞ্চল ত্যাগ করব না। আদনানের হঠাৎ কী হয়, ও জেদি ছেলের মতো রাস্তা ছেড়ে পাশের গ্রাম্য পথে পা চালায়। ও জানে না এই গ্রামের নাম-পরিচয়-বৈশিষ্ট্য। জানে না এখানকার অধিবাসীদের চরিত্রের ভূগোল। তবু রাত নামার অপেক্ষায় এই গ্রামটিকেই ও মঞ্জিল বানায়। ইমতিয়াজ তাল মেলাতে পারে না ওর সঙ্গে। ও পায়ের ব্যথা উপেক্ষা করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা করে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কী হয়েছে পায়ে? আদনান পেছন ফিরে থেমে যায়। এতক্ষণ ও খেয়ালই করেনি।

ক্যাম্প থেকে পাঁচিল টপকে পালাতে গিয়ে মচকা লেগেছে। শিগগিরই সেরে যাবে।

গ্রামের রাস্তাটি তরুণীর সিঁথির মতো সুন্দর। দুপাশে সবুজ ধানখেত প্রেয়সীর ওড়নার মতো দুলছে। অদূরে দেখা যাচ্ছে সারি সারি কাঠের বাড়ির ছাদ। অধিকাংশই একতলা, কোনোটা দোতলা। একটি আখরোটগাছের নিচে বসে আছে এক জোড়া কুকুর। তারা পরস্পরের গা শুঁকছে আর তাকাচ্ছে আদনানদের দিকে। ধানখেত পেরিয়ে একটি গোরস্তান। গোরস্তানের সাইনবোর্ড থেকে গ্রামটির নাম উদ্ধার করে ফেলে ওরা— সারায়েবালা। তুষার বলের মতো শুভ্র নামটি হৃদয়ে গেঁথে যায় আদনানের।

আমরা যাচ্ছি কোথায়? প্রশ্ন করে ইমতিয়াজ।

গোরস্তানে।

মানে?

আমাদের পার্থিব জীবনের শেষ ঠিকানা তো ওটাই। আদনানের ঠোঁটে পরিহাসসুলভ হাসি। তারপর ও সরু গলায় বলে, আজকের দিনটা আমরা এই গ্রামেই থাকব। রাতের বেলা প্রবেশ করব গুরিহাকায়। দিনের আলোয় গুরিহাকায় যাওয়া ঠিক হবে না।

এবার আদনানের ওপর প্রসন্ন হয়ে ওঠে ইমতিয়াজ। ঠিক এই কারণেই আদনানকে ভালো লাগে ওর। শুরুতে সে গোঁয়ার্তুমি করলেও খানিক পরেই ঠান্ডা মাথায় ভাবতে পারে। কিন্তু রাতের গুরিহাকায় ওর কাজটা কী?

গোরস্তানের মুখে একটি ঝাঁকড়া দেবদারুগাছ। গাছটির ছায়া শান্ত নিবিড়। আদনান গাছটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। রায়হান প্যালামিটারি নিয়ে কোকোরনাগের দিকে গেছে। নিশ্চয় আদনানের খোঁজে। নূরজাহানদের বাড়িতে ওকে খুঁজে না পেলে সৈন্যরা যদি চড়াও হয় আহমদের পরিবারের ওপর! উম্মে খাদিজার জন্যও দুশ্চিন্তা হয় ওর। স্কুলের দেয়ালে মকবুল ভাটের গ্রাফিতি দেখে সৈন্যরা যদি এর শিল্পীকে খোঁজাখুঁজি করে! রায়হান, তোকে কী করি বল তো! তোর মতো গাদ্দারের রক্তে কাশ্মীরের পবিত্র মাটি নাপাক হোক, সেটাও তো আমি চাই না। ক্রোধে দেবদারুগাছের গায়ে একটা ঘুষি মারে আদনান।

নতুন কবরের সমাধিলিপিগুলো খেয়াল করেছ? অধিকাংশের বয়স আঠারোর নিচে। ইমতিয়াজ একটি ফলকের গায়ে হাত বোলায়।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আদনান পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় কবরগুলোর কাছে। সারিবদ্ধ নয়টি কবর, ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে বয়স সবার। পৃথিবীর কোথাও আঠারো বছর বয়সী তরুণেরা দল বেঁধে মারা যায় না। ওরা নিশ্চয়ই যুদ্ধে গিয়েছিল। যুদ্ধ ওদের বাঁচতে দেয়নি। তারিক, হোরাইরা, বেলাল, শফিকসহ অন্য শহীদ বন্ধুদের কথা মনে পড়ে আদনানের। এ পথে কদম না রাখলে এই মৃত্যুর মহিমা ও বেদনা কোনো দিনই অনুভব করতে পারত না ও। ওর বাদামি চোখ সজল হয়ে ওঠে। কবরগুলো সামনে রেখে ও খোদার কাছে হাত তোলে। অচেনা শহীদের মৃত্যুর বেদনায় ওর চোখ দিয়ে দরদর করে জল নামে। পেছন থেকে শোনা যায় ইমতিয়াজের অস্ফুট কান্নাধ্বনি : আমিন আমিন।

সারায়েবালা গ্রামটি গুরিহাকার মতোই মনোরম। এ গাঁয়ের বাতাসে শ্বাস নিতে গিয়ে গুরিহাকার চিরচেনা গন্ধ পায় আদনান। তবে গুরিহাকার তুলনায় এই গ্রামটি বেশি চুপচাপ, নির্জন; জনসংখ্যাও বোধ হয় কম। এতক্ষণ ওরা গ্রামটিতে পা রেখেছে অথচ দুটি কুকুর ছাড়া কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নজরে পড়েনি। গোরস্তান ছেড়ে লোকালয়ের দিকে চলতে শুরু করলে এই প্রথম কোনো মানুষের দেখা পায় ওরা। শীর্ণকায় এক প্রৌঢ়, হাতের নিড়ানি বলছে তিনি কৃষক এবং তার গন্তব্য ধানের খেত, এ পথেই আসছেন। তিনি দূর থেকেই লক্ষ করেছেন আদনানদের। আদনানদের অপরিচিত মুখ, উদ্দেশ্যহীন পদক্ষেপ আর লম্বা আলখাল্লা তার চেহারায় ফুটিয়ে তুলেছে ঔৎসুক্য। ঘর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত যে চলার গতি তিনি সঙ্গে এনেছিলেন, আদনানদের দেখার পর তা শিকারার ধাক্কায় ডাললেকের ঢেউয়ের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। একটু থেমে, কিছু একটা ভেবে, তিনি আবার হাঁটতে শুরু করলেও তার পদক্ষেপের দ্বিধা পষ্টতই জেগে থাকে।

আপনাদের মসজিদটা কোথায়? সামনাসামনি হলে প্রৌঢ়ের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় আদনান।

সোজা গিয়ে ডানে। কিন্তু আপনারা?

আমরা গেরিলাযোদ্ধা। কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছি। আপনারা কেমন আছেন দেখতে এসেছি। আদনান সরাসরি নিজেদের পরিচয় দিয়ে দেয়, কিন্তু গোপন রাখে উদ্দেশ্য।

পরিচয় পেয়ে সম্ভ্রম জেগে ওঠে প্রৌঢ়ের চেহারায়। তিনি কম্পিত হাত বাড়িয়ে দেন মোসাফার উদ্দেশে। তারপর আন্তরিকতা নিয়ে বলেন, আপনারা মসজিদ খুঁজছেন? আসুন আমার সাথে। আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের। কিন্তু এখন মসজিদে কেন? এখন তো নামাজের সময় নয়।

যে গাঁয়ে পথিকের স্বজন থাকে না, সে গাঁয়ে মসজিদই পথিকের আশ্রয়।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তওবা তওবা! এ কী বলছেন আপনারা! আপনারা গেরিলাযোদ্ধা, আমাদের সুখের জন্য নিজেদের সুখ বিসর্জন দিয়েছেন, এ গাঁয়ের প্রতিটি ঘরই আপনাদের ঘর। আপনারা আমার বাড়িতে উঠুন। আমি গরিব কৃষক। উপযুক্ত সমাদর হয়তো করতে পারব না। কিন্তু আন্তরিকতায় কোনো ঘাটতি থাকবে না। বাবার বয়সী মানুষটা বিনয়ে গলে যেতে থাকেন। মানুষটার সরলতা এবং আন্তরিকতা বিব্রত করে আদনানকে। ও তাড়াহুড়ো করে বলে, না না, আমাদের জন্য কষ্ট করতে হবে না আপনাকে। সূর্যের আলো থাকা পর্যন্ত আমরা থাকব এই গাঁয়ে। সন্ধ্যা নামতেই চলে যাব। আমাদের শুধু মসজিদের পথটা বাতলে দিলেই হবে।

লোকটা তবু নাছোড়বান্দার মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু আদনান নতুন করে জড়াতে চায় না কারো সাথে। যুদ্ধে নামার পর থেকেই আদনানের মধ্যে মায়াভীতি তৈরি হয়েছে। এই মাটির মানুষগুলো এত ভালো, এত আন্তরিক, এত সরল, যোদ্ধা পরিচয় পেলেই তারা হৃদয় দিয়ে জাপটে ধরে। আদনানকে তখন জড়িয়ে যেতে হয় হৃদয়বৃত্তীয় মায়ার জালে। সরল মানুষগুলোর মায়ার বৃত্ত থেকে তখন সহজে বের হতে পারে না আদনান। কিন্তু এক যোদ্ধা, যার থিতু হওয়ার কোনো জায়গা নেই, পথই যার মঞ্জিল, তার জন্য মায়ায় জড়িয়ে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা কিছুতে নেই। সেই যে ট্রেনিং নিতে গিয়ে আজাদ কাশ্মীরের বিলকিসদের পরিবারের সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল ও, বিলকিসের মায়ের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে চলে আসতে হয়েছে ওকে। এখনো ক্ষণে ক্ষণে বিলকিস, বিলকিসের মা, বিলকিসের ছোট ভাই ওর অবসরযাপনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। শফিকের শহীদি শরীর আল্লাহর কাছে সমর্পণ করতে গিয়ে পরিচিত হয়েছিল একগুচ্ছ মমতাবান মানুষের সাথে। সে বাঁধন ছিন্ন করেও চলে আসতে হয়েছে ওকে। গুরিহাকা ওর জন্মগ্রাম। চেনাজানা কাছের মানুষ সবাই। তবু যোদ্ধা হয়ে আসার পর সেখানকার সেই চেনা মানুষগুলোই, এমনকি বাবা-মা পর্যন্ত, যেভাবে ওকে ভালোবাসার ওমে আগলে নিয়েছিল, তার কোনো তুলনা চলে না। কিন্তু আজ রাতের পর অনিবার্যভাবে সেই গুরিহাকার বাঁধনও ছিন্ন হবে। গেল রাতে পরিচয় হয়েছে উম্মে খাদিজার সঙ্গে। যুদ্ধকবলিত দেশে প্রতিটি মানুষই, বিশেষত তরুণীরা, সর্বক্ষণ বিপদের ঝুঁকিতে থাকে। উম্মে খাদিজার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে সেই বেদনা কি আদনানকেও ব্যথিত করবে না! ভালোবাসা ও মায়ার আগুনে পুড়ে পুড়ে সতর্ক হয়ে গেছে আদনান। নতুন করে মায়ার ভার আর বাড়াতে চায় না ও। তা ছাড়া এই জনপদে কম পরিবারই আছে, যুদ্ধ যাদের ওপর ছোবল রেখে যায়নি। কারো সাথে দুদণ্ড কথা বললেই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বেদনার এমন সব বীভৎস গল্প, সহ্য করা যায় না। পলায়নপর আদনান এই সব রক্তমাখা গল্প থেকে পালিয়ে থাকতে চায়। কিন্তু নিয়তির নিয়মই বোধ হয় এমন, পরিকল্পনার উল্টো পথে চলতে সে পছন্দ করে সব সময়। তাই তো এই প্রৌঢ়ের ভালোবাসার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আদনান, ততক্ষণে মসজিদ চত্বরে নির্মিত হচ্ছে জড়িয়ে যাওয়ার নতুন মঞ্চ।

প্রৌঢ়কে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে মসজিদের দিকে চলতে শুরু করলে প্রৌঢ় তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন পথের ওপর। গোরস্তান বলছে, যুদ্ধ এই গ্রামের ওপরও নিষ্ঠুর ছোবল বসিয়েছে, তারপরও থেমে নেই জীবন। পথের ধারে এক বৃদ্ধ টংদোকান খুলে বসেছে। দোকানের মাচায় বসে আয়েশ করে চা খাচ্ছে কয়েকজন। সামনেই বোধ হয় প্রাইমারি স্কুল। ছেলেমেয়েরা কলরব করতে করতে স্কুলে যাচ্ছে। এক রাখাল ভেড়ার পাল নিয়ে যাচ্ছে চারণভূমিতে। এক কিশোরী লাকড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরছে। পথচারীরা চলতে চলতে থমকে দাঁড়াচ্ছে, বিস্ময় নিয়ে লক্ষ করছে আদনানদের গতিবিধি। কিন্তু কেউ যে এগিয়ে এসে কথা বলবে, সেই সাহস পাচ্ছে না। কারণ আর কিছু নয়, চারপাশে ছড়িয়ে রাখা আদনানদের কৃত্রিম গাম্ভীর্য।

মসজিদের সামনে একটুকরো খোলা মাঠ, সবুজ ঘাসে ঢাকা। মাঠের ঠিক মাঝখানে একটি মনোরম কাঠবাদামগাছ। আশপাশে আর কোনো গাছপালা নেই বলে পূর্ব দিগন্তের পর্বতটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কি দিন কি রাত, পর্বতটি সারাক্ষণ এমনভাবে তাকিয়ে থাকে মসজিদের দিকে, নামাজ শেষে বের হওয়ার সময় মুসল্লিদের চোখ ওই পর্বতের ওপর পড়বেই।

কাঠবাদামগাছের ছায়ায় কয়েকটি শিশু খেলা করছিল। আদনান ও ইমতিয়াজ দূরে দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখতে থাকে। দুই শিশুর কঠিন মুখ। হাতে কাঠের বন্দুক। তাক করা সামনের দিকে। বাকি তিন শিশু নিরীহ ভঙ্গিতে দুই হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুকের নলের মুখে। বন্দুকধারীদের একজন ধমক মেরে বলে, আইডি কার্ড দেখাও। সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ তিন শিশু পকেট থেকে কাঠবাদামের পাতা বের করে দেখায়— এই যে স্যার, আইডি কার্ড।

স্তম্ভিত হয়ে যায় আদনান। ক্রিকেট খেলে বড় হয়েছে ও। সেই খেলার মধ্যে ছিল শুধুই হাসি-কল্লোল আর আনন্দের অভিঘাত। আনন্দমুখর ওই সময়টুকুর জন্য ওরা সারা দিন অপেক্ষায় থাকত। খেলা শেষে চলত আলোচনা, পর্যালোচনা; কখনো উত্তপ্ত বিতর্ক। কোনো কোনো দিন স্বপ্নের মধ্যে হানা দিত ওদের খেলার মাঠ। মনে পড়ে, বাবা যেবার নতুন ব্যাট কিনে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

এনেছিলেন, প্রথম রাত ও ব্যাটকে কোলবালিশ বানিয়ে ঘুমাতে গিয়েছিল। সেই একই মাটির সন্তানদের আজ খেলার উপকরণ বন্দুক, আইডি কার্ড। এরা বোধ হয় ঘুমাতে যায় কাঠের ওই বন্দুক বুকে নিয়েই। সময় কীভাবে বদলে দিল সবকিছু! বাচ্চাগুলোর এই অভিশপ্ত শৈশবের কথা ভেবে বুক মোচড় দিয়ে ওঠে আদনানের। ভিজে যায় চোখের পাতা। গুটি গুটি পায়ে ও এগিয়ে যায় শিশুদের দিকে। দুজন অপরিচিত পূর্ণ বয়সের মানুষ ওদের খেলার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, অথচ কোনো বিকার কিংবা তোয়াক্কা নেই শিশুগুলোর। ভড়কানো দূরে থাক, বরং ওদের খেলনা বন্দুক এই অপরিচিত মানুষ দুটোর দিকে উঠে আসে— আইডি কার্ড দেখাও। যেন এ খেলা নয়, জীবন।

আদনানদের অনুভূতিও ভিন্ন হয় না। এটা যে নিছকই এক মজা কিংবা খেলা, একমুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হয় ওরাও। যে লাঞ্ছনার মুখোমুখি প্রতিনিয়ত হতে হয় কাশ্মীরিদের, খেলার ভেতরেও সেই লাঞ্ছনার অপচ্ছায়া শকুনের ডানা হয়ে ঘিরে ধরে ওদের। আদনান ও ইমতিয়াজ একসঙ্গে পকেট হাতড়ায়। কিন্তু হায়, ওদের আইডি কার্ড নেই।

আইডি কার্ড নেই, তোমরা কি জঙ্গি? ধমক দেয় এক শিশু।

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ওরা দুই হাত উঁচু করে দাঁড়ায়। নির্বাক।

হাত তোলার কারণে আদনানের ঢোলা পিরহানের ভেতর থেকে উঁকি মারে কালাশনিকভের মুখ। অমনি বড় বড় হয়ে যায় শিশুদের জোড়া জোড়া চোখ। যাদের ওরা মিছিমিছি জঙ্গি ভেবেছিল, সেই তারা যে সত্যিকারের জঙ্গি, ভাবতেও পারেনি ওরা। ধমকানো শিশুটির মুখজুড়ে ফুটে ওঠে কৌতূহল। সে দুই কদম এগিয়ে এসে লোভাতুর চোখে তাকায় কালাশনিকভের দিকে। তুমি দেখি সত্যি সত্যি জঙ্গি। তোমার ওই বন্দুক আমাকে দেবে?

আদনান কাঁধ থেকে কালাশনিকভ নামায়। হাতের মতো সাইজ আগ্নেয়াস্ত্রটির। ইস্পাতের ব্যারেল। অ্যালুমিনিয়ামের বাঁট। কলার ছড়ার আকৃতির ম্যাগাজিন। আদনান খেলনার মতো করে অস্ত্রটি দুই হাতে নাচায়। শিশুগুলো এবার মৌমাছির মতো ঘিরে ধরে ওকে। যেন একঝাঁক ক্ষুধার্ত শিশুর সামনে লোভনীয় খাবারের প্যাকেট খোলা হচ্ছে। শিশুদের এই কৌতূহল উপভোগ করে আদনান। ও সবার দিকে তাকিয়ে হাসে। বলে, এটা বন্দুক নয়। কালাশনিকভ। রাশিয়ায় তৈরি। পাকিস্তানিরা আমাকে উপহার দিয়েছে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তুমি পাকিস্তান থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসা গেরিলা? যে ছেলেটির চুল ঈষৎ লালচে এবং বড়, জিজ্ঞেস করে সে। তার গোলাপি গাল ক্রমেই রক্তিম হয়ে ওঠে উত্তেজনায়।

হ্যাঁ। আমি পাকিস্তানে গিয়েছিলাম ট্রেনিং নিতে।

ছেলেটির চোখের আলো এবার দপ করে নিভে যায়। রক্তিম চেহারায় ফুটে ওঠে বেদনার ছায়া। আদনানের সামনে সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এই, হঠাৎ মন খারাপ করছ কেন তুমি? কী নাম তোমার?

ওর নাম আবিদ। ওর বাবাও ট্রেনিং নিতে পাকিস্তান গিয়েছিল। কিন্তু আর ফিরে আসেনি। এ জন্য ওর মন খারাপ। বন্ধুরা একসাথে আবিদের মনখারাপের কারণ ব্যাখ্যা করে।

ওহ্! আদনানের হৃদয়ে পাহাড় ভেঙে পাথর গড়ানোর শব্দ হয়। ছেলেটির ব্যথার ক্ষতটি ও সমগ্র সত্তা দিয়ে অনুভব করে। ও আবিদের কাঁধের ওপর হাত রেখে নিবিড় মমতায় নিজের দিকে টেনে নেয়। বাদামি চুলে আঙুল চালিয়ে বলে, মন খারাপ কোরো না, আবিদ। আমি তোমার আব্বুজিকে খুঁজে এনে দেব।

সত্যি দেবে তো! আদনানের কোমরের উচ্চতা থেকে সে মাথা তুলে তাকায়। চোখে টলমল জল।

সত্যি দেব। আদনানের রুক্ষ হাত ওর গাল স্পর্শ করে।

আবিদের চোখে এবার জ্বলে ওঠে নক্ষত্রের আলো। সহসা ওর কচি ডানায় দুরন্ত ঈগলের ক্ষিপ্রতা ভর করে। ও চনমন করে বলে, তুমি দাঁড়াও, খবরটি আমি আম্মুজিকে জানিয়ে আসি। চলে যাবে না কিন্তু। বলেই সে চড়ুই পাখির মতো উড়ে যায় বাড়ির দিকে। ছেলেটির উচ্ছ্বাস চোখে জল এনে দেয় আদনানের। ও আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে, খোদা, এই মিথ্যেটুকুর জন্য আমাকে ক্ষমা করো অথবা ক্ষমতা দাও ওর বাবাকে খুঁজে পাওয়ার।

এক্ষুনি চলে আসবে আবিদ। ওর বাড়ি বেশি দূরে নয়। বন্দুকধারী দুই শিশুর একজন বলে।

ও আসতে আসতে তোমাদের সাথে গল্প করি, কেমন? আদনান একে একে সবগুলো শিশুর চিবুক স্পর্শ করে। তারপর ও আর ইমতিয়াজ কাঠবাদামগাছের গোড়ায় গা এলিয়ে বসে। আদনান ওর কালাশনিকভ শুইয়ে রাখে ঘাসের ওপর। দেখাদেখি শিশুগুলোও বসার জন্য হুড়োহুড়ি করে। কে সামনে বসবে আর কে পিছে, তা নিয়ে কিঞ্চিৎ তর্কযুদ্ধও হয়। আসন নিশ্চিত

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

হলে ওরা অপার বিস্ময় নিয়ে আসমান থেকে হঠাৎ ফেরেশতার মতো নাজিল হওয়া দুই যোদ্ধাকে দেখে। ওদের চোখ একটু পরপর সরে সরে যায় আগ্নেয়াস্ত্রটির দিকে।

তোমাদের নাম কী?

ওসমান, নূর, বাশারত, তাওহিদ। চারজন ধারাবাহিকভাবে বলে ওদের নাম।

তোমরা আইডি কার্ড আইডি কার্ড ছাড়া আর কিছু খেলো না?

খেলি তো। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলি। তাওহিদ বলে।

সেটা কেমন খেলা? জিজ্ঞেস করে ইমতিয়াজ।

একদিকে গেরিলা, অন্যদিকে আর্মি। ফায়ার। বাশারত ওর কাঠের বন্দুকটা দিয়ে ফায়ার করার অভিনয় করে।

যুদ্ধে কারা বিজয়ী হয়?

আমাদের খেলায় সব সময় গেরিলারা জয়ী হয় আর আর্মিরা হেরে যায়। আমরা প্রত্যেক দিন খেলার ভেতর আর্মিদের হত্যা করি। বড় হয়ে আমরা সত্যিই আর্মিদের হত্যা করব তো, তাই এখনই শিখে রাখছি।

তোমরা আর্মিদের হত্যা করতে চাও কেন?

কারণ, আর্মিরা আমার ভাইকে হত্যা করেছে। আমাদের গোরস্তানে তার কবর। বিষণ্ন কণ্ঠে বলে নূর।

আর্মি আমার বেহেনজির ওপর জুলুম করেছে। এ জন্য আমি আর্মি হত্যা করতে চাই। চিৎকার করে বলে ওসমান।

আর্মি আমার আব্বুজির ফসলের খেত পুড়িয়ে দিয়েছে। এ জন্য আমি আর্মি হত্যা করতে চাই। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে বাশারত।

আর্মি আমার চাচাকে ধরে নিয়ে গেছে। এ জন্য আমি আর্মি হত্যা করতে চাই। সজল চোখে বলে তাওহিদ।

আমিও আর্মিদের হত্যা করতে চাই, কারণ, আর্মিদের কারণে আমার আব্বুজি নিখোঁজ। বাড়ি থেকে ছুটে এসে দলের মধ্যে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে আবিদ। সবাইকে ডিঙিয়ে ও দখল করে নেয় আদনানের কোল। যে মানুষটা আব্বুজিকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেয়, তার কোলে ঢুকে যাওয়ার অধিকার আবিদের আছে।

ছেলেগুলোর কথার সম্মোহনে আদনান এতটাই আনমনা হয়ে ওঠে, ভালোবাসার হাটে যে ওর কোল বিক্রি হয়ে গেছে, টেরও পায় না ও। অনেক দিন পর ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে মারিয়ামের মুখ। একবার ইচ্ছা করে শিশুগুলোর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ও উচ্চারণ করে— আমিও আর্মি হত্যা করতে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

চাই, কারণ, ওরা আমার প্রেয়সীকে ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু অলীকের এই সন্তানগুলোর সামনে নিজের জীবনের বেদনাদায়ক অধ্যায় উন্মোচন করা হয় না ওর। হ্যাঁ, এই কাঠবাদামগাছকে ঘিরে বসে থাকা শিশুগুলোকে ওর অলীকের সন্তানই মনে হয়। যারা মানব হত্যার মতো ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা নিয়ে বড় হয়, তারা অলীকের সন্তান নয় তো কী! মাতৃগর্ভে জন্ম নেওয়া রক্ত-মাংসের শিশুদের ভেতর যে এই রকম দুঃসাহসী বীর বেড়ে উঠতে পারে, এই দিন না এলে জানতে পারত না আদনান।

রাতে গুরিহাকা ঢুকবে বলে সময় কাটাতে ওরা অচেনা এই গাঁ সারায়েবালায় এসেছে। বুকের ভেতর ক্যাম্প ও সাথি হারানো চাপা কষ্ট। ভেবেছিল, সময় বুঝি কাটবে না। দুঃসময়ের গতি সব সময় শ্লথই হয়। তবু শিশুগুলোর সাথে আনন্দ-বেদনার কথা বলতে বলতে সূর্য কাঠবাদামগাছের মাথার ওপর উঠে আসে। তখন মসজিদে জোহরের আজানের প্রস্তুতি চলে। মুসল্লিরা নামাজ পড়তে এসে কাঠবাদামতলায় অদ্ভুত ঘটনার মঞ্চায়ন দেখে। দুই অচেনা যুবক, বেশভূষায় যাদের গেরিলা মনে হয়, সারায়েবালার কয়েকজন শিশুকে অস্ত্র ধরা শেখাচ্ছে। ঈপ্সিত অস্ত্র হাতে পেয়ে শিশুগুলো ঝরনার মতো কলকল করছে। অন্য দিন অনেক আগেই ওরা খেলা ভেঙে ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু আজ ওরা উন্মাদ পতঙ্গ, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে নিঃশেষ না করে স্বস্তি নেই। ওদের উন্মত্ততার পরিচয় পাওয়া যায় নামাজের কাতারে দাঁড়িয়েও। কোন দুজন আদনানের পাশে দাঁড়াবে, তা নিয়ে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা একপর্যায়ে রূপান্তরিত হয় ধাক্কাধাক্কিতে। আদনানকে তখন ভাগাভাগির পথে অগ্রসর হতে হয়। ও নিয়ম ঠিক করে দেয়— সুন্নতে যারা আমার পাশে দাঁড়াবে, ফরজে তারা দাঁড়াতে পারবে না।

গ্রামের মাঝারি আয়তনের কাঠের মসজিদ। বেশ জাঁকজমকপূর্ণ, অথচ আদনানদের বাদ দিলে মুসল্লি মাত্র পাঁচজন। বিস্মিত হয় আদনান। নামাজ শেষে ও স্বপ্রণোদিত হয়ে আলাপ করে সবার সাথে। যখন ও জানতে চায়, মুসল্লি এত কম কেন, তখন বৃদ্ধ মোয়াজ্জিন জানান, আগে মুসল্লি অনেক হতো। কিন্তু গত এক বছরে আমাদের অনেকগুলো জানাজা পড়তে হয়েছে। আর যাদের জানাজা পড়া হয়, তারা তো মসজিদে আসতে পারে না।

এই সারায়েবালা গ্রামের পরতে পরতে লেগে আছে রক্তের দাগ, নাড়া পড়লেই বেরিয়ে আসছে দগদগে ক্ষত। আদনানের আর কথা বলার হিম্মত হয় না। ও দ্রুতপায়ে মসজিদ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। জুতার ভেতর পা ঢোকাতে গিয়ে চোখ আটকে যায় পর্বতের গায়ে। জোহরের ওয়াক্ত বলেই কি পর্বতটি ঈষৎ ঝুঁকে আছে পশ্চিমে! জুতা পরতে পরতে সামনে এসে হাজির

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

হন সেই প্রৌঢ়, সকালে যিনি নিড়ানি হাতে মাঠে যাচ্ছিলেন। তার পেছনে মাথায় ওড়নাটানা এক গ্রাম্য যুবতি। গায়ে সালোয়ার-কামিজ। কাশ্মীরি যুবতিদের মতোই গোলাপি গাল, টানা চোখ, খাড়া নাক। তবে সবকিছু ছাপিয়ে তার মুখজুড়ে ছড়ানো বিষাদের মেঘটাই চোখে পড়ে। প্রৌঢ়ের হাতে খাবারের বাটি, যুবতির হাতে পানির পাত্র। আবিদ 'আম্মুজি আম্মুজি' বলে তাকে জড়িয়ে ধরলে বোঝা যায়, যুবতিটি ওর মা। কিন্তু প্রৌঢ়ের সাথে তার কী সম্পর্ক?

আপনি? কালাশনিকভ কাঁধে ঝোলাতে ঝোলাতে প্রৌঢ়ের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় আদনান।

আমি আবিদের দাদাজি। আর এ আমার পুত্রবধূ হুসনা। আমাদের বাড়ি তো যেতে রাজি হলেন না, তাই আমরাই আপনাদের জন্য খাবার এনেছি। রান্না করেছে আবিদের মা।

অনুশোচনা বোধ হয় আদনানের। এমন একজন বাবা, যার সন্তান যুদ্ধে গিয়ে ফিরে আসেনি, যার নাতি যোদ্ধা হওয়ার জন্য ব্যগ্র, যার পুত্রবধূ গভীর এক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন গুজরান করছে, এমন মানুষের দাওয়াত ও কবুল করেনি। আদনান লজ্জিত গলায় বলে, ইশ্, কেন যে তখন আপনার দাওয়াত কবুল করলাম না!

ইমতিয়াজ বলে, তখন যদি জানতাম আপনি এক যোদ্ধার গর্বিত পিতা, সেই তখনই আপনার বাড়িতে হাজির হয়ে যেতাম। চাচাজি, আমরা দুঃখিত।

না না, এখানে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। আপনারা আমাদের গাঁয়ে এসেছেন, খুব আনন্দ হচ্ছে। আপনাদের দেখে আমার ছেলেটার কথা মনে পড়ছে। কত দিন ওকে দেখি না! শেষের দিকে গলা আর্দ্র হয়ে ওঠে প্রৌঢ়ের। তিনি অপ্রতিভ ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন। নীরবতার ভেতর দিয়ে কেটে যায় বেশ কিছু সময়। আবিদের আম্মুজি হুসনা তখন ফিসফিস করে বলে, বাবা, ওনাদের খেতে বলুন।

পুত্রবধূর কথার পরিপ্রেক্ষিতে শোকের ঘোর থেকে বের হয়ে আসেন প্রৌঢ়। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা খেতে বসুন। এখানে কোথায় যে বসবেন!

আদনান চারপাশে তাকিয়ে সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, এটাই তো চমৎকার জায়গা! এই কাঠবাদামের ছায়াই আমাদের দস্তরখান। দিন দিন, খাবার দিন। খুব ক্ষুধা লেগেছে। ইমতিয়াজকে নিয়ে ও বসে পড়ে গাছের গোড়ায়। বাচ্চারা ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকে সামনে। সেই সকাল থেকে দুই যোদ্ধাকে ওরা দখল করে রেখেছিল। এই অবেলায় প্রিয় মানুষ দুটি বেদখল হয়ে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

যাওয়ায় ওরা মনঃক্ষুণ্ন হয়। আবিদের দাদাজির দিকে ওরা ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। এই বৃদ্ধই সকল অনিষ্টের মূল।

আবিদ মাকে জড়িয়ে ধরে আহ্লাদের ঢঙে বলে, আম্মুজি, আমিও খাব।

হুসনা তাড়াতাড়ি চাপা গলায় বলে, এগুলো মেহমানদের। তোমার খাবার বাড়িতে। পরে খাবে।

মা ও ছেলের কথোপকথনের ভেতর কান ঢুকে যায় আদনানের। ওর ঠোঁটে ফুটে ওঠে মুচকি হাসি। ছোটবেলায় বাড়িতে মেহমান এলে সে-ও খাওয়ার জন্য এমন কাণ্ড করত। আদনান উচ্ছল ভঙ্গিতে আবিদসহ সব শিশুর উদ্দেশে বলে, এই, তোমরাও বসে যাও। আমাদের সাথে খাবে।

শিশুরা যেন এই আহ্বানটুকুরই অপেক্ষায় ছিল। ক্ষুধার তাড়না তো ছিলই ওদের, পাশাপাশি প্রিয় দুই গেরিলার সাথে আরো কিছুক্ষণ ঘনিষ্ঠ সময় কাটানোর ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ; ফলে আদনানের কথা শেষ হওয়ামাত্র ওরা গোল হয়ে বসে যায় ঘাসের ওপর। সবাইকে ঠেলেঠুলে আবিদ বসে আদনানের পাশে।

আদনান ও ইমতিয়াজের সামনে দুটো প্লেট বিছিয়ে দেন প্রৌঢ়। অপত্যস্নেহে তিনি দুই গেরিলার পাতে তুলে দেন ভাত, সুবাসিত ভেড়ার মাংসের ঝোল। প্লেটসংকটের কারণে হুসনা একটি বাটিতে ভাত মাখায়। তারপর সার ধরে বসে থাকা সব শিশুর মুখে তুলে দেয় ভাতের নলা। গাছের পাতার ফাঁক গলে দুপুরের উজ্জ্বল আলো গড়িয়ে পড়ে আবিদের মায়ের গোলাপি গালে। সেদিকে চোখ পড়ে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে আদনানের। মেয়েটি এক ছেলের জননী। অথচ এমন মমতা নিয়ে সে পাড়ার ছেলেগুলোর মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে, যেন সবগুলোই তার সন্তান, যাদের সে যোদ্ধা বানানোর স্বপ্ন নিয়ে বড় করছে।

সকালে নূরজাহানের হাতের খাবার খেয়ে পথে বেরিয়েছিল আদনান। সারায়েবালার এই গৃহবধূর হাতে নূরজাহানের রান্নার স্বাদ ফিরে পায় ও। মনে মনে সংকল্প করে, এরপর ও যখন নূরজাহানদের বাড়িতে যাবে, ফেরার পথে সারায়েবালার এই দুঃখী বোনটার সাথে দেখা করে যাবে, আর আদর রেখে যাবে আবিদের নরম গালে।

এতক্ষণ কথা না হলেও বিদায়বেলায় আদনানের মুখোমুখি হয় হুসনা। আদনান বুঝতে পারে, বিশেষ কিছু বলতে চায় হুসনা; কিন্তু আদনানের সামনে দাঁড়িয়ে গ্রাম্য মেয়েটি কোনো শব্দ খুঁজে পায় না। সময় গড়ায়। শিশুরা ইমতিয়াজকে ঘিরে ধরে যুদ্ধের গল্প শোনে। আবিদের দাদাজি দুটো বেওয়ারিশ কুকুরকে উচ্ছিষ্ট হাড্ডি খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এদিকে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

হুসনার চোখের ভেতর থেকে উপচে পড়ে অশ্রু। একটু পর সে বিমর্ষ কণ্ঠে বলে, আবিদের আব্বুজিকে আপনি খুঁজে পাবেন কি না জানি না। এ-ও জানি না তিনি আদৌ বেঁচে আছেন কি না। তবে আপনার আশ্বাসে খুব খুশি হয়েছে আবিদ। অনেক দিন পর ছেলেটার মুখে হাসি দেখলাম। চারটি বাক্য বলতে গিয়েই গলা ধরে আসে মেয়েটার। একটু থেমে, চোখের কোনা মুছে সে আবার বলে, আমি নিজেও হাসি না অনেক দিন। বুঝতে পারি না আমি বিধবা নাকি সধবা। যাদের স্বামী নিখোঁজ হয়, ঠিক জানি না, তাদের কী বলা হয়।

মেয়েটির বেদনা আক্রান্ত করে আদনানকেও। বুকের ভেতর বেজে চলে সেই বেদনার শোকসংগীত। কোথাও যেন পাহাড়ধসের শব্দ হয়। সেই শব্দের নিচে তড়পাতে থাকে হুসনার বোবাকান্না। কাশ্মীরে তরতর করে বাড়ছে হুসনার মতো অভাগীদের সংখ্যা। কোথাও কোথাও এদের বলা হচ্ছে অর্ধবিধবা। এই নিষ্ঠুর পরিভাষা হয়তো এখনো হুসনার ওপর ছোবল বসায়নি। কিন্তু বসাতে কতক্ষণ! আদনান খুব করে চায়, হুসনা এই পরিভাষার ছোবল থেকে নিরাপদ থাকুক। ও সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আবিদের আব্বুজিকে খুঁজে পেতে আমি হৃদয় থেকে চেষ্টা করব। কী যেন তার নাম?

মেয়েটি স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। তার বদলে ওড়নার প্রান্ত থেকে বের করে আনে এক ছবি। ছবিটি আদনানের হাতে দিয়ে বলে, এটা আপনি রাখেন। ওর বাবা।

ছবির ওপর চোখ রেখে স্তব্ধ হয়ে যায় আদনান। একমুহূর্তের জন্য দুলে ওঠে পৃথিবী। মাথার ওপরের কাঠবাদামগাছকে মনে হয় শোকের প্রতিলিপি। শাকির। শ্রীনগরে দুদিনের জন্য পরিচয় হয়েছিল শাকিরের সাথে। উচ্ছল হাসিখুশি আড্ডাবাজ যুবক। ঘুরতে ভালোবাসত। স্বপ্ন দেখত আজাদির। সেই স্বপ্ন পূরণের জন্যই তো ঘর ছেড়েছিল সে। কিন্তু উজ্জ্বল মাণিক্যকে লক্ষ্য বানিয়ে পথে বেরিয়েছিল যে মুসাফির, মঞ্জিলে পৌঁছানোর আগেই ফুরিয়ে গেছে তার দম। শাকির আর ইহলোকে নেই। মাইসুমার এক যুদ্ধে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছে সে। কিন্তু এই দুঃসংবাদ কীভাবে ও উপস্থাপন করবে তার বিধবার সামনে! কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয় আদনান। ব্যাকুল চোখে চেয়ে থাকা এই নারীর সামনে ওর সকল ভাষা ভেঙেচুরে যায়। ভীরু আদনান এই সব মুহূর্ত থেকে বরাবরই পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু নিয়তি ওকে বেদনার এই বালিয়াড়ির সামনেই হাজির করেছে বারবার। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে আদনানের। স্বাভাবিক হওয়ার জন্য ঝোলানো অস্ত্রটি কাঁধবদল করে ও। নিচু হয়ে জুতার ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে ঠিক করে নেয় পায়ের অবস্থান। আবিদের জন্য খুব মায়া হয়। ছেলেটা এখন

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ইমতিয়াজের সাথে গল্প করছে। ও যখন জানবে বাবা বেঁচে নেই, কতটা দুঃখ পাবে! আদনান সিদ্ধান্ত নেয়, শাকিরের শাহাদাতের খবর জানাবে না। এই বেদনার সংবাদ হঠাৎ আপন হয়ে ওঠা পরিবারটিকে ও দিতে পারবে না। জনম জনম ধরে আবিদ অপেক্ষা করুক বাবার ফিরে আসার, আবিদের মা অপেক্ষা করুক স্বামীর ফিরে আসার, আবিদের দাদা অপেক্ষায় থাকুক ছেলের ফিরে আসার— তাদের অপেক্ষার দিন হয়তো ফুরাবে না, কিন্তু এই অপেক্ষার মধ্যে একটু সুখ, একটু ভরসা তো বেঁচে থাকবে। আদনান তাদের ভরসাটুকু নষ্ট করতে চায় না।

বিদায়ের ঘণ্টা বেজে যায়। এঁটো থালা-বাসন গুছিয়ে উঠে পড়ে হুসনা। মেয়েটির মুখের কোথায় যেন একটুখানি সুখের রেণু উঁকি মারে। এত দিন সে নির্জীব হয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছিল। আজ এক যোদ্ধাকে সে স্বামীর খবর নেওয়ার দায়িত্ব দিতে পেরেছে। নিরাবলম্ব নারী খড়কুটো হলেও ধরার মতো পেয়েছে একটি অবলম্বন। নির্ভরতার সেই মাটি ফুঁড়েই বেরিয়েছে এক পুষ্পলতা। তারই পরাগস্পর্শে সতেজ হুসনার মুখ।

হুসনার মুখের ওই সুখের রেণু পুলকিত করে আদনানকে। তবে এতক্ষণে তার ভেতর তৈরি হয় নতুন এক দ্বন্দ্ব। শাকিরের মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখা হবে অনৈতিক কাজ। এতে করে এই পরিবারটির জীবন জারিত হবে ঘোর অনিশ্চয়তার ভেতর। প্রতিদিন একটু একটু করে ক্ষয় হওয়ার চেয়ে নিয়তির বরাদ্দকৃত সকল শোক এক দিনে পোহায়ে ওঠাই কি ভালো নয়! আদনান শক্ত সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলে। জানাতে হবে শাকিরের শাহাদাতের খবর। হুসনা বিদায় নিয়ে চলে যেতে গেলে আদনান ধীরপায়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। একটু আগে কথা বলতে গিয়ে শব্দসংকটে ভুগছিল হুসনা। হুসনার সেই সংকট এবার ফিরে আসে আদনানের ভেতর। অনেক প্রচেষ্টার পর অন্য দিকে মুখ করে ও নিচু স্বরে বলে, শাকির এহসানুল্লাহ আর নেই। শহীদ হয়েছে সে। তার মুখের শেষ পানিটুকু আমিই তুলে দিয়েছিলাম। আর্দ্র গলায় কথাটুকু বলেই দ্রুত সরে আসে আদনান। একটু পর পেছনে কিছু একটা পতনের শব্দ হয়। ও পেছন ফিরে দেখে, কাপড়ের একটি পোঁটলার মতো ঘাসের ওপর গড়িয়ে পড়েছে শাকিরের স্ত্রী। আজ থেকে সে পূর্ণ বিধবা হলো।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কুড়ি

চোখের পাতায় তীব্র ব্যথা। ব্যথা সমস্ত শরীরে। প্রতিটি মাংসপেশি টনটন করছে যন্ত্রণায়। পিপাসায় কণ্ঠনালি শুকিয়ে কাঠ। ইচ্ছা করছে বিধ্বস্ত এ দেহ নিয়তির ওপর ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে যেতে। তাতেই শান্তি। কিন্তু এভাবে আর কত! দুই দিন ইতোমধ্যে সে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। জাগার চেষ্টা না করলে হয়তো এই ঘুমই তার চিরঘুমে পরিণত হবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আদনান চোখ পিটপিট করে চাইল। পৃথিবী সম্ভবত উল্টে গেছে। মনে হলো, পৃথিবীর পা ওপরে আর মাথা নিচে, ভনভন করে ঘুরছে। আবার জ্ঞান হারাল আদনান। সবকিছু অন্ধকার। জ্ঞান ফিরল একবারে সন্ধ্যায়। নিজেকে আবিষ্কার করল জানালাবিহীন বদ্ধ প্রকোষ্ঠে, পৃথিবীর মতো ঝুলন্ত অবস্থায়। ও বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, পানি খাব, পানি খাব।

দুজন সৈন্য ওর ঝুলন্ত দেহকে শূন্য থেকে মাটিতে নামাল। তারা হয়তো ওর জ্ঞান ফেরারই অপেক্ষা করছিল। দেয়ালে হেলান দিয়ে কতক্ষণ ঝিম মেরে পড়ে থাকল আদনান। মাথার ভনভনানি থামলে ও দেখল, সামনে ঢাকা দেওয়া পানির গ্লাস। ঢকঢক করে ও পানিটুকু একশ্বাসে খেয়ে ফেলল, আর তার পরপরই মনে পড়ল সবকিছু।

সেই সন্ধ্যায় সারায়েবালা থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরেছিল ও। সঙ্গে ছিল ইমতিয়াজ। সারায়েবালার এক সাহসী যুবক মোটরসাইকেলে ওদের এগিয়ে দিয়েছিল অর্ধেক পথ। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে মাঝপথ থেকেই যুবককে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল ওরা। যুবক বিদায় নিতেই নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ইমতিয়াজকে বলল আদনান— আজকের রাতই রায়হানের শেষ রাত।

রায়হান ভারতীয় সৈন্যদের হয়ে কাজ করছে, অনেক আগেই আঁচ করতে পেরেছিল আদনান। সেই যে বছর সাতেক আগে মারিয়ামকে পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় চড় খেয়েছিল রায়হান আর বলেছিল, পঞ্চাশ বছর পরে হলেও এর প্রতিশোধ নেব, দূরদর্শী আদনান সেদিনই বুঝে গিয়েছিল, একটি নারীকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের পথ যে দুটি ধারায় বয়ে গেল, কোনো দিন তার আর মিলিত হওয়ার আশা নেই। এরপর দিন যত গড়িয়েছে, দুজনের দূরত্বরেখা ততই বেড়েছে। সাতাশির নির্বাচনে দাদাজি, আব্বুজিসহ বাড়ির সবাই মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্টের জন্য প্রাণপাত করেছে, অথচ রায়হান এই মাটি ও মানুষের সাথে গাদ্দারি করে মিশে গেছে ন্যাশনাল কনফারেন্সের সাথে। এরপর ক্র্যাকডাউনে ফয়জুল্লাহকে ধরিয়ে দিয়েছিল যে ইখওয়ানি সদস্য,

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

হত্যা করার আগে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল আদনান, আর কে কে আছে তোমার সাথে; যুবক যাদের নাম বলেছিল, তাদের মধ্যে ছিল রায়হানের নামটিও। তবু আদনান কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ও শুধু তক্কে তক্কে ছিল সরাসরি ধরার। সহোদর বলেই কি না, রায়হানের এই দুর্গন্ধ ও আগবাড়িয়ে ঘাঁটতে চায়নি। যত দিন না নিজ থেকেই তা উন্মুক্ত হয়। ভুল ছিল আদনান। যাকে হাতেনাতে ধরার জন্য সুযোগ খুঁজছিল ও, সেই রায়হান কোনো সুযোগই দেয়নি ওকে। বরং তার হাতে পদানত হয়েছে আদনানের স্বপ্নের ক্যাম্প। ধ্বংস হয়েছে ওর সকল সহযোদ্ধা। ধূলিসাৎ হয়েছে ওর সকল অর্জন। শুধু কি তাই, রায়হানের প্রতিশোধপরায়ণ হাত পৌঁছে গিয়েছিল আদনানের হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত।

সেই রাতে খুব সাবধানে গুরিহাকায় প্রবেশ করেছিল আদনান। রায়হান ওকে খুঁজতে নূরজাহানের বাড়ি পর্যন্ত ছুটে গেছে, রায়হানের এই তৎপরতাই বলে দেয়, বসে নেই সে। এতক্ষণে সে নিশ্চয়ই আদনানকে ধরার জন্য গুরিহাকায় ওত পেতে আছে। এত কিছুর পরও গুরিহাকায় প্রবেশ ছিল আদনানের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। ইতোমধ্যে অনেকগুলো লোমহর্ষ অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছে আদনান। এই কারণেই কি ওর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল? আদনানের হাতে বিকল্পও ছিল না কিছু। যার হাতে ওর সকল অর্জন ধূলিসাৎ হয়, নিহত হয় বন্ধু-স্বজন-সহযোদ্ধা, হুমকির মুখে পড়ে নিজের জীবন, তাকে হত্যা না করে ও কীভাবে স্বস্তি পেতে পারে! আদনান জন্মগ্রামে প্রবেশ করেছিল প্রতিশোধ নিতে।

সে রাতের আকাশে চাঁদ ছিল না। গুরিহাকার পথ ঝিম মেরে ছিল এক দঙ্গল ঝিঁঝি পোকার অবিশ্রান্ত ডাকে। থেকে থেকে ডেকে উঠছিল দু-একটি সঙ্গীবিহীন ব্যাঙ। অন্ধকারে, বিড়ালের মতো নিঃশব্দে, সেই ঝিমধরা পথ অতিক্রম করছিল ওরা। রাহাপোরা বাজার পার হয়ে ওরা ত্যাগ করেছিল প্রচলিত পথ। উঁচু রাস্তা ছেড়ে নেমে এসেছিল অপরিচিত ও অপ্রচলিত এক সরু পথে। ঝোপঝাড়, গুল্মলতা যে পথকে আড়াল করে রেখেছে বাইরের দুনিয়া থেকে। আদনানের ইচ্ছা ছিল সরাসরি বাড়িতে প্রবেশ করবে। রায়হানকে পাওয়ামাত্র হত্যা করবে আর বাবা-মাকে খুলে বলবে পুত্রের কুবৃত্তান্ত। সেই সুযোগ পাওয়া গেল না। ঝোপঝাড়ে ছাওয়া গোপন পথ ছেড়ে বাড়ির আঙিনায় পা রাখতেই চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল বন্দুকের নল। হতভম্ব আদনান প্রতিরোধ করবার সুযোগটুকুও পেল না। ঝপাং করে ওর মাথার ওপর নেমে এল বস্তা। কেড়ে নেওয়া হলো অস্ত্র আর ঝটপট বেঁধে ফেলা হলো দেখা ও বলার ইন্দ্রিয়। সমান্তরালে একই ঘটনা ঘটল

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ইমতিয়াজের সাথেও। পৃথিবী অন্ধকার হওয়ার আগমুহূর্তে সৈন্যদের পেছনে রায়হানের মুখ দেখতে পেল আদনান। ঠোঁটে ক্রূর হাসি। চোখে বিজয়ের উদ্‌যাপন। একটু পর কোমরে খোঁচা খেল আদনান। রায়হান ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করল— অবশেষে সেই চড়টির প্রতিশোধ নেওয়ার দিন এল আজ।

ক্রোধে আদনান চিৎকার করতে গেল। কিন্তু গোঙানি ছাড়া অর্থসূচক কোনো বাক্য উৎপন্ন হলো না ওর কণ্ঠে। পাঁজাকোলা করে ওকে তোলা হলো একটি জিপে। সবকিছু এত নিঃশব্দে ঘটে গেল, অন্ধকারের গায়ে পড়ল না কোনো টোল, ঝিঁঝির ডাকের বিরামহীনতায় পড়ল না কোনো ছেদ। কেবল গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার সময় একমুহূর্তের জন্য থামল ওই শব্দবাদকেরা। তারপর আবার সেই কানধাঁধানো গান। গাড়িটি সশব্দে ছেড়ে যাওয়ার পর ভেতরবাড়ি থেকে ফয়জুল্লাহর উৎকণ্ঠামিশ্রিত উচ্চারণ ভেসে এল— কে! কে ওখানে!

বাবার জন্য মনখারাপ হলো আদনানের। ব্যথায় ভেঙেচুরে যেতে লাগল বুক। এত কাছে তার বাবা, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় এমন, অথচ তিনি জানতেও পারলেন না এই মায়াবী ঝিঁঝিডাকা রাতে তার আত্মজের যাত্রা শুরু হয়েছে এক অভিশপ্ত কয়েদখানার দিকে, যার আয়োজক তার আরেক আত্মজ রায়হান। এই নির্মম সত্যটা কোনো দিন কি জানতে পারবেন বাবা! আদনানের চোখের কোনায় জল এল। জোরে শ্বাস নিতে গিয়ে খুব কোমল, মায়াময়, স্নিগ্ধ একটা গন্ধ পেল ও। দাদাজি একবার বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের শৈশবের একটা মন কেমন করা গন্ধ থাকে। যেখানে তার শৈশব কাটে, গন্ধটা সেখানেই বসবাস করে। এরপর মানবশরীর থেকে একটু একটু করে ঝরতে থাকে শৈশবের পালক আর গন্ধটাও একটু একটু করে হতে থাকে ম্লান। একসময় গন্ধটা পুরোপুরি হারিয়ে যায়। কিন্তু বড় হওয়ার পরও যারা শৈশবকে অনুভব করে, শৈশবের কাছে ফিরতে চায়, তারাই কেবল এর গন্ধ খুঁজে পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়ার সময় শৈশবের ব্যক্তিগত গন্ধটা বুকের ভেতর নিয়ে গিয়েছিল আদনান। এরপর যতবার ও বাড়ি এসেছে, যাওয়ার সময় গন্ধটাকে নবায়ন করে সাথে নিয়েছে। আজ এই ভয়ংকর নিশুতি রাত্তিরে, যখন ওর চোখ-মুখ বাঁধা, যখন ওর পিঠে-পেটে ক্রমাগত কিল-থাপ্পড় পড়ছে, যখন শত্রু হয়ে গেছে দশমাস একসঙ্গে মাতৃগর্ভে কাটানো সহোদর, তখন শৈশবের প্রিয় গন্ধটার সঙ্গ অনুভব করে আদনান। কেউ যেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, ভয় পেয়ো না, আদনান। আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমি তোমার শৈশবের গন্ধ।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পানি খেয়ে শরীরের ভেতর সতেজতা অনুভব করল আদনান। কাঁপা হাতে শূন্য গ্লাসটা রাখতে গিয়ে উপলব্ধ হলো, উলঙ্গ ও। গায়ে একটি সুতা পর্যন্ত নেই। লজ্জায়, বেদনায়, অপমানে ও কুঁকড়ে গেল। জড়সড় হয়ে বসে, লজ্জাস্থান ঢেকে ও শব্দ করে কেঁদে ফেলল। পাহারাদার দুই পুলিশ সদস্য আদনানের অসহায়ত্বের বেদনা উপভোগ করতে লাগল দাঁত কেলিয়ে। সেদিকে তাকিয়ে এই নিস্তেজ শরীর নিয়েও থু করল আদনান।

ধরা পড়ার পর আনুমানিক তিন ঘণ্টা জিপের জার্নিতে ছিল ও। যত দূর মনে পড়ে, সেই জিপে ইমতিয়াজ ছিল না। সম্ভবত ওকে ভিন্ন কোনো গাড়িতে তোলা হয়েছিল। তিন ঘণ্টা পর চোখ বাঁধা অবস্থায় নামানো হয় ওকে। আঁকাবাঁকা কয়েকটি করিডর পেরিয়ে ওকে ঢোকানো হয় একটি কামরায়। তারপর বলা-কওয়া ছাড়া চালানো হয় অকথ্য নির্যাতন। উলঙ্গ করে, রশিতে ঝুলিয়ে উল্টে দেওয়া হয় ওর পৃথিবী। শরীরের প্রতিটি গিরায় গিরায় রুলের আঘাত করা হয় আর জোরপূর্বক বলতে বলা হয় 'জয় হিন্দ'। কিন্তু আদনান জয় হিন্দ বলেনি। মনে পড়ে ওর, সবকিছু ঝাপসা হওয়ার আগপর্যন্ত ওর মুখে ছিল একটাই জপ— আজাদি জিন্দাবাদ।

কড়িকাঠবিশিষ্ট উঁচু ছাদের কামরা এটি। নকশাকাটা দেয়াল। দেয়ালের গায়ে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। মোজাইক পাথরের প্রশস্ত মেঝে। মেঝেতে পাতা একটি টেবিল। টেবিলের দুপাশে মুখোমুখি দুটো হাতলওয়ালা চেয়ার। এর বাইরে আর কোনো আসবাব নেই। চেয়ারের হাতলে ঝুলছে আদনানের পোশাক। জানালা-দরজা বন্ধ থাকায় ছড়িয়ে আছে অন্ধকার। কেবল ঘুলঘুলি দিয়ে গড়িয়ে আসা একটুকরো আলোর রেখা সংকেত দিচ্ছে, অন্ধকার হলেও এখন দিন। ছাদের কড়িকাঠের সাথে এখনো ঝুলে আছে রশিটি, নৃশংস নির্যাতনের সাক্ষী হয়ে। ইমতিয়াজের কথা মনে পড়ে আদনানের। ওকেও নিশ্চয়ই রশিতে ঝুলিয়ে একই রকম নির্যাতন করা হয়েছে। চোখ ভিজে আসে আদনানের। আজাদির এত মূল্য!

পুলিশ দুটো বেরিয়ে গেলে একজন ভৃত্য আসে খাবারের প্লেট হাতে। প্লেট ভরা একটি রুটি। সঙ্গে আর কিছু নেই। একলা রুটি আদনানের দিকে তাকিয়ে উপহাস করে যেন। পুলিশ দুটোর চেহারায় যে কঠোরতা ছিল, ভৃত্যটির চেহারায় তা নেই। তার জড়সড় ভঙ্গি বলে দেয়, কেবল আদেশ পালন করতেই অভ্যস্ত সে। ভৃত্যের নিরীহ চেহারা আদনানকে আশান্বিত করে তোলে। অনুরোধ করে ও, ভৃত্যকে— আমার কাপড়গুলো দেবে, ভাই!

খাবার দেওয়ার বাইরে আর কিছু করার অনুমতি নেই আমার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে ভৃত্যটি। ত্রস্ত পায়ে বের হওয়ার উদ্যোগ নিয়ে আবার ফিরে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আসে সে। একবার দরজাটা দেখে নিয়ে কাপড়ের পোঁটলাটা ছুড়ে মারে আদনানের গা বরাবর। তারপর হনহন করে বেরিয়ে যায় বাইরে। দরজার ওপাশে তালা লাগানোর শব্দ হয়।

এই মুহূর্তে এই উলঙ্গ শরীরে পোশাক ফিরে পাওয়ার চেয়ে আরাধ্য কিছু ছিল না আদনানের। প্যান্ট-গেঞ্জি-পিরহান নিজের দিকে উড়ে আসতে দেখে সেগুলো লুফে নিতে একপ্রকার ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় ও, যেভাবে দক্ষ ফিল্ডার মারকুটে ব্যাটসম্যানের ক্যাচ লুফে নিতে লাফিয়ে পড়ে সবুজ ঘাসে। কিন্তু ঝাঁকুনি খেতেই ও টের পায়, শরীর ইতিমধ্যে আক্ষরিক অর্থেই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। নড়াচড়া করতেই শরীরের প্রতিটি কোষে অসহ্য যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে। ফুলে ব্যাঙ হওয়া পায়ের পাতায় এমন যন্ত্রণা, চিনারের শুকনো পাতার ছোঁয়াতেও যেন পাথর ছ্যাঁচার অনুভূতি হবে। দাঁড়াতে পারে না আদনান। ওর পা ওর শরীর বহনের ভার নিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। তারপরও দাঁতে দাঁত চেপে ও বহু কষ্টে পরে নেয় পোশাক। হাঁপিয়ে উঠে নতুন করে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসতে গিয়ে অনুভব করে গায়ে তীব্র জ্বর। পানিভরতি পিতলের গ্লাস কপালে ছোঁয়ালে গাওয়া হয়ে যাবে যেন। কত দিন এমন গা থমথমে জ্বর আসে না! ছোটবেলায় প্রায়ই ওর উথালপাতাল জ্বর আসত। মায়ের মুখের দিকে তখন তাকানো যেত না। সন্তানকে সুস্থ করবার প্রচেষ্টা তাকে এমনভাবে তটস্থ করে রাখত, মায়া লাগত আদনানের। সেই মা আজ পাশে নেই। এমন দিনে আপনজনের একটুখানি মমতার স্পর্শ সব ব্যথা ভুলিয়ে দিতে পারে। আপনজনের সূত্র ধরে মারিয়ামের কথা মনে পড়ে ওর। যুদ্ধের ডামাডোলে মারিয়ামকে আর খোঁজা হয় না ঠিক, কিন্তু এখনো প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে ও মারিয়ামকে অনুভব করে। চলার পথে মারিয়ামের উচ্চতার কোনো হিজাবি তরুণীকে দেখলেই শ্লথ হয়ে যায় ওর পায়ের গতি। তখন খুব করে কামনা করে, বাঁক ঘুরতেই ও যেন মারিয়ামের মুখটা দেখতে পায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত আল্লাহ ওর চাওয়া পূর্ণ করেনি। মারিয়াম কি তবে বেঁচে নেই!

ক্ষুধা পেটের ভেতর তোলপাড় করছে অথচ খাওয়ার রুচি নেই। বিস্বাদ লাগলেও রুটির কোনা ছিঁড়ে মুখে দেয় ও। ট্রেনিংয়ে ওদের শেখানো হয়েছিল, গ্রেপ্তার হলে ভেঙে পড়া যাবে না। মন খারাপ হবে, দুশ্চিন্তা হবে, কখনো কখনো মরে যেতে ইচ্ছা করবে, খাবারের প্লেট ছুড়ে ফেলতে মন চাইবে, কিন্তু নিহত ভাই আর ধর্ষিত বোনের মুখ কল্পনা করে টিকে থাকতে হবে। কোনো তথ্য ফাঁস করা যাবে না আর খাবার হিসেবে যা সামনে আসে,

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

তা-ই খেতে হবে গোগ্রাসে। অত্যাচারের মুখে টিকে থাকার জন্য সুস্থতার কোনো বিকল্প নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আদনান তাই খাবারটুকু খেয়ে নেয় পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখতে।

ঘণ্টা দুয়েক পর জুতায় মচমচ শব্দ তুলে এক যুবক অফিসার আসেন কামরায়। তিনি কোনো কথা না বলে সরাসরি টেবিলঘেঁষা একটা চেয়ার দখল করে বসেন। হাতের সিগারেট শেষ করে আদনানকেও আমন্ত্রণ জানান দ্বিতীয় চেয়ারে বসবার জন্য। যেন অনেক দিন পর দেখা হওয়া বন্ধুকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে চায়ের। অফিসারের কর্মকাণ্ড গোলকধাঁধার মতো লাগে। আদনান কতক্ষণ সরু চোখে তাকিয়ে থেকে বুঝে নিতে চায় পরিস্থিতি। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অফিসারের মুখোমুখি চেয়ারে বসে। অফিসারের গোঁফবিশিষ্ট ঠোঁটে খেলে যায় প্রশ্রয়ের হাসি। আদনানের বুকের মধ্যে একটু একটু করে জ্বলে ওঠে আশার বাতি। হয়তো খারাপ আর কিছু হবে না ওর সাথে।

অফিসার খুব আন্তরিকতা নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, নাম কী তোমার?

খুব আকর্ষণীয় না হলেও আদনান এক মাঝারি মাপের গুরুত্বপূর্ণ বন্দী। যার হাতে তাদের একটি ক্যাম্পের পতন হয়েছে আর নিহত হয়েছে সকল সৈন্য, অফিসার এমন বন্দীর নাম জানবে না, বিশ্বাস করা কঠিন। তারপরও আদনান পরিচয় দেয়— আমার নাম আদনান। বাবার নাম ফয়জুল্লাহ। বাড়ি গুরিহাকা। জেলা পেহেলগাম। শিক্ষার্থী কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়।

আদনান জানে, নাম দিয়ে শুরু করলেও ধীরে ধীরে পরিচয়ের সব শাখা-প্রশাখাই জানতে চাওয়া হবে। তাই তো ওর আগেভাগেই সব বলে দেওয়া। আদনানের স্তরের বন্দীরা সাধারণত মুখ বন্ধ করে রাখে। ওর এই স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা অভাবনীয়। খুশি হয়ে যান অফিসার। চা খাবে? লবণ-চা?

না। আদনান অফিসারের ফাঁদে পা দেয় না।

অফিসার দ্বিতীয় সিগারেট ধরান। খুব আয়েশি ঢঙে একটু একটু করে সিগারেটটিকে ছাই বানান তিনি। আদনানের মুখের সামনে শুভ্র ধোঁয়ার ঢেউ ভাঙতে থাকে।

ইয়াসিন মালিককে চেনো?

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হচ্ছে তাহলে। ভেতরে-ভেতরে সতর্ক হয়ে ওঠে আদনান। একটু সময় নিয়ে ও বলে, ইয়াসিন মালিক কাশ্মীরের জাতীয় ব্যক্তিত্ব। তাকে চেনে না এমন কোনো মানুষ হয়তো নেই এই উপত্যকায়।

সে থাকে কোথায়?

তা তো জানি না।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

এই যে বললে চেনো অথচ কোথায় থাকে জানো না।

আপনিও তাকে চেনেন অথচ আপনিও জানেন না কোথায় থাকেন তিনি। আসলে আপনার আর আমার চেনার মধ্যে কোনো তফাত নেই।

কিন্তু আমি তার শত্রু আর তুমি তার বন্ধু।

আমি খুব সামান্য মানুষ। তার মতো বিখ্যাত মানুষের বন্ধু হব কী করে!

অফিসারের চেহারার রং এবার পরিবর্তন হয়ে যায়। ইয়ার্কি করছ? দুই দিন ঝুলিয়ে পেটানোর পরও তুমি ইয়ার্কির পর্যায়ে আছ! আশ্চর্য!

আমি খুব সহজ কথা বলেছি। তারপরও আমার কথাটাকে কেন আপনার ইয়ার্কি মনে হলো, জানি না।

তুমি আমাদের মূল্যবান যোদ্ধাদের হত্যা করেছ। এরপরও তোমাকে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছি, এটা আমাদের উদারতা। উদারতাকে দুর্বলতা না ভেবে জলদি জবাব দাও। ইয়াসিন মালিকের সাথে তোমার কবে সাক্ষাৎ হয়েছে?

ইয়াসিন মালিকের সাথে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয়নি।

তবে ক্যাম্পে আক্রমণ করার অস্ত্র কোথা থেকে পেয়েছিলে?

আদনান কথা বলে না আর। চোয়াল শক্ত করে ও থমথমে মুখে বসে থাকে। পিনপতন নীরবতা নেমে আসে কক্ষে। দরজার গায়ে কারো পায়চারি করার, যাওয়া-আসা করার ছায়া পড়ে। হঠাৎ ধাঁ করে এক চড় উড়ে আসে আদনানের গালে। পাক খেয়ে পড়তে পড়তে শেষ মুহূর্তে সামলে নেয় ও। অফিসার কতক্ষণ দাঁত কিড়মিড় করে শান্ত হন অথবা শান্ত হওয়ার অভিনয় করেন। মাথা ঝুঁকিয়ে আদনানের চোখে চোখ রেখে সরু গলায় বলেন, ইয়াসিন মালিককে ধরিয়ে দিলে তোমার সাজা মওকুফের ব্যবস্থা করব। এখান থেকে তুমি সসম্মানে বের হয়ে যেতে পারবে।

আদনান অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে অফিসারের দিকে। অফিসার ইয়াসিন মালিকের সন্ধান চান অথচ আদনানের কাছে সন্ধান নেই। হ্যাঁ, কয়েকবার দেখা হয়েছে ইয়াসিন মালিকের সাথে। প্রতিটি সাক্ষাতের জায়গা ছিল ভিন্ন। আবার নিরাপত্তার খাতিরে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চোখ বেঁধে। আদনান কীভাবে ইয়াসিন মালিকের খোঁজ দেবে, যেখানে সে নিজেই জানে না মানুষটা কোথায় থাকে। আর জানলেও এত সহজে মুখ খোলার শিক্ষা তো ওকে দেওয়া হয়নি।

বলবে, নাকি আবার রশিতে ঝোলাব? টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে উঠে দাঁড়ান অফিসার।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আমি সত্যিই জানি না তিনি কোথায় থাকেন। আদনানের গলার স্বরের মাঝে জেদ প্রকাশ পায়।

কেন খামোখা মিথ্যা কথা বলছ! অফিসার ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে আদনানের চারপাশে ঘুরতে থাকেন। একই প্রশ্ন আরো কয়েক দফা উত্থাপন করার পরও সদুত্তর না পেয়ে খ্যাপা ষাঁড় হয়ে যান তিনি। পাহারাদার পুলিশ দুটো ছুটে এসে আদনানের ব্যথায় জর্জর শরীরটাকে আবার ঝুলিয়ে দেয় রশিতে। সূচিত হয় নির্যাতনের নতুন অধ্যায়। লাগাতার দুটো সপ্তাহ ওকে অবুঝ শিশুর হাতের খেলনার মতো ব্যবহার করা হয়। শিশুর হাতের খেলনা যেভাবে দ্রুত পুরোনো হয়ে যায় এবং একবার খেলার পর নতুন খেলনা না পেলে শিশু যেভাবে আগের খেলনাকে ভিন্নভাবে খেলার কসরত করে, আদনানের পুরুষ্ট শরীরটাকেও তারা খেলনা বানিয়ে নানা কায়দায় খেলতে থাকে। প্রতিদিনই একটু একটু করে পরিবর্তন আসে তাদের খেলার ধরনে আর হিংস্রতাও বাড়তে থাকে সমান তালে। এর ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে জিজ্ঞাসাবাদ। আদনান এত দিন যা শুনে এসেছে লোকমুখে আর শিউরে উঠেছে ক্ষণে ক্ষণে, লোমহর্ষ সেই ঘটনাগুলো আদনানের সাথেই ঘটতে থাকে প্রতিদিন। একদিন গরম পানিতে চোবানো হয় ওকে। আরেক দিন নখের নিচে ফোটানো হয় সুচ। একদিন ওর চোখের ভেতর ছিটিয়ে দেওয়া হয় লাল মরিচের গুঁড়ো। আরেক দিন ওর পুরুষাঙ্গের সাথে বেঁধে দেওয়া হয় আধখানা ইট। পরের সপ্তায় বিদ্যুতায়িত চেয়ারে বসিয়ে ওর সামনে পরিবেশন করা হয় এলাচি ফুলের চা। বিদ্যুতের ছোবল খেতে থাকা আদনান যখন চা খেতে ব্যর্থ হয়, তখন সুবাসিত ওই গরম চা ঢেলে দেওয়া হয় ওর মাথায়। অমানুষিক নির্যাতনের ছোবলে ছোবলে একটু একটু করে ক্ষয় হতে থাকে ওর শরীর। দিনে দিনে ব্যথার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোও পেতে থাকে লোপ। এরপর কিছুদিন বিরাম দেওয়া হয় ওকে, হয়তো মূল্যবান বন্দীকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থেই। নিজের বিধ্বস্ত শরীরখানার দিকে তাকিয়ে আদনান ক্লিষ্ট হাসি হাসে। বর্বরতার চেনাজানা সকল পদ্ধতি সম্ভবত খরচা করে ফেলেছে ওরা। ওদের তূণীরে বোধ হয় শেষ তিরটিও আর অবশিষ্ট নেই। বিপন্নতার মাঝেও মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে আদনান— এ যাত্রায় বোধ হয় টিকেই গেল ও। নিজের পোষমানা শরীরটার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে ও। ব্যথাজর্জর শরীর নিয়েও যখন মনে মনে স্বস্তি অনুভব করে ও, ঠিক তখনই নির্যাতনের সবচেয়ে বর্বর এবং রোমহর্ষ পদ্ধতির আয়োজন করা হয়। তৃতীয় সপ্তাহের শুরুতে ওর কামরায় আসে ভিন্ন একটি দল, চেহারাই যাদের হিংস্রতার পরিচয় বহন করছে। কসাইদের পশু জবাই করার মতো ওরা ঝটপট আদনানের দুই হাত এবং দুই

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পা দুদিক থেকে প্রসারিত করে বাঁধে। এরপর ওর পুরুষাঙ্গের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় তামার বৈদ্যুতিক তার। শৈশবে দাদাজির মুখে কেয়ামতের ভয়াবহতার অনেক রকম গল্প শুনেছে আদনান। শুনতে শুনতে ভয়ংকর সেই মুহূর্তটির একটি কল্পিত ছবি খোদিত হয়ে গিয়েছে ওর মনে। কিন্তু ইলেকট্রিক সুইচ অন করার পর ওর কেয়ামত-সম্পর্কীয় সকল কল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যায় মুহূর্তে। পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে রচিত হওয়া নিপীড়নের যত ইতিহাস, সব এসে নত মাথায় আছড়ে পড়ে আদনানের পায়ের কাছে, আত্মসমর্পণ করে এর নৃশংসতার সামনে। এক বীভৎস আগুনে রাক্ষস এক শতাব্দীর ক্ষুধা নিয়ে যেন চিবোতে থাকে ওর ন্যাতানো মাংসপিণ্ডটি। ওর প্রতিটি শিরার ভেতর দিয়ে যখন অজস্র আগুনের গোলক ছোটাছুটি শুরু করে, মনে হয়, মৃত্যু একমুহূর্তের ব্যাপারমাত্র। ব্যথায়, যন্ত্রণায় ও এমনভাবে তড়পাতে থাকে, ওর গগনবিদারী চিৎকারে খসে পড়ার উপক্রম হয় পুরোনো বিল্ডিংয়ের পলেস্তারা। মাত্র কয়েক মিনিটের অগ্নিবাণ, অথচ ওর রক্তের ভেতর দিয়ে যেন অনন্তকালব্যাপী আগুনের ছুরি প্রবাহিত হয়ে চলে। একপর্যায়ে জ্ঞান হারায় আদনান। কতক্ষণ পর জ্ঞান ফেরে ওর, উপলব্ধি করতে না পারলেও বুঝতে পারে, যে কামরায় কেয়ামত এসেছিল, এখন ও সেই কামরায় নেই। আগের কামরাটি ছিল বড়, নির্জন, ভৌতিক, ক্ষয়িষ্ণু। এই কামরাটি ছোট এবং জনচঞ্চল।

তার জ্ঞান ফিরেছে। চোখ মেলে ডানে-বাঁয়ে তাকাতেই কথাটা কানে পশে আদনানের। মুখের ওপর ঝুলে আছে কড়িকাঠযুক্ত বিষণ্ন ভারী ছাদ। জানালা-দরজা বন্ধ। স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে ছড়িয়ে আছে দুর্গন্ধ। এরই মাঝে কড়িকাঠের সাথে বাসা বুনছে এক স্বপ্নবান মাকড়সা। কোথাও কেউ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। আবদ্ধতার কারণে চিৎকারের প্রকৃত নাদ এ ঘরে না পৌছালেও চিৎকারটির পেছনে যে তীব্র যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে এবং চিৎকারটি যে হৃদয় ফেড়ে বের হচ্ছে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আদনানের কেন জানি মনে হয়, ওই চিৎকারটি তারই কলিজা থেকে উৎসারিত। ওর পুরুষাঙ্গের ভেতর তামার তার ঢুকিয়ে দেওয়ার পর ও যে গগনবিদারী চিৎকারে ফেটে পড়েছিল, সেই চিৎকার যেন এখনো ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে-বাতাসে। অনন্তকাল ধরে এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়াতেই থাকবে তা।

এখন ও কোথায় আছে, কেমন আছে, পাশে কারা ফিসফিস করছে—কিছুই জানতে ইচ্ছা করে না ওর। ও এখনো বেঁচে আছে, নির্বিঘ্নে শ্বাস নিতে পারছে, এটুকুর অনুভবই যথেষ্ট ওর জন্য। তাই সবকিছু ভুলে উদাসীন বালকের মতো ও সংসারী মাকড়সাটার দিকে তাকায়। এই জাহান্নামের মধ্যে বসেও মাকড়সাটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনে চলেছে, তার এই প্রাণশক্তি অবাক

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

করে আদনানকে। ঘুলঘুলি দিয়ে নেমে আসা রোদ আদনানের মুখের ওপর স্থির হলে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না ও। গায়ের ওপর দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা কম্বল। পাশ ফিরতে গিয়ে ও বুঝতে পারে, কম্বলের ভেতরের দেহটা নগ্ন। এই স্থানিক বোধশূন্য অবস্থায়ও দৈহিক নগ্নতা অনুভব করে সংকুচিত হয়ে ওঠে ওর অন্তর্গত সত্তা। ওর অবচেতন হাত কম্বলটা চেপে ধরে সম্ভ্রমের সম্মান নিশ্চিত করতে চায়। দুই তরুণ, যাদের বয়স বিশের ওপরে হবে না কোনোভাবেই, হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে আসে আদনানের কাছে। বলে, উঠে বসবেন? আল্লাহকে ধন্যবাদ যে আপনি জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন।

তোমরা কারা? কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে আদনান।

আমি শাফি আর ও হারুত। আর ওই যে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে, ও আসাদ। আমরা আপনার সম্পর্কে জেনেছি। আপনি অনেক বড় কমান্ডার। শাফি নামের ছেলেটি আন্তরিকতা নিয়ে কথাগুলো বলে।

আপনার মতো আমাদের ওপরও একই রকম নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়েছে। আমাদের পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আমরা ঠিকমতো হাঁটতে পারি না। নির্যাতন শেষে ওরা আমাদের এই কামরায় বন্দী করে রেখেছে। আপনি কি উঠতে পারবেন? আপনার পিরহান আমাদের কাছে আছে। খুব কষ্ট না হলে আপনি পোশাক পরে নিন। ওরা আপনার সংজ্ঞাহীন দেহ এখানে ছুড়ে ফেলে গিয়েছিল। আমরা কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে আপনার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষা করছিলাম। ভাগ্যিস আপনি জেগে উঠেছেন। হারুত নামের ছেলেটির প্রতিটি বাক্য থেকে বিষণ্নতা ঝরে পড়ে।

তোমাদের কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

আমরা জেকেএলএফের যোদ্ধা। পুলওয়ামা জেলায় আমাদের বাড়ি। বাড়িতে মায়ের সাথে দেখা করতে গিয়ে টহলরত প্যারামিলিটারির হাতে ধরা পড়ি। তারপর ওরা আমাদের এখানে নিয়ে আসে। এটা হরি সিং নির্মিত প্রাসাদ। ভারতীয় সেনাবাহিনী একে বিদ্রোহীদের শাস্তি সেল হিসেবে ব্যবহার করছে। আপনি পাপা-২-এর নাম শুনে থাকবেন। এটাই সেই কুখ্যাত পাপা-২ নির্যাতনকেন্দ্র।

আদনান ঝাপসা চোখে ছেলে দুটোর দিকে তাকায়। কতই-বা বয়স ওদের। মাত্রই গজাতে শুরু করেছে গোঁফ-দাড়ি। চেহারা থেকে এখনো সরে যায়নি কৈশোরিক লাবণ্য। অথচ এই বয়সেই জীবন ওদের পৃথিবীর ভয়ংকরতম এই প্রকোষ্ঠে এনে ফেলেছে।

কম্বলের ভেতর থেকে আদনান পোশাক পরার চেষ্টা করে। শরীরের প্রতিটি কোষে কোষে জমাট বেঁধে আছে তীব্র ব্যথা। কিন্তু আদনান আজ আর

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পাত্তা দেয় না। বোঝা যায়, পরিস্থিতি ওর সহ্যক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে। ট্রাউজার কোমরে তুলতে গিয়ে পুরুষাঙ্গের ভেতর ভয়ংকর এক যন্ত্রণা অনুভব করে ও, যে যন্ত্রণার মুখোমুখি কম পুরুষই হয়েছে পৃথিবীর। হঠাৎ কী ভেবে ওর বুকের ভেতরটা ধুকপুক করে ওঠে। সমগ্র সত্তা দিয়ে ও পুরুষাঙ্গের কার্যক্ষমতা ও এর অনুভূতিশক্তি বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। একটুকরো অবশ মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছু নয় যেন সেটা। হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছা করে আদনানের। ওরা ওকে এইভাবে নিঃস্ব করে দিল! ওরা ওর মর্মে মর্মে এইভাবে লাঞ্ছনা ঢুকিয়ে দিল! মা অথবা বাবাকে কাছে পেলে ও জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে করে কাঁদতে পারত। কিন্তু এই বৈরী পরিবেশে, শত্রুর গুহার মধ্যে বসে ও কাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবে!

বেশিক্ষণ শুয়ে থাকা হয় না আদনানের। ছারপোকা ও উকুনের অভয়ারণ্য এই কম্বল। এই কম্বল গায়ে কীভাবে ওর রাতগুলো কাটবে। ধীরে ধীরে উঠে বসে ও। দেয়ালে হেলান দিয়ে ভাবলেশহীন বসে থাকা আসাদকে পর্যবেক্ষণ করে। আসাদ আদনানেরই বয়সী। শাফি ও হারুত কাছে এসে কথা বললেও সে চুপচাপ এবং দূরে। আদনান শাফির কাছে জিজ্ঞেস করে আসাদ সম্পর্কে। কেন সে চুপচাপ। কেন সে কথা বলে না। যদিও প্রশ্নটা অবান্তর, কেননা, এখানে চুপচাপ থাকাটাই নিয়ম।

শাফি জানায়, আসাদকে শাস্তি সেলে দিনের পর দিন তীব্র আলোর বাল্বের সামনে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। যে আলো ছাড়া আমরা পথ চলতে পারি না, সেই আলো ওর দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে।

স্তম্ভিত হয়ে যায় আদনান। নিজের ভাগ্যের সাথে মেলাতে থাকে আসাদের ভাগ্য। কে বেশি দুর্ভাগা— আদনান, না আসাদ? দুই যুবক, যাদের একজন হারিয়েছে যৌনশক্তি এবং অপরজন দৃষ্টি, তাদের দুর্ভাগ্যের তুল্যমূল্য বিচার করবার কোনো নিক্তি কি আবিষ্কৃত হয়েছে পৃথিবীতে? বুকভরা হুতাশন নিয়ে অজানা-অচেনা ভাগ্যবিড়ম্বিত ওই যুবকের পাশে গিয়ে বসে আদনান। বড় মমতা নিয়ে অন্ধ যুবককে বুকের সাথে জাপটে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে ও। আদনানের মমতার চাপ আরো তীব্র হয়, যখন আসাদ শীতল কণ্ঠে বলে, আমি আর কোনো দিন আম্মুজির মুখ দেখতে পারব না!

রাতে রুটির সাথে যে তরকারি আসে, তাকে কোনোভাবেই চিনতে পারে না আদনান। দীর্ঘশ্বাস গোপন করে না খেয়েই ও শুয়ে পড়ে উকুন-ছারপোকাকে সাথি বানিয়ে। এত ক্লান্তি শরীরে, এত অবসাদ হৃদয়ে, তবু ঘুম আসে না ওর। একে তো সারা রাত ধরে জ্বলতে থাকে বৈদ্যুতিক বাল্ব, তার ওপর উকুন-ছারপোকার উৎপাত। ছারপোকার সাথে যুদ্ধ করতে করতে ওর

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

রাত পোহায়ে যায়। শেষ রাতে যখন চোখের পাতা লাগি লাগি করে, তখন এক অদ্ভুত দৃশ্যে আটকে যায় ওর ঘুম ঘুম দৃষ্টি। কামরার এক কোনায় একটি কম্বলের দুই প্রান্ত ধরে আড়াল তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে শাফি ও আসাদ। দুজনের মাথাই নিচু। কম্বলের দেয়ালের আড়ালে বসে কিছু একটা করছে হারুত। ঘটনার সমাপ্তি পর্যন্ত সঙ্গ দিতে পারে না ওর ক্লান্ত চোখ। সারা রাতের নির্ঘুম অবসন্ন শরীর নিয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ে কয়েক ঘণ্টার জন্য। ঘটনা খোলাসা হয় দুপুরবেলা। ওদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারবার কোনো ব্যবস্থা নেই এই কামরায়। প্রয়োজনের সময় দুজন কম্বলের আড়াল তৈরি করে দাঁড়ায়, তৃতীয়জন পলিব্যাগের ভেতর মলত্যাগ করে জানালা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে। খাওয়ার জন্য যে সামান্য পানি দেওয়া হয়, তা দিয়ে করা হয় শৌচকর্ম।

এমনিতে আমাদের খাবার দেওয়া হয় খুবই কম। তারপরও আমরা কম খাই, যেন মলের আধিক্য আমাদের বিড়ম্বনা না বাড়ায়। ঘটনার বিবরণ শেষে পরিহাস করে বলে শাফি।

বিস্মিত হতে হতে আদনানের হৃদয়টা এক্ষণে ভোঁতা হয়ে গেছে। এখানকার কোনো দৃশ্য কিংবা ঘটনা এখন আর ওকে হতভম্ব করে না। কিন্তু একটি পলিব্যাগ নিয়ে ও যখন পর্দার আড়ালে বসে আর প্রস্রাবের রাস্তায় অনর্গল রক্ত আসতে দেখে, তখন ক্রোধের আগুন দিয়ে পৃথিবীর সকল ফুলেল উৎসবকে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে দিতে ইচ্ছা করে।

এক মাসের ব্যবধানে আরো দুজন বন্দী আসে ওদের সেলে। স্যাঁতসেঁতে কামরায়, দুশ্চিন্তা, পুষ্টিহীনতা ও নির্ঘুমতায় দিনে দিনে ওদের শরীর শুকাতে থাকে। চোখের নিচে পড়তে থাকে কালি। আজাদির যে স্বপ্ন নিয়ে একদিন ওরা ঘর ছেড়েছিল, সেই স্বপ্নের কুঁড়ি ধীরে ধীরে বাসি হতে থাকে। একদিন আচমকা ওদের সামনের জানালাটা হাট করে খুলে যায়। ওদের স্বপ্নহীন চোখের সামনে ঝলমলিয়ে ওঠে সবুজ মাঠ, ফুলের বাগান, বৃক্ষসারি। কত দিন পর ওরা সবুজ দেখল! কত দিন পর ওরা পৃথিবী অবলোকন করল! এই ছোট্ট ঘরে ছয় বন্দীর মাঝে সবুজের উৎসব শুরু হয়ে যায়। সবুজ থেকে চোখ ফেরাতে না ফেরাতে সূর্যের সর্বব্যাপী আলো হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ওদের ঠান্ডা ঘরে। রোদেলা মেঝের ওপর ওরা উকুন-ছারপোকাওয়ালা কম্বল বিছিয়ে দেয়, যেন কম্বল দিয়ে কাঁচাসোনা রোদকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা, যেন সুযোগ পেলেই পরম প্রার্থিত এই রোদ পালিয়ে যাবে আবার। রোদের উত্তাপে যখন কম্বল গরম হয়, সেই গরম কম্বলের প্রান্ত ওরা পালাক্রমে গালে মাখে। গরম কম্বলকে ওদের মনে হয় মায়ের হাত।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

একদিন জানালার শিক ধরে উদাস মনে দাঁড়িয়ে ছিল আদনান। সবুজ মাঠের প্রান্তে এক জোড়া এপ্রিকটগাছ, তার মাথার ওপর চক্কর কাটছিল একটি চিল। ঈর্ষার কাঁটা খচখচ করে ফুটতে থাকে আদনানের বুকে। চিল, বন্য পাখি হয়েও তার আছে একটি স্বাধীন আকাশ। আর আদনানদের মতো আশরাফুল মাখলুকাতকে সেই আকাশ দেখতে হয় গারদের এ পাশ থেকে। আচমকা জানালার ওপাশে এক প্রৌঢ় পুলিশ সদস্য এসে দাঁড়ায়, নিঃশব্দে। চমকে ওঠে আদনান। তোমার সাথে জরুরি কথা আছে— চারপাশ দেখে নিয়ে কাশ্মীরি ভাষায় ফিসফিস করে পুলিশ।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না আদনান— আপনি কাশ্মীরি?

আদনানের প্রশ্নের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই পুলিশটির। সে বলে চলে নিজের কথা— অনেক দিন ধরে সুযোগ খুঁজছিলাম। জানালাটা খোলার ব্যবস্থা আমিই করেছি। আগামীকাল রাতে আমার ডিউটি আছে। রাত বারোটার পর জানালায় থাকবে। বলেই বিস্ময় রেখে ভৌতিক ছায়ার মতো সরে যায় পুলিশ। বিস্ময় আদনানের পায়ে শিকড় গজিয়ে দেয় যেন। হতভম্ব ও কতক্ষণ সরতে পারে না জানালার শিক থেকে। সহবন্দীদের কাছে ঘটনা শেয়ার করবে কি না, বুঝতে পারে না। নিজের সঙ্গে দ্রুত বোঝাপড়া করে নেয় ও, ঘটনার চূড়ান্ত খোলাসা না হওয়া পর্যন্ত গোপন রাখতে হবে সব। তখনো আনমনে উড়ছে চিলটি। জানালা থেকে মুখ ঘোরাতেই ও মুখোমুখি হয় শাফির— কী বলে পুলিশটি?

থতমত খায় আদনান। সামলে নিয়ে আমতা-আমতা করে বলে, তেমন কিছু নয়, জানালায় কেন দাঁড়িয়ে আছি তাই নিয়ে রাগ ঝাড়ল। বাড়াবাড়ি করলে জানালাটা আবার আগের মতো বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দিল।

নিজের মিথ্যায় নিজেই অবাক হয়ে যায় আদনান। এত দ্রুত ও কীভাবে এই বাক্যটা সাজাতে পারল! সময় কি তবে মানুষকে দিয়ে সব করিয়ে নিতে পারে!

প্রবল উত্তেজনা নিয়ে আদনান পরদিনের রাত বারোটার অপেক্ষায় রইল। মনের মধ্যে কত রকম ভাবনা যে উঁকি মারছে। পুলিশটি নিশ্চয়ই কাশ্মীরি। আদনানের সাথে তার কী এমন গোপন কথা থাকতে পারে! তবে কি মুক্তির কোনো দরজা খুলতে যাচ্ছে? বেশি আশা করতে ভয় হয় আদনানের। হতে পারে পুলিশটি আর এলই না। কিংবা এটা কোনো ফাঁদ, তাকে বাজিয়ে দেখা হচ্ছে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

রোদ এবং পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের কারণে উকুন-ছারপোকার উৎপাত কমেছে। ইদানীং তাই দ্রুতই ঘুম নেমে আসে সহবন্দীদের চোখে, যদিও সারা রাত ধরে জ্বলতে থাকে আলো। এগারোটার পর কামরাটা সুনসান হয়ে এলে আদনান জানালার পাশে ঘুরঘুর করতে থাকে। মনের ভেতর দুলতে থাকে পেন্ডুলামের ঘণ্টা। কথা রাখবে তো লোকটা?

ঠিক বারোটার সময় বারান্দার মাথায় মচমচ শব্দ শোনা যায়। শব্দটা ধীরে ধীরে এদিকেই আসছে। অমনি উৎকর্ণ হয়ে ওঠে আদনান। উত্তেজনায় খাড়া হয়ে ওঠে রোমকূপ। খানিক পর গতকালের সেই পুলিশের মুখ এসে স্থির হয় জানালার সামনে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম পুলিশের। মুখস্থ পড়া বলার মতো সে হড়বড় করে বলতে শুরু করে : আমি এক কাশ্মীরি। জীবিকার প্রয়োজনে পুলিশে ঢুকেছিলাম। কিন্তু এখন যা চলছে চারপাশে, সহ্য করতে পারছি না। আমার বন্দুক ব্যবহৃত হচ্ছে আমারই ভাইয়ের ওপর। তোমার বীরত্ব সম্পর্কে আমি জেনেছি। পুলিশ তোমার বিরুদ্ধে চার্টশিট দাখিল করেছে। শিগগিরই বিচার শুরু হবে তোমার। আর বিচারে তোমাদের মতো যোদ্ধাদের মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হয় শুধু।

শীতল হয়ে আসে আদনানের হাত-পা— তাহলে?

আমি তোমাকে বাঁচানোর উপায় খুঁজছি। যদিও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সেই প্ল্যান। আগামী বুধবার এখানকার প্লে-গ্রাউন্ডে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন সবাই ব্যস্ত থাকবে অনুষ্ঠানে। আমি তোমাকে আমার এক সেট ইউনিফর্ম সাপ্লাই করব। সেটা পরে ছদ্মবেশে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। এটা স্রেফ এক নির্যাতনকেন্দ্র। কারাগারের মতো কড়াকড়ি এখানে নেই। এটা তোমাকে সুবিধা দেবে। আর হ্যাঁ, ইউনিফর্মের সাথে একটা ক্ষুরও থাকবে। সুযোগ করে গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে নিয়ো। এতে তোমার ছদ্মবেশ আরো পোক্ত হবে।

এরপর আপনি তো ফেঁসে যাবেন।

আমার জন্য ভেবো না, যুবক। আমিও তোমাদের মতো আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাব। কটা টাকার জন্য দিনের পর দিন আমার ভাইদের কলজেছেঁড়া আর্তনাদ আমি সইতে পারছি না। ওই আর্তনাদ আমাকে ঘুমাতে দেয় না। এভাবে চলতে থাকলে একদিন পাগল হয়ে যাব।

আর আমার সাথিরা?

তারা গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়। পাঁচ-ছয় মাস পর এমনিতেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। ওদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে এ জন্য যে পরবর্তী সময়ে তারা

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

যেন যুদ্ধের নাম মুখেও না আনে। চললাম আমি। কুচকাওয়াজের আগের রাতে ইউনিফর্ম পেয়ে যাবে।

মুক্তির সুসংবাদ রেখে ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে যায় পুলিশটি। খুশির সম্মোহনে আদনান অনেকটা সময় দাঁড়িয়েই থাকে জানালা ধরে। এখান থেকে একটুকরো আকাশ দেখা যাচ্ছে, গাঢ় নীল। আদনান রাতের ওই নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে, হে আকাশ, আমি আসছি, তোমাকে ছুঁতে।

একুশ

কোথায় যাব, আপনি নির্দিষ্ট করে কিছুই বলছেন না কিন্তু! কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে খর্বাকৃতির অটোচালক।

পুলিশকে এরা এতটাই ঘৃণা করে! কোনো শ্রদ্ধাবোধ তো নেই-ই, ভয়ডরও নেই। মুখের ওপর কেমন কটকট করে কথা বলছে! অটোচালকের কোমরে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে ধমক মারে আদনান— বেশি কথা না বলে সামনে বাড়ো। সময় হলে বলব কোথায় থামতে হবে।

পুলিশের ইউনিফর্ম পরে সবার চোখের সামনে দিয়ে পাপা-২ নির্যাতনকেন্দ্র থেকে যখন বেরিয়ে এসেছিল আদনান, নিরাপদে; স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শুকরিয়া জানিয়েছিল আল্লাহর আর মনে মনে বলেছিল, আপাতত মুক্তি! কিন্তু ওর এই স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। নির্যাতনকেন্দ্রের প্রধান ফটকের পঞ্চাশ গজের ভেতর একটি মুদিদোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল দুই পুলিশ সদস্য। আদনানকে দেখেই তারা ছুড়ে ফেলে সিগারেট আর ছুটে আসতে আসতে বলে, স্যার, এই সময় কোথায় চললেন?

ফাঁপরে পড়ে আদনান। নিরাপদে শত্রুর গুহা ত্যাগ করে এই মুক্ত আকাশের নিচে যদি খুলে যায় ওর ছদ্মবেশ, এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক কিছু হবে না। পা সোজা করে, ক্যাপ টেনে মুখটা আরেকটু ঢেকে নিয়ে, কাশতে কাশতে, কণ্ঠের প্রকৃত স্বর আড়াল করে, দূর থেকে ও বলে, তোমরা ভেতরে যাও, আমি আসছি।

মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে দুজন। স্যারের আচরণে ওরা কি সন্দেহজনক কিছু পেয়েছে? হতবুদ্ধি ভাব নিয়ে খানিকটা সময় ওরা দাঁড়িয়েই থাকে। আদনান নিঃশব্দে ফটকের দিকে হাত ইশারা করে— কী হলো, যাও!

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

এরপর আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। পা টেনে টেনে তারা হাঁটতে থাকে পাপা-২-এর ফটকের দিকে আর আদনান ততক্ষণে পেরিয়ে যায় সামনের মোড়টা। পুলিশদ্বয় চোখের আড়াল হতেই ও লাফিয়ে ওঠে একটা অটোতে আর নির্দেশ করে সামনে বাড়ার। অটো চলতে থাকে পিচঢালা কালো রাস্তা ধরে আর আদনান বারবার পেছন ফিরে দেখে পুলিশের উপস্থিতি। ও যখন নিশ্চিত হয়, কেউ ওর পিছু নেয়নি, রুগ্‌ণ শরীরটা ও এলিয়ে দেয় সিটের ওপর। চোখ বন্ধ করতেই পাপা-২-এ রচিত ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সকল ব্যথা ও যন্ত্রণা হুড়মুড় করে ফিরে আসে শরীরে, রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় এতক্ষণ যা সুপ্ত ছিল।

রাস্তাটা নিরিবিলি। খানিক পরপর চোখে পড়ছে দু-চারজন পথচারী। এক বৃদ্ধ একটি ফারগাছের নিচে কলার ভ্যান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খদ্দেরবিহীন। মুদিদোকান থেকে এক শিশি তেল নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে এক বালক। সদ্য ঘুমভাঙা এক নেড়ি কুকুর আড়মোড়া ভাঙছে ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি খেয়ে। লালচকের কাছাকাছি আসতেই বদলে গেল দৃশ্যপট। মানুষের ভিড়ের সাথে উঁকি মারতে লাগল পুলিশ ও টহলরত প্যারামিলিটারির বন্দুকের নল। বাসস্ট্যান্ডের সামনে একটি চেকপোস্ট, চেকপোস্টকে ঘিরে কয়েকটি অটোর লম্বা লাইন। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল আদনানের। পুলিশ, প্যারামিলিটারি কি সব সময়ই এমন তৎপর থাকে! নাকি ওর পালানোর খবর রটে গেছে সবখানে! তাই যদি হয়, তবে এই চেকপোস্ট ওর জন্যই।

অটো বাঁয়ের গলিতে ঢোকাও! আদনান চিৎকার করে ওঠে হঠাৎ।

আপনি যাবেন কোথায়, বলুন তো! বিরক্তি নিয়ে গলির ভেতর অটো ঢুকিয়ে দেয় চালক। আর তখন পেছন থেকে চেকপোস্টের দিকে শাঁ করে বেরিয়ে যায় একটি পুলিশ জিপ। ভাগ্যিস, গলিতে ঢুকে পড়ায় আদনানকে দেখতে পায়নি ওরা।

আমি যেখানে যেতে বলি, সেখানে যাও। ধাতস্থ হয়ে বলে আদনান।

আপনি পোশাকে পুলিশ অথচ আচরণে জঙ্গি, যেন আর্মির তাড়া খেয়ে মরতে বসেছেন। মিনমিন করে বলে চালক।

আদনান নিজের পোশাকের দিকে তাকায়। যে পুলিশি ইউনিফর্মকে রক্ষাকবচ বানিয়ে ও পালিয়ে এসেছে মৃত্যুকূপ থেকে, সেই ইউনিফর্ম এখন ওর জন্য পরিণত হয়েছে গলার ফাঁসে। এই পোশাকের কারণে সরকারি বাহিনীর ওকে খুঁজে পেতে যেমন সহজ হবে, তেমনি এই পোশাকের কারণে যেকোনো মুহূর্তে ও পরিণত হবে বিদ্রোহীদের লক্ষ্যবস্তুতে। অটোচালকের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

সহযোগিতা ছাড়া ঘনীভূত এই দুধারী সংকট থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ আপাতত নেই, ভাবে আদনান। অটোচালককে নিজের পরিচয় দেবে নাকি ও! কতটা বিশ্বস্ত এই তরুণ! কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে সরকারি বাহিনীর ওপর সে মহাখ্যাপা। তাই যদি হয়, তবে নিশ্চিত করেই বলা যায়, পরিচয় পেলে আদনানকে সে বাঁচানোর চেষ্টাই করবে। সাতপাঁচ ভেবে আদনান নিজের পরিচয়টা দিয়েই বসে— হ্যাঁ, পোশাকে পুলিশ হলেও আদতে আমি এক জঙ্গি।

আচমকা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে চালক। পেছন ফিরে বড় বড় চোখ করে সে দেখতে থাকে পুলিশবেশী বিদ্রোহীকে।

আপনি জঙ্গি? পাহাড়ি নদীর স্রোতের মতো গলার স্বর কেঁপে কেঁপে যায় চালকের।

জঙ্গি না হলে পুলিশ থেকে পালাব কেন!

তাহলে এই ইউনিফর্ম?

নিরাপদ জায়গায় নিয়ে চলো, বলব সব।

এটুকুতেই আদনানের কথা বিশ্বাস করে ফেলে চালক। তার ছোটখাটো গোলগাল মুখে ফুটে ওঠে প্রসন্নতা। এতক্ষণ যে লোকটা কথায় কথায় ক্যাটক্যাট করছিল, এক্ষণে তার কণ্ঠ হয়ে ওঠে তুলোর মতো মোলায়েম। সে বিনয়ের সাথে বলে, আমি শুরু থেকেই সন্দেহ করছিলাম। কোনো পুলিশের আচরণ এমন অস্থির হয় না। ওরা কি আপনাকে খুঁজছে?

আহহা! কথা না বাড়িয়ে চলো তো সামনে। আমি বিপদে পড়লে তুমিও নিরাপদ থাকবে না।

অটো পুনরায় চলতে শুরু করে। আদনান পেছন ফিরে বারবার দেখতে থাকে পরিস্থিতি। জীবন বাজি রেখে ওকে পালাতে সাহায্য করেছে যে মানুষটা, তার কথা মনে পড়ে খুব। লোকটা কি এতক্ষণে লুকিয়ে পড়তে পেরেছে! যদি না পারে, তবে তার মৃত্যু নিশ্চিত। মনে পড়ে ইমতিয়াজসহ শাফিদের কথাও। মনে মনে দোয়া করে আদনান, ওর পলায়ন যেন এই সাহসী তরুণগুলোর ওপর শাস্তির নতুন অভিশাপ হয়ে আপতিত না হয়।

অটোচলা রাস্তাটি ক্রমেই সরু এবং জনমানবহীন হয়ে পড়ে। এদিকটাতে সরকারি বাহিনীর আনাগোনা নেই বললেই চলে। চালকের ওপর মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে আদনানের। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সঠিক পথেই ওকে নিয়ে এসেছে তরুণটি। এখন কোনো বিদ্রোহীর মুখোমুখি না হলেই হয়। একাকী এক পুলিশকে পেয়ে তার ওপর চড়াও হওয়ার লোভ কম গেরিলাই সামলাতে পারবে। এই জনপদের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে সরকারি বাহিনীর ওপর যে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ক্ষোভ ও ঘৃণা, তা যদি ঢেলে দেওয়া হয় ঝিলামের জলে, ঝিলামের জল নিশ্চিতভাবে তিতা হয়ে উঠবে। সেই ক্ষোভের মুখোমুখি যেকোনো মুহূর্তে হতে পারে লেবাসধারী আদনান।

তোমার নাম কী?

ফারুক।

আমি পাপা-২ নির্যাতনকেন্দ্রে বন্দী ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে ছদ্মবেশ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি।

দ্বিতীয়বারের মতো চমকায় অটোচালক ফারুক। সে পেছন ফিরে আদনানকে দেখে নিয়ে উচ্ছ্বসিত গলায় বলে, আপনি তো সাংঘাতিক যোদ্ধা! পাপা-২ থেকে পালিয়ে আসা যা-তা ব্যাপার নয়।

পালিয়ে আসার জন্যই এই পুলিশি ছদ্মবেশ। তুমি আমাকে সাহায্য করেছ, এ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

শুরুতে আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছি, এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। আসলে পুলিশ দেখলে ক্রোধ সংবরণ করতে পারি না।

আদনান হাসতে হাসতে বলে, তোমার ওই দুর্ব্যবহার আমার পরিচয় প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে।

রাস্তার দুধার এখন মনোরম এবং চোখজুড়ানো সজীবতায় মুখর। বাতাসে গমখেতের মাদকতাময় সৌরভ। মায়ের ওড়নার মতো ঢেউ খেলছে ধানখেতের চাদর। একটি টিলার ওপর ঘাস খাচ্ছে এক দল ভেড়া। টিলার বাঁ পাশে কাঠবাদামের নয়নাভিরাম উদ্যান। উদ্যানের পেছনে ছড়ানো-ছিটানো কাঠের বাড়ি।

এই গাঁয়ের নাম কী? চমৎকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে আদনান।

লারকিপুরা। এই গাঁয়ের পরের গাঁতে আমার বাড়ি। আমাদের গ্রামটাও ভারি সুন্দর!

তাই নাকি!

এখন আমরা আমাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছি। আমার জামা আপনার গায়ে হবে না? এই পোশাকে সবাই আপনাকে ভুল বুঝছে।

আগে হলে চিন্তার ব্যাপার ছিল। বন্দী হওয়ার পর আমার ওজন অর্ধেক কমে গেছে। এখন নিশ্চয়ই হবে।

একটি পাহাড়ের গা ঘেঁষে কৃষ্ণবর্ণের নদীর মতো বয়ে গেছে পিচঢালা রাস্তাটি। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনার পাশে পিতলের ঘড়া হাতে হট্টগোল করছে এক দঙ্গল কিশোরী। ছবির মতো এই দৃশ্যের ওপর চোখ আটকে যায় আদনানের। আপন কৈশোর কি উঁকি দেয় না ওর স্মৃতির

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

বারান্দায়! রংবেরঙের এমন কত সকাল-সাঁঝে ও আর মারিয়াম ঝরনার কাছে গেছে ঠিলাভরতি পানি আনতে! একটি মেয়ে কোমরে ঠিলা নিয়ে পায়ে চলা পথ ভাঙছে ঘরের দিকে। চুপচাপ। সঙ্গে কেউ নেই। পেছন থেকে মনে হয় অবিকল মারিয়াম। সেই ছন্দময় পদক্ষেপ, সেই ঢেউভাঙা কাঁধ ও হাতের মুদ্রার সঞ্চালন। স্পন্দিত হয় আদনান— এই, দাঁড়াও দাঁড়াও!

আবার কী হলো? ফারুক কড়া ব্রেক কষে।

অটো স্লো করতেই খোঁড়া পায়ে লাফিয়ে নামে আদনান। এর আগে ও অনেক মেয়েকে মারিয়াম ভেবে ভুল করেছে। আল্লাহ বোধ হয় আজ নিরাশ করবে না। খোঁড়া পায়ে দ্রুত এগোনো হয় না ওর, তার আগেই মেয়েটি একটি আপেলবাগানের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যায়। একজন পুলিশ এক তরুণীর পিছু নিয়েছে, ব্যাপারটি মোটেও স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত নয়। ঝরনার পাশে হট্টগোলরত মেয়েরা ভয়ে বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে। এ সময় আপেলবাগানের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে দুই অস্ত্রধারী। দীর্ঘ আলখাল্লা তাদের গায়ে। লম্বা গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা মুখ। সুঠাম দেহের চওড়া কাঁধওয়ালা দুই যুবক। তারা আদনানের দিকে মেশিনগান তাক করে চিৎকার ছুড়ে দেয়— হ্যান্ডস আপ।

এই আশঙ্কাই করছিল আদনান। অভিশপ্ত এ পোশাক খুলে ফেললে নতুন এই বিড়ম্বনা কিংবা বিপদে পড়তে হতো না ওকে। তবু ভালো যে ফারুককে ও আগেভাগেই পরিচয় দিয়েছে। বিপদ ঘনীভূত হলে ফারুক নিশ্চয়ই ওর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। মেশিনগানের ব্যারেলের মুখে আদনান হাত উঁচু করে দাঁড়ায়। হাত উঁচু করলেও তখনো ওর দৃষ্টি মেয়েটির প্রস্থানের দিকে। এতক্ষণে ও চোখে চোখেই রেখেছিল মেয়েটিকে। কিন্তু সামান্য সময়ের অমনোযোগের কারণে মেয়েটিকে ও হারিয়ে ফেলে। হঠাৎ প্রমাণসাইজের এক ঘুষি এসে পড়ে আদনানের চোয়ালে। শালা কুত্তার বাচ্চা, কত বড় সাহস, আমাদের বোনদের উত্ত্যক্ত করিস!

চক্কর খেয়ে পড়ে যায় আদনান। ঠোঁট ফেটে গলগলিয়ে বের হয় রক্ত। একবার বলতে যায় ও পুলিশ নয়; কিন্তু তার আগেই একটা লাথি পড়ে কোমরে। ব্যথায় কুঁকড়ে উঠে নিস্তেজ হয়ে পড়ে পাপা-২-ফেরত আদনান। এ সময় অটো ফেলে ছুটে আসে ফারুক। চিৎকার করে বলে, তিনি পুলিশ নন, তিনি এক ভাগ্যহত যুবক। আপনাদের মতো বিদ্রোহীদের একজন।

কী প্রমাণ আছে সে বিদ্রোহী? যুবকদ্বয় পাত্তা দেয় না ফারুকের কথা। তারা এখনো ফুঁসছে আদনানের ওপর।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ফারুক হড়বড় করে বলতে থাকে সেই সব কথা, আদনান যা ওকে অটোর মধ্যে বলেছিল। সাথে একটা বুদ্ধির কথাও বলে, পাপা-২ নির্যাতনকেন্দ্র থেকে শাস্তির অনেক চিহ্ন নিয়ে ফিরেছেন তিনি। একটু খুঁজলেই পেয়ে যাবেন তার শরীরে। এই চিহ্নগুলোই তার দেশদ্রোহের সাক্ষী।

এবার কৌতূহল ফুটে ওঠে দুই যুবকের চোখেমুখে। ফারুকের আত্মবিশ্বাস তাদের দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। ফারুকের কথামতো ইউনিফর্ম সরাতেই পাপা-২ থেকে নিয়ে আসা বীভৎস ক্ষতচিহ্নগুলো ফুটে ওঠে ওদের চোখের সামনে। যুবকদ্বয় স্তম্ভিত হয়ে যায় শাস্তির ভয়াবহতা দেখে। তবু তাদের ক্রোধ নির্মূল হয় না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রথম যুবক বলে, বিদ্রোহী হলেও সে চরিত্রহীন। আর আমাদের সংবিধানে চরিত্রহীনদের কোনো ক্ষমা নেই। আমরা হিজবুল মুজাহিদিনের সৈনিক।

হতে পারে মেয়েটি তার পরিচিত। আপনারা কিছু না শুনেই তো তাকে আহত করলেন।

এ যুবক মেয়েটির পরিচিত হতে পারে না। ওর ভাই আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। তাদের কোনো স্বজন যুদ্ধে গেছে বলে শুনিনি।

মাটিতে লুটায়িত আদনান সবই শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে এই বিতর্কে অংশ নেওয়ার মতো শারীরিক ও মানসিক জোর ওর নেই। শারীরিক জোর নেই আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে আর মানসিক জোর নেই মেয়েটির সুনিশ্চিত পরিচয় না জানার কারণে। নিজের ওপর বিরক্ত হয় আদনান। এত দিনেও আবেগের রাশ কেন টেনে ধরতে শিখল না ও!

ওকে ক্ষমা চাইতে হবে সেই মেয়েটির কাছে, যাকে সে উত্ত্যক্ত করেছিল। ধমকের সুরে বলে দ্বিতীয় যুবক।

হ্যাঁ, ক্ষমা চাইতে হবে।

আমি ক্ষমা চাইব। ইশারায় কথাটা বলার চেষ্টা করে আদনান। ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশে যদি ওকে হাজির করা হয় মেয়েটির সামনে, এই সুযোগে মেয়েটিকে ও চিনে নিতে পারবে।

আচমকা যোদ্ধা দুজন আদনানকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যেতে থাকে সেই পথে, যে পথের বাঁকে মেয়েটি নিরুদ্দেশ হয়েছে।

ফারুক বলে, আমার অটো আছে। সবাই মিলে অটো করে যাই। এভাবে গেলে সবরাই কষ্ট।

ফারুকের অটোয় ওঠে সবাই। আদনান ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। তবু ও সংজ্ঞাহীনের মতো চোখ বুজে গা এলিয়ে পড়ে থাকে চুপচাপ। কঠিন এক পরীক্ষার মুখোমুখি ও। মেয়েটি যদি সত্যি সত্যি

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

মারিয়াম হয়, তবে একবাক্যে পরীক্ষায় পাস করে যাবে ও। আর যদি হয় অন্য কোনো মেয়ে, তবে বিপদ আরো ঘনীভূত হবে নিশ্চিত। যে বেয়াড়া এই যুবক দুটো, ওরা আদনানের কোনো ব্যাখ্যা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না।

পাহাড়ি রাস্তার কয়েকটি বাঁক ঘুরে একটি দোতলা অভিজাত বাড়ির সামনে এসে থামে অটো। আশপাশে আরো কয়েকটি বাড়ি আছে। তবে এই বাড়ির পটভূমিকায় সেগুলো বড্ড নিষ্প্রভ। একনজর অভিজাত বাড়িটির দিকে তাকিয়ে আদনানের বুক ঢিপঢিপ করে। ওর মনে হয়, ও এক রাজবন্দী। অন্ধকারে ওর সামনে রাখা হয়েছে পরীক্ষার দুটো পেয়ালা। এক পেয়ালায় দুধ আর অপর পেয়ালায় বিষ। যে পেয়ালা ওর হাতে উঠবে, সেটাই পান করতে হবে। আজ কি ওর হাতে দুধের পেয়ালা উঠবে!

জাভেদ ভাইয়াজি! ফটকের দিকে মুখ করে চিৎকার করে ওঠে প্রথম যুবক। তার কণ্ঠস্বর বাতাসে পুরোপুরি নিঃশেষিত হলে দ্বিতীয় যুবকও একই ভঙ্গিমায় ডাকে— জাভেদ ভাইয়াজি!

একটু পর খুলে যায় লোহার গেট। উন্মুক্ত গেটের ক্যানভাসে কাঁচা-পাকা চুল-দাড়ির মধ্যবয়সী এক সুদর্শন যুবকের অবয়ব অস্তিত্ব লাভ করে। পরিচিত দুই বিদ্রোহীর সঙ্গে রক্তাক্ত এক পুলিশ সদস্যকে দেখে অবাক হয়ে যান তিনি। সহসা তার মুখে কোনো কথা ফোটে না। গৃহকর্তার বিস্মিত অভিব্যক্তির মুখে চুপ থাকে আদনানকে ধরে আনা যুবকদ্বয়ও। কতক্ষণ বাড়ির সামনের নির্বাক দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দী ছবির মতো স্থির হয়ে থাকে। ওদিকে প্রকৃতি তার অমোঘ নিয়তির মাঝে মঞ্চস্থ করে ভিন্ন ঘটনা। গৃহকর্তা যখন গেট খুলে দাঁড়িয়েছেন, তখন একই সমান্তরালে সরে গেছে দোতলার জানালার কপাট। আর অমনি দোতলার জানালার ফ্রেমে ভেসে ওঠে এক বিষণ্ন তরুণীর মুখ। তরুণীর কোলে দুধের শিশু। জানালায় চোখ পড়তেই বিবশ হয়ে যায় আদনান। ওর স্পন্দিত ফুসফুস শ্বাসতন্ত্রের অনিবার্য দায়িত্বের কথা কতক্ষণের জন্য বিস্মৃত হয়। সাত সমুদ্রের বিস্ময় নিয়ে ও জানালার ফ্রেমে আবিষ্কার করে মারিয়ামের ছবি।

মারিয়াম মারিয়াম— চিৎকার করে অটো থেকে লাফিয়ে নামতে যায় ও; কিন্তু পায়ের সাথে পা পেঁচিয়ে ও হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। আদনানের দৃষ্টি অনুসরণ করে সবাই ঝটিকা দৃষ্টি হানে দোতলার জানালায়। ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে উন্মুক্ত কপাটটি।

গৃহকর্তা যুবক, বিদ্রোহীদ্বয় যাকে জাভেদ ভাইয়াজি সম্বোধনে ডেকেছে, একজন পুলিশের মুখে মারিয়াম ডাক শুনে তিনি অবাক হয়ে যান। ছোট ছোট

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পা ফেলে তিনি এগিয়ে আসেন গেটের ক্যানভাস ছেড়ে। তার কপালের ভাঁজে লেগে থাকে সীমাহীন কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা।

প্রথম যুবক খুলে বলে সবকিছু, যা ঘটেছিল ঝরনার পাশে। বেশে পুলিশ হলেও আদতে সে এক যোদ্ধা, আজাদির সৈনিক— সাথে যোগ করে দ্বিতীয় যুবক।

কিন্তু আমার অনুজার নাম তো সত্যিই মারিয়াম।

তাই নাকি! তাহলে তো এর কোনো দোষ নেই। বিব্রত কণ্ঠে বলে প্রথম যুবক।

এ সময় পূর্বের সেই চঞ্চলতা ফিরে আসে ফারুকের মাঝে। সে উষ্মার সাথে বলে, আমি আগেই বলেছিলাম, তিনি নির্দোষ। পাপা-২ নির্যাতনকেন্দ্রের সামনে থেকে যাকে উদ্ধার করে আনলাম, আমি জানব না তিনি কেমন! অযথা তার আহত শরীরখানাকে আবার রক্তাক্ত করা হলো। ফারুক বড় মমতা নিয়ে আদনানকে হাত ধরে ওঠায়। আদনানের ব্যাকুল চোখ তখনো লেপ্টে আছে দোতলার বন্ধ কপাটে। গৃহকর্তার বিস্ময় তখনো দূর হয়নি। তবে এটুকু তিনি বুঝে গেছেন, মারিয়ামকে চেনে মানে সে মারিয়ামের পরিচিত। আর যে মারিয়ামের পরিচিত, সে এ বাড়ির আত্মীয়। এখানে বাক্যব্যয় করা সময়ের অপচয় মনে হয় গৃহকর্তা জাভেদের কাছে। আদনানকে তিনি ভেতরবাড়িতে আহ্বান করেন। দুই যুবক কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে আর আদনান ফারুকের কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটে চলে এক মহাবিস্ময়ের দিকে।

মেহমানখানার কোমল গালিচায় বসে বাইরে শান্ত নদী আর ভেতরে উথালপাতাল ঝড় নিয়ে আধা ঘণ্টা অপেক্ষায় থাকে আদনান। দোতলার জানালায় যে মুখ সে দেখেছিল, সেই মুখটি বারবার স্মরণে আনার চেষ্টা করে, কিন্তু সময় যত গড়ায়, কাঙ্ক্ষিত মুখটা ততই ঝাপসা হতে থাকে। আদৌ কি সে মারিয়াম! নাকি মারিয়ামের মতো দেখতে অন্য কেউ! মারিয়ামই যদি হবে, তবে এখানে কেন থাকবে সে! শ্রীনগরের নিকটতম দূরত্বে অবস্থিত এই গ্রাম আর গুরিহাকার মাঝে তো নেই কোনো আসমুদ্রহিমাচলের বাধা। তবে মারিয়াম কেন ঘরে ফেরেনি!

আদনানের অস্থির মস্তিষ্কে যখন এই সব নানামুখী চিন্তার ঝড় বয়, ফারুক তখন অধৈর্যের মতো কেবলই পায়চারি করতে থাকে। মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হয় গৃহকর্তার ওপর— মেহমানকে বসিয়ে রেখে এভাবে কেউ লাপাত্তা হতে পারে! আচ্ছা, মারিয়াম কে? একপর্যায়ে আদনানের মুখের সামনে মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করে পায়চারিরত ফারুক।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আদনান কিছু বলতে যায় কি যায় না, তার আগেই একটি সুসজ্জিত শিকারার ডাললেকের তট স্পর্শের মতো দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় মারিয়াম। নিঃশব্দে। ঢিলেঢালা গোলাপি কামিজে ঢাকা তার ঈষৎ মুটিয়ে যাওয়া শরীর। পাইনপাতা রঙের ওড়নায় ঢাকা নিভাঁজ মুখ। হাতে নাশতার ট্রে। ক্ষণকালের জন্য স্থানকালপাত্রের সকল বোধবুদ্ধি লোপ পায় আদনানের। যাকে খুঁজে পেতে ও জীবন নিয়েছিল হাতের মুঠোয়, মুক্তো খোঁজার মতো চিরে দেখেছিল প্রতিটি ঝিনুকের পেট, ছুটে বেড়িয়েছিল বনবাদাড় আর চেনা-অচেনা দুর্গম পাহাড়-পর্বত, সেই মানুষটি যখন দৃষ্টির দূরত্বে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন চলনশক্তিরহিত একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয় আদনান। নাশতার ট্রে সামনে পরিবেশিত হওয়ার পরই কেবল ঘোর ভাঙে ওর।

মারিয়াম! তুমি এখানে! কত খুঁজেছি তোমায়! আদনানের হৃদয়ের গহিন গোপন কুটির থেকে উৎসারিত হয় বাক্যযুগল।

নাশতাটা খেয়ে নিন। আপনাকে অনেক ক্লান্ত লাগছে। এমন নিস্পৃহ ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে মারিয়াম, আদনানের বুক ভেঙে খানখান হয়ে যায়। আদনান যেন দূরতম এক আত্মীয়, অনাহূতের মতো হঠাৎ বাড়িতে এসে জুটেছে বলে তাকে সাদরে বরণ করা যাচ্ছে না আবার আহত বলে না খাইয়ে খোদা হাফেজও বলা যাচ্ছে না। আদনান যেন এক বুভুক্ষু গরিব স্বজন, রসনাবিলাসী খাবারের জন্যই যার এ বাড়িতে আগমন। নয়তো মারিয়াম কেন সবার আগে খাওয়ার প্রসঙ্গ তুলবে! পাপা-২ নির্যাতনকেন্দ্র থেকে আর কতটুকুই-বা পীড়িত হয়েছিল আদনান, তার থেকে অনেক বেশি রক্তাক্ত হয় মারিয়ামের এই নির্লিপ্ত আচরণে। মারিয়ামকে একদিন খুঁজে পাবে, বিশ্বাসের এই দৃঢ়তা সব সময়ই ছিল আদনানের। কিন্তু সেই মারিয়াম যে এভাবে বদলে যাবে, আদনানকে ফিরে পাওয়ার পরও যে থাকবে নিষ্ক্রিয় এবং নির্বিকার, স্বপ্নেও ভাবেনি ও। মারিয়াম কেন এমন বদলে গেল! ওর এই বদলে যাওয়ার পেছনে কি গভীর কোনো বিষাদ আছে!

খেয়ে নিন, আমার একটু তাড়া আছে।

তাড়া আছে! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় আদনান। এ কি সেই মারিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর চিঠি পাঠাবার সামান্য বিলম্বে যে গাল ফুলিয়ে থাকত! ক্যাম্পাস ছুটির খবরে যার পিঠে গজাত প্রজাপতির ডানা! ফুর্তিতে পলকা হাওয়ার মতো উড়ে বেড়াত এঘর-ওঘর! আদনানের এমন অভিমান হয়, ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকের মতো একমুহূর্তে সাবাড় করে ফেলে সবটুকু খাবার। ওর গালে-নাকে লেগে থাকে ভেড়ার মাংসে তৈরি হরিষা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ফারুক হতভম্ব চোখে দেখতে থাকে আদনানের অস্বাভাবিক আচরণ। খাওয়া

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

শেষে আস্তিনে হাত মুছে উঠে পড়ে আদনান আর ফারুককে নির্দেশ করে যাত্রা করার। যখন ওর পা মেহমানখানার চৌকাঠ অতিক্রম করে, তখন পেছন থেকে ভেসে আসে মারিয়ামের আর্দ্র কণ্ঠস্বর, খালা-খালু কেমন আছেন?

তারা ভালো আছেন। যন্ত্রের মতো উত্তর দিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে অভিমানী আদনান।

শুনুন। মারিয়ামের কণ্ঠে এবার এমন মায়াবী অনুরোধ ঝরে পড়ে, আদনানের পা থমকে দাঁড়ায়।

একটু বসে যান। আপনি পরিশ্রান্ত। আপনার পোশাকটাও ঝুঁকিপূর্ণ।

এই হার্দিক আহ্বান আর উপেক্ষা করতে পারে না আদনান। করা যায়ও না। ও বুঝতে পারে, মারিয়ামের ভেতরটা আগের মতোই আছে। আদনানের কল্যাণচিন্তায় ব্যগ্র সেই উৎকণ্ঠিত হৃদয় এখনো বহন করে চলেছে সে। বাইরের নির্লিপ্তির পেছনে আছে নিশ্চয় সময়ের নিষ্ঠুর কোনো আঁচড়। ফিরে আসে আদনান। একটু পর মেহমানখানায় মারিয়ামের মুখোমুখি হয় ও ফারুক রয়ে যায় বাইরে। এত প্রশ্ন, এত জিজ্ঞাসা, কৌতূহলের এত সপাং সপাং চাবুক, কোনটা রেখে কোনটা জিজ্ঞেস করবে, বুঝে উঠতে পারে না আদনান। কিন্তু ধাতস্থ হয়ে ও যখন প্রশ্নের বাঁধন আলগা করে, মারিয়াম তখন বোবা। তার মুখ থেকে একটি বাক্যও নির্গত হয় না। এ সময় মেহমানখানায় উপস্থিত হন জাভেদ, এ বাড়ির গৃহকর্তা। স্মিত হাসি দিয়ে তিনি বলেন, আপনি মারিয়ামের খালাতো ভাই, মারিয়াম আমাদের জানিয়েছে। আপনি হয়তো ওর ব্যাপারে জানতে চাচ্ছেন, আসলে নিয়তির এমন এক জগদ্দল পাথর ওকে পিষ্ট করে গেছে, যার বিবরণ দেওয়া ওর পক্ষে কঠিন। আপনি এসেছেন, থাকুন, আস্তে আস্তে সব জানতে পারবেন। তার আগে আপনার এই পোশাক পরিবর্তন করা জরুরি। তা ছাড়া আপনার চিকিৎসাও দরকার। আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি। শীঘ্রই তিনি এসে যাবেন।

ফারুককে বিদায় জানিয়ে সেই দিনটা জাভেদদের বাড়িতে থেকে যায় আদনান। জাভেদের দেওয়া পোশাক আর জাভেদের ডাকা ডাক্তারের চিকিৎসায় অনেকটাই সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠে ও। কিন্তু যতবার মারিয়াম ওর সামনে আসে, ওর নির্জীব পুরুষাঙ্গ, যা এক নিরীহ মাংসপিণ্ড বৈ কিছু নয়, বিষধর সাপ হয়ে ওর হৃদয়ে ছোবল বসাতে থাকে। ওর হৃদয় থেকে কেবলই উৎসারিত হয় এক মর্মভেদী আকুতি— মারিয়াম, কিসমতের এমন এক ঘূর্ণাবর্তে দেখা হলো আমাদের, যখন আমার শরীরে অমোচনীয় কলঙ্কের ছাপ পড়ে গেছে। কলঙ্কের এই দাগ নিয়ে আমি কীভাবে তোমার পাশে দাঁড়াব! কীভাবে ধরব তোমার কমনীয় হাত! অপৌরুষত্বের যাতনায় যখন ভেতরে-

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ভেতরে নিষ্পেষিত হয় আদনান, সেই একই রকম যাতনায় কুঁকড়ে যেতে থাকে মারিয়ামও। প্রতিদিন কতবার ও দোয়া করেছে আদনানকে ফিরে পাওয়ার, কতবার ও লালায়িত হয়েছে আদনানকে চোখ ভরে দেখবার; অথচ সেই আদনান যখন এল, নিয়তির নিষ্ঠুর খেলায় মারিয়াম তখন নির্লিপ্ত। মারিয়ামের এই নির্লিপ্তির নেপথ্যের কারণ জানা যায় সেদিন সন্ধ্যায়। গৃহকর্তা জাভেদের মুখ থেকে ধীরে ধীরে সব উন্মোচিত হয়, মারিয়ামের ঘটনাবহুল জীবনের বেদনাবিধুর অধ্যায়। সেই কালরাতে প্যারামিলিটারির আকস্মিক অ্যাটাকে যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল জনতার মিছিল, পেশাগত কারণে, সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশে জাভেদ মির তখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছিলেন লালচকের অলিগলি। যখন গুলি চলছিল গাউকাদাল সেতুর মুখে, নিরাপত্তার খাতিরে তিনি ঘটনাস্থলে যেতে পারেননি বটে; তবে সবকিছু ঠান্ডা হয়ে গেলে তিনি ছুটে যান সেখানে এবং অসংখ্য রক্তাক্ত লাশ দেখে শিউরে ওঠেন। তিনি গিয়েছিলেন সংবাদ সংগ্রহের কাজে, কিন্তু সংবাদের চেয়েও গুরুতর এক দায়িত্ব আপনা-আপনি তার কাঁধে এসে পড়ে। নোটবুক-কলম পকেটে গুঁজে তিনি আপাদমস্তক লাশকাটা ঘরের লাশবাহক হয়ে ওঠেন যেন। রক্ত দেখলেই যে মানুষটার গা গুলিয়ে ওঠে, সেই তিনি একে একে তেরোটি লাশ কাঁধে করে মসজিদে নিয়ে যান। মুসল্লিরা দিনে পাঁচবার যে কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে, নিষ্প্রাণ দেহগুলোকে সেই কাতারে শুইয়ে দিয়ে তিনি নোট নিতে বসেন। তখন খেয়াল হয়, শহীদের রক্তে ভিজে গেছে তার নোটবুক। রক্তের আখরে নোটবুকে ১৩ সংখ্যাটি লিখে নতুন লাশের সন্ধানে বের হতে গিয়ে তিনি শিউরে ওঠেন। খেয়াল করেন, সবগুলো লাশের চোখ উন্মীলিত, ঠোঁটে স্মিত হাসি। যেন তারা বেঁচে আছে এবং জাভেদের সকল কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছে। জাভেদ দ্রুত হাতে তেরো জোড়া চোখ বন্ধ করে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন। লাশ উদ্ধারের উদ্দেশে পুনরায় গাউকাদাল সেতুর মুখে এসে তিনি দেখতে পান, তার মতো আরো অনেকেই লাশ উদ্ধারে ব্যস্ত। এ সময় একটি ফারগাছের নিচে তিনি আবিষ্কার করেন অচেতন এক তরুণীকে, যার সারা গায়ে নিপীড়নের চিহ্ন। জাভেদ মির একলা এক মানুষ। বাবা-মা আগেই গত হয়েছেন। শ্রীনগরের নিকটবর্তী এক গ্রামে সস্ত্রীক বসবাস করেন। নিঃসন্তান। ছোট একটা বোন ছিল। বহু বছর আগে নিউমোনিয়ায় মারা গেছে। এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়েও নিপীড়িত, অজ্ঞাত মেয়েটির ওপর বড় মমতা হয় জাভেদ মিরের। নিউমোনিয়ায় গত হওয়া ছোট বোনটির কথা মনে পড়ে তার। বেঁচে থাকলে রুকাইয়াও নিশ্চয়ই আজ এমন বড় হতো। তিনি আর দ্বিধা করেন না। সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে,

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

একটু আগে যে কাঁধে তিনি লাশ বহন করেছেন, সেই কাঁধে মেয়েটির অচেতন দেহটা তুলে নিয়ে ছুটতে থাকেন শেরে কাশ্মীর হাসপাতালের দিকে। সাত দিনের মাথায় শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে মেয়েটি। কিন্তু মনের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তুফানের রেশ কাটে না সহজে। পাথরের মূর্তির মতো সে চুপচাপ বসে থাকে হাসপাতালের বেডে, বিড়বিড় করে কী যেন আওড়ায়, কিন্তু কারো সাথে কোনো কথা বলে না। ডাক্তারের পরামর্শে মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে আসেন জাভেদ মির। ভেবেছিলেন, স্ত্রীর সান্নিধ্যে এসে মেয়েটি স্বাভাবিক হবে, কথা বলবে, বাড়ির ঠিকানা দেবে; কিন্তু ঘরোয়া পরিবেশেও মেয়েটির মেঘগম্ভীর মুখে চাঞ্চল্য আসে না। বারো দিনের মাথায় মেয়েটির কণ্ঠস্বর প্রথমবারের মতো শুনতে পান জাভেদ মির ও তার স্ত্রী : 'আমি মরতে চাই।' কথাটি শোনার পর জাভেদ মির স্তব্ধ হয়ে যান। তার মনে হয়, এর চেয়ে বরং নির্বাক থাকাই ভালো ছিল। কারণ, তিনি ভালো করেই জানেন, শারীরিকভাবে নিগৃহীত মেয়েরা মুখে যা বলে, বাস্তবে তা-ই করে। ফলে মেয়েটির আত্মহনন ঠেকাতে জাভেদ মিরের স্ত্রী লুতফার দায়িত্ব বেড়ে যায়। জাভেদ মির অফিসে যান, বাজার করেন আর লুতফা মেয়েটিকে চোখে চোখে রাখেন। মমতার এমন এক ক্ষমতা, যার স্পর্শে পাথরও গলে জল হতে বাধ্য। মেয়েটির বেলায়ও তা-ই ঘটে। লুতফার মমতাপূর্ণ ব্যবহার মেয়েটির জমানো ক্রোধ, জেদ ও বেদনার রশি ঢিলা করে দেয় আস্তে আস্তে। স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে মেয়েটির এমন যত্ন নেন, দিনে দিনে সে এ বাড়িরই এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ভাবতে শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যে মেয়েটি তার নাম জানায় মারিয়াম এবং বর্ণনা করে ফেলে আসা জীবনের বেদনাবিধুর উপাখ্যান। কিন্তু সেই জীবনে যে আদনান নামে কারো উপস্থিতি ছিল, ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেনি সে।

স্তব্ধ হয়ে শুনছিল আদনান। মাঝে একবার জাভেদ মিরের স্ত্রী গোলাপি রঙের লবণ-চা রেখে গেছেন। কিন্তু মারিয়ামের উপাখ্যানে এমনভাবে তন্ময় হয়ে ছিল ও, চায়ের কাপে হাত দেওয়ার ফুরসত হয়নি। হঠাৎ এক শিশুর তীব্র কান্নাধ্বনিতে চমকে ওঠে আদনান। কপালে ভাঁজ ফেলে ও ছুড়ে দেয় জিজ্ঞাসা— জাভেদ ভাই, আপনি নিঃসন্তান। শিশুটি তবে কে?

ও মারিয়ামের ছেলে। মারিয়ামের ওপর যে কেয়ামত নেমেছিল, শিশুটি তারই চিহ্ন।

ওহ্! আর্তনাদ করে ওঠে আদনান। ওর শরীরের প্রতিটি শিরায় ছড়িয়ে যায় বেদনার বিদ্যুৎপ্রবাহ। এ কারণেই বুঝি মারিয়াম অমন নিস্পৃহ! অথচ আদনান কী ভুলটাই না বুঝেছে ওকে! আদনানের চোখ সজল হয়ে ওঠে— খোদা, আজাদির দীপ জ্বালাবার জন্য আর কত কোরবানি চাই তোমার!

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

মারিয়ামকে অনেকবার বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলেছি। কিন্তু সে কখনোই রাজি হয়নি। জোর করলে বলেছে, আপনাদের অসুবিধা হলে আমি চলে যাব, কিন্তু সেই যাওয়ার গন্তব্য হবে গোরস্তান। এরপর আর কীভাবে জোর করি, বলুন! নিস্তেজ গলায় জাভেদ ওজর পেশ করেন।

জোর না করেই ভালো করেছেন। ও খুব জেদি মেয়ে।

এত দিন মেয়েটা আমার বাড়িতে আছে, কোনো দিন ওর মধ্যে কোনো উচ্ছ্বাস দেখিনি। যেদিন ও ছেলেটার নাম রাখল, সেদিন প্রথম ওর মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখলাম। আপনার সাথে পরিচয় না হলে ওর এই উচ্ছ্বাসের কারণ জানা হতো না কখনো। ও ছেলের নাম রেখেছে আদনান।

আনন্দ-বেদনার যুগপৎ মিশ্রণে আদনানের বুকের ভেতরটা হঠাৎ হু হু করে ওঠে। মারিয়াম ওকে এত ভালোবাসে! কতটা ভালোবাসলে কেউ সন্তানের ভেতর প্রিয়জনের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার নিরীক্ষা করতে পারে! আদনান কতক্ষণ নত মাথায় স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। ওর এই বেচাইন অবস্থা খেয়াল করেন জাভেদ মির। বুঝতে পারেন, এই মুহূর্তে খানিকটা সময় একা থাকা দরকার আদনানের। তিনি আদনানের কাঁধে হাতের স্পর্শ রেখে বিদায় নেন আপাতত। জাভেদ মির বেরিয়ে যেতেই চোখে জল আসে আদনানের। বাজারে বাবা হারিয়ে ফেলা কিশোরের মতো সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ধীরে ধীরে ঘন হয় রাত্রি। মারিয়ামের জীবনের মতো নিবিড় অমানিশায় ছেয়ে যায় জানালার ওপাশ। মারিয়ামকে দেখার জন্য, দুটো বাক্যবিনিময়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে আদনান। ভাবে, ঘুমানোর আগে মারিয়াম নিশ্চয়ই দেখা করতে আসবে। জুলুমের পর্দা গুটিয়ে গুরিহাকার সেই লাবণ্যময়ী কিশোরী হয়ে সে ধরা দেবে আদনানের কাছে। আদনানকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদবার জন্য হলেও সে আসবে। ব্যথা জমে জমে বুকের ভেতর ব্যথার পাহাড় রচিত হয়েছে। ব্যথার সে পাহাড়ের ভার কমানোর জন্য হলেও তো মারিয়ামের কাঁদা দরকার। কিন্তু মারিয়াম আসে না। মারিয়াম কাঁদেও না। আসেন জাভেদ মির, মারিয়ামের বর্তমান অভিভাবক, একটি নোটবুক হাতে। এতক্ষণে নতুন এই বাড়িতে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে আদনান। জাভেদকে দেখে ও স্মিত হাসে— ঘুমাননি?

এই তো ঘুমাব। জাভেদ নোটবুকটি বাড়িয়ে দেন আদনানের দিকে। বলেন, আপনি সশস্ত্র যোদ্ধা। আজাদির মহান সৈনিক। আল্লাহ আমাকে সেই সৌভাগ্য দেননি। তবে অস্ত্রের পরিবর্তে আমি কলম হাতে তুলে নিয়েছি। এই নোটবুকে আমার দেখা কাশ্মীরের গণহত্যার টুকরো টুকরো ইতিহাস লিপিবদ্ধ

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

করার চেষ্টা করছি। রচনা শেষ হলে পরবর্তী সময়ে বই করার ইচ্ছা। পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কাম্য।

নোটবুকটির দিকে কম্পিত হাত বাড়িয়ে দেয় আদনান। জাভেদ মির রচিত পাণ্ডুলিপিটি টেনে নেয় নিজের দিকে। পৃষ্ঠা ওলটাতেই ও যেন নিপীড়িত কাশ্মীরিদের বুকফাটা আর্তনাদ শুনতে পায় প্রতিটি অক্ষর থেকে। দাদাজি বলতেন, কখনো কখনো অসির চেয়ে মসি ধারালো হয়ে থাকে। অসি দিয়ে শত্রু বধ করা যায় কিন্তু মানুষের হৃদয় বধ করতে হয় মসি দিয়ে। জাভেদ মির সেই কাজের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন বলে মনে হয়। কাশ্মীর আজাদ হবে কি হবে না, জানে না আদনান। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই বই নিশ্চয়ই অমূল্য আকরগ্রন্থ হয়ে রয়ে যাবে। যারা সশস্ত্র বিপ্লব দেখেনি অথবা দূর থেকে দেখেছে, তারা এই বইয়ের প্রতিটি আখর থেকে জানতে পারবে, একদা এই ভূস্বর্গে মানবরূপী দানবের হাত ধরে কেয়ামত নেমেছিল। জাভেদ মির বিদায় নিতেই আদনান নোটবুকের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে। সেই রাতটা ওর কেটে যায় নির্ঘুম, এখনো সমাপ্ত না হওয়া পাণ্ডুলিপিটির সাথে।

মারিয়াম হারিয়ে যাওয়া যে মিছিলের রাতে গুলি খেয়ে আদনান অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল সেতুর নিচে, জাভেদ মির সেই রাতের একটি বিবরণ দিয়েছেন। আদনান পড়তে থাকে : পরদিন ওই ঘটনার প্রতিবাদে উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলের বিক্ষুব্ধ মানুষেরা শ্রীনগর এসে জড়ো হন এবং মিছিল বের করেন। জনতার মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে যখন হাওয়াল অঞ্চলের আলমগরি বাজারে পৌছায়, তখন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স মিছিলটিকে ঘিরে ফেলে এবং নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। আগের রাতের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে এসে শতাধিক প্রতিবাদকারী নতুন করে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়।

১৯৯০ সালের ১ মার্চ গণভোটের দাবিতে একটি বিশাল মিছিল শ্রীনগর শহর পরিভ্রমণ করে। শহরের জাকুরা, তেঙ্গপুরা ও বেমিনা ঘুরে শালিমারে পৌছালে প্যারামিলিটারি সদস্যরা বিনা উসকানিতে মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করে বহু মানুষকে হতাহত করে। যারা তখনো নিরাপদ ছিল, তারা একটি বাসে উঠে দ্রুত ঘরে ফিরতে থাকে। কিন্তু নিষ্ঠুর প্যারামিলিটারি সদস্যরা তাদের বাস থেকে নামিয়ে গুলিবর্ষণ করে। সেদিন সামরিক-আধা সামরিক বাহিনী শুধু কাশ্মীরি জনতার ওপরই চড়াও হয়নি, স্থানীয় কাশ্মীরি পুলিশের ওপরও তারা চরম অত্যাচার চালায়। শ্রীনগর পুলিশ সুপার এস এ চৌধুরী সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জাকুরা থানায় একটি

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

এফআইআর করেন। এফআইআরে বলা হয়, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর সামরিক বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালিয়ে বহু মানুষকে হত্যা করেছে। এফআইআর করার সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রীনগরের ডেপুটি কমিশনার এস এ আব্বাস।

১৯৯০ সালের ৭ মার্চ কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স ছানপুরা এলাকার প্রতিটি বাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং তল্লাশির নামে গৃহবাসীদের লাঞ্ছিত করে। বাড়ি বাড়ি ঢুকে তারা পুরুষদের মারধর করে আর পুরুষদের চোখের সামনে নারীদের করে ধর্ষণ। পরদিন ছানপুরা গ্রামের অন্তত পনেরোটি পরিবার ভয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়। নারীদের ধর্ষণের প্রতিবাদে ১৪ মার্চ দুখতারানে মিল্লাত নামে একটি নারী সংগঠন শ্রীনগরে মিছিল বের করে। এই প্রতিবাদী নারীদের দাবি ছিল দুটি— কাশ্মীরের আজাদি এবং কাশ্মীর থেকে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রত্যাহার। তাদের দাবি তো কানে তোলা হয়ই না, বরং মিছিলটি রাষ্ট্রসংঘের সামরিক পর্যবেক্ষক দলের কার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হলে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স তাদের ওপর লাঠিচার্জ ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। আক্রমণের মুখে আজাদির জন্য আত্মদানকারী নারীরা হকচকিয়ে যায় এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পার্শ্ববর্তী এক মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের জিঘাংসা তখনো দূর হয়নি। এরপর তারা যা করে, তার সামনে হার মেনে যায় অমানবিকতার সকল ইতিহাস। তারা মসজিদ ভাঙচুর করে ভেতরে প্রবেশ করে এবং মুসলমানদের ইবাদতখানার মধ্যে মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করে। ধর্ষণের প্রতিবাদে যে নারীরা পথে নেমেছিল, সেই তাদেরই ধর্ষণের কলঙ্ক গায়ে মেখে ঘরে ফিরতে হয়।

৩১ মার্চ আরো একটি অমানবিক ঘটনার মুখোমুখি হয় শ্রীনগরবাসী। শ্রীনগরের বিচারনাগ এলাকার এক শিক্ষক নিজ গৃহে কয়েকজন ছাত্র পড়াচ্ছিলেন। ছাত্রদের সকলেই কিশোর। সবার বয়স বারোর মধ্যে। একজন ছাত্র ব্যতীত শিক্ষকসহ বাকি সবাই ধর্মে হিন্দু। শিক্ষক মশাই যখন শিষ্যদের পাঠদানে ব্যস্ত, তখন তল্লাশির নামে সেই গৃহে প্রবেশ করে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের কতিপয় সদস্য। তারা গুরু-শিষ্য সকলের নাম জিজ্ঞেস করে। অনেকগুলো হিন্দু নামের ভিড়ে তারা একটি বালকের নাম জানতে পারে নাজির সফি, তখন তারা সেই ব্যতিক্রমী নামের বালকের বুক বরাবর সোজা গুলিয়ে চালিয়ে দেয়। তার অপরাধ, সে মুসলমান। তার অপরাধ, তার নামটা মুসলিম ঐতিহ্য ধারণকারী। প্রায়শ্চিত্তহীন এই পাপের কারণে মরে যেতে হয় বারো বছরের নওল কিশোরকে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম— কখন যে রাত ফুরিয়ে ফজরের ওয়াক্ত ঘনিয়ে এসেছে, টের পায়নি আদনান। জাভেদ মিরের নোটবুক ওর চোখ থেকে ঘুম উধাও করে দিয়েছে। অসম্পূর্ণ এই পাণ্ডুলিপিতে ইতিহাসের এমন সব বীভৎস অধ্যায় বিধৃত হয়েছে, যে বীভৎসতার মাত্রা খোদ রণাঙ্গনে থেকেও উপলব্ধি করতে পারেনি আদনান। ওর মনে হয়, এই বই কালিতে নয়, বরং রক্তের হরফে লিখিত হয়েছে। আচানক ওর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কাগজের বুকে জলপতনের টুপ শব্দে নিশুতি রাতের মগ্নতা ক্ষণিকের জন্য ভঙ্গ হয়; কিন্তু মগ্নতা ভাঙে না আদনানের। চোখের জলের বিস্তারে পাণ্ডুলিপির কয়েকটি অক্ষর ধ্যাবড়ে যায় কিন্তু অশ্রুটুকু মুছতে ইচ্ছা করে না ওর। এক হতভাগা যোদ্ধার তপ্ত অশ্রু লেগে থাকুক না এই হীরকতুল্য দলিলের গায়ে!

জানালার ওপাশের পৃথিবী ফরসা হয়ে উঠলে অজু করে নামাজে দাঁড়ায় আদনান। সুরা পড়তে গিয়ে বুকের ভেতর বলক ওঠা ভাতের হাঁড়ির গড়গড় শব্দ হয়। সালাম ফিরিয়ে ও দরজার মুখে যাকে আবিষ্কার করে, তাতে বিবশ হয়ে যায় ও। মারিয়াম কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে! বাসি ফুলের মতো বিমর্ষ মুখ মেয়েটির, বেদনার প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। জায়নামাজ গুটিয়ে আদনান ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। বড় মমতা নিয়ে ও অভাগী মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, যে মুখে অনন্তকালের বিষণ্নতা লেপিত হয়ে গেছে।

তোমার ঘরে সারা রাত আলো জ্বলছিল। ঘুমাওনি? নিষ্প্রভ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে মারিয়াম।

আদনান ইশারায় পাণ্ডুলিপিটি দেখায়— এটা আমাকে ঘুমাতে দেয়নি।

জাভেদ ভাইয়াজির কাছ থেকে সবকিছু শুনেছ নিশ্চয়। কেন বাড়ি ফিরে যাইনি— এরপরও এই প্রশ্ন তুলে আমাকে বিব্রত করবে না আশা করি।

আদনানের একবার মনে হয়, ও বলে, সময়ের নিষ্ঠুর জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে আমাদের উভয়েরই জীবন। এসো, আমরা দুই ভাঙা জীবন এক করে একটি আস্ত জীবন সাজাই। কিন্তু মারিয়ামের নিস্পৃহ মুখের দিকে চেয়ে ওর সকল আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে যায়। ও বরং ভিন্ন কথা বলে, আমাকে একটা চিঠি লিখতে পারতে। কত খুঁজেছি তোমাকে!

আজাদ কাশ্মীরের রেডিওতে একবার তোমার নাম শুনেছিলাম। সেদিনই বুঝেছিলাম তুমি যুদ্ধে গেছ। সেদিন গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠেছিল। খুব স্বার্থপর হয়ে উঠেছিলাম সেদিন। শুধু মনে হচ্ছিল, তুমি আমার জন্য যুদ্ধে

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

গেছ, শুধুই আমার জন্য। এরপর প্রতিদিন জায়নামাজে বসে তোমার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেছি।

তুমি নূরজাহানের ব্যাপারে শুনেছ কিছু?

সংবাদপত্রে পড়েছি। এই জনপদে একটি মেয়ে কত সহজে সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে উঠতে পারে! নূরীর ছবি পেপারে উঠেছে আর আমার ছবি পোস্টারে। কত সৌভাগ্যবান আমরা!

পোস্টার!

জাভেদ ভাইয়াজি একদিন অফিস থেকে চিন্তিত মুখে ফিরে এলেন। তার হাতে একটি পোস্টার, ছেঁড়া। তাতে আমার নিখোঁজ হওয়ার বিজ্ঞপ্তি। তিনি আরেক দিন একই রকম চিন্তিত মুখে ফিরে এলেন 'শ্রীনগর টাইমসে'র একটি কপি নিয়ে। তাতে নূরীর জীবনের প্রলয়ের খবর। আমি আর নূরজাহান ছিলাম একটি গাঁয়ের দুটি ফুলের কুঁড়ির মতো। কিন্তু পূর্ণ ফুল হয়ে ফোটার আগেই আমাদের ছিঁড়ে পদপিষ্ট করা হলো।

তোমার ছেলেকে দেখাবে না?

না। কঠিন গলায় উত্তর দেয় মারিয়াম।

কেন?

ওকে আমি তোমার মতো যোদ্ধা বানাব। যে জিল্লতির ভেতর দিয়ে ও পৃথিবীতে এসেছে, যাদের কারণে এই জিল্লতির জীবন ও লাভ করেছে, আমি চাই, বড় হয়ে ও তাদের ঘাড়ে যমদূতের নিশ্বাস ফেলুক। যত দিন না আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে, তত দিন ওকে আমি সব পরিচিতজন থেকে আড়াল করে রাখব। এ আমার প্রতিজ্ঞা।

জাভেদকে বলবে, তিনি যেন তার বইয়ে পাপা-২ সম্পর্কে একটি অধ্যায় সংযুক্ত করেন।

পাপা-২?

শ্রীনগরের একটি নির্যাতনকেন্দ্র। যেখানে হাজার হাজার কাশ্মীরি তরুণকে পঙ্গু, অন্ধ ও পুরুষত্বহীন করা হচ্ছে।

তুমি কি ওখান থেকেই পালিয়ে এসেছ? বিস্ময়ে, বেদনায় মুখ হাঁ হয়ে যায় মারিয়ামের।

আদনান ওপর-নিচ মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, ও সেই কুখ্যাত নির্যাতনকেন্দ্র থেকে পালিয়ে এসেছে। তারপর একটু সময় নিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে ও আর্দ্র কণ্ঠে বলে, নিয়তি আমাদের মিলনের জন্য বেছে নিল এমন সময়, যখন তোমার কোলে দুশমনের সন্তান আর আমি প্রজননে অক্ষম।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

কিহ্! বিপন্ন বিমূঢ়তায় থরথর করে কেঁপে ওঠে মারিয়াম। মুহূর্তে ছলছল করে ওঠে ওর বাদামি চোখ। এমন অবাক বিস্ময়ে ও আদনানের দিকে তাকায়, ওর ওই অশ্রুসিক্ত চোখের মণি কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায় যেন। ও তড়পাতে তড়পাতে বলে, ওরা তোমাকে এভাবে কষ্ট দিল! কুত্তাগুলো তোমাকে এভাবে পঙ্গু বানিয়ে দিল! হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে মারিয়াম। বুক ঠেলে বারবার হেঁচকি উঠতে থাকে ওর। একসময় গোঁ গোঁ করতে করতে ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় দরজার চৌকাঠের ওপর।

আদনানের চোখের সামনে লুটিয়ে পড়ে মারিয়াম, যে মারিয়াম আদনানের হৃদয়ের স্পন্দন, অথচ আদনান ছুটে যায় না, ঝাঁপিয়ে পড়ে না, মারিয়ামের পলকা শরীরের পতন ঠেকায় না; বরং এক নিষ্ঠুর দূরের মানুষের মতো ও দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল। যেন কোথাও একটি গাছের পাতাও ঝরেনি। যেন কোথাও বেদনার কোনো পাথর গড়ায়নি। গত দুই দিনে অনেক ভেবেছে আদনান। অনেক শাসন করেছে নিজেকে। এখানে ওর অবস্থান যত দীর্ঘ হবে, তত গভীর হবে মায়া। ও এক যোদ্ধা। যোদ্ধাদের মায়ার হাতছানি উপেক্ষা করতে হয়। সহযোদ্ধাদের রক্ত ছুঁয়ে ও প্রতিজ্ঞা করেছে, যত দিন না কাশ্মীর আজাদ হচ্ছে, তত দিন ও ঘরে ফিরবে না, ঘরও বাঁধবে না। কিন্তু মারিয়ামকে দেখার পর ওর প্রতিজ্ঞার দেয়াল ক্রমেই ধসে যাচ্ছে। নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে শপথের ভিত। তা ছাড়া শপথ ভেঙে ও ঘর বাঁধবেই-বা কী দিয়ে! ওর হাতে তো নেই আঁকড়ে ধরার মতো শেষ খড়কুটোটুকুও। যে পাখির ডানা ভেঙে যায়, তার তো ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখা অন্যায়। এই সংকট মোকাবিলা করার এখন একটাই উপায়— পালিয়ে যাওয়া। আদনান পালিয়ে যাবে। পরাজিত যোদ্ধার মতো পালিয়ে যাবে।

শেষবারের মতো দেখবার জন্য আদনান হাঁটু মুড়ে বসে মারিয়ামের মাথার কাছে। ওড়না সরে গিয়ে ঢেউ খেলছে ওর এলোচুল। তখনো চোখের কোণে জমে আছে জল। নাকের পাটা এখনো ফুলছে থেমে থেমে। আদনান ওর বাদামি চুলে কম্পিত হাত রাখে। মুহূর্তে অসাড় হয়ে যায় ওর শরীর। রক্তের কণায় কণায় ছড়িয়ে পড়ে ভালোবাসার রেণু। কপালে চুমু দিতে গিয়ে ও মারিয়ামের শরীর থেকে কেমন মা মা গন্ধ পায়। জীবনের কী এক পরিহাস— দুজনের একসাথে ঘর বাঁধা হলো না, তার আগেই মা হয়ে গেল মারিয়াম, এই বেদনা এখন রাখবে কোথায় আদনান! এই পৃথিবীর কাছে ওর আর কিছু চাওয়ার থাকত না, ও যদি মারিয়ামের সন্তানের বাবা হতো। আদনানের চোখ থেকে দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ে মারিয়ামের কপালে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

অশ্রুটুকু মুছে দিয়ে ও বিড়বিড় করে— বিদায়, মারিয়াম। হয়তো আর কোনো দিন দেখা হবে না আমাদের। তবে তুমি সব সময় আমার সঙ্গে রবে, নীরবে, নিভৃতে।

পাকা গমের রঙের মতো মোলায়েম রোদ উঁকি দিচ্ছে দেয়ালের কার্নিশে। পর্বতের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা সূর্যটা টকটকে লাল। যেন কোনো এক গুপ্ত ঘাতক সূর্যের বুকে সেঁধিয়ে দিয়েছে ধারালো ছুরি। তারই ক্ষতস্থান বেয়ে নেমে আসছে লাল টুকটুকে রোদের ধারা। জানালা দিয়ে আদনান সূর্যের দিকে তাকায়। সূর্য কেন লাল! সামনের দিনগুলো কি রক্তের দিন হতে চলেছে! মারিয়ামের কপালে শেষ চুমু রেখে আদনান ওঠে। ঘুমন্ত বাড়িটা পেছনে ফেলে, মায়ার হাতছানি উপেক্ষা করে ও রক্তরাঙা পথে পা রাখে। সামনে ওর অনেক অসমাপ্ত কাজ পড়ে আছে।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

পরিশিষ্ট

একটি বুকখোলা পুরোনো কবরের সামনে বিষণ্ন বদনে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়াম। সঙ্গে চার বছরের এক ফুটফুটে শিশু। শিশুটি নির্বিকার ভঙ্গিতে মারিয়ামের তর্জনী ধরে আছে। কবরটি পুরোনো হলেও এর ভেতরের অংশ ঝাঁ-চকচকে। সম্ভবত বসতবাড়ির মতো কেউ এর ভেতর-বাহির ঝাড়পোঁছ করে প্রতিদিন। শিশুটি বিস্ময় নিয়ে তাকায় কবরের গহ্বরের দিকে। আজই প্রথম ঘর ছেড়ে সে বাইরে বেরোল। সে মারিয়ামের আঙুল টেনে ধরে জিজ্ঞেস করে, আম্মুজি, এটা কী?

এটা এক কবর। কোমল স্বরে উত্তর দেয় মারিয়াম।

কবর কী?

মানুষ মারা গেলে যেখানে থাকে।

কে মারা গেছে, আম্মুজি?

মারিয়াম থতমত খায়। একটু ভাবে। তারপর বলে, তোমার আম্মুজির এক বন্ধু। বলতে গিয়ে গলা কেঁপে ওঠে ওর। চোখ হয়ে আসে ঝাপসা।

তোমার বন্ধু কে, আম্মুজি?

তার নামও আদনান। অনেক বড় যোদ্ধা ছিলেন তিনি। দেশকে ভালোবাসতেন প্রাণের চাইতেও বেশি। দেশের জন্য তিনি শহীদ হয়েছেন। আমি চাই, বড় হয়ে তুমিও আমার বন্ধুর মতো হবে।

সেই জন্যই কি বন্ধুর নামে আমার নাম রেখেছ?

ঝট করে ছেলের মুখের দিকে তাকায় মারিয়াম। বুকের ভেতর উথলে ওঠে আবেগ-নদী। সহসা ওর চোখ ভরে ওঠে জলে। নিচু হয়ে বসে ও আদনানকে জড়িয়ে ধরে বুকের সাথে। সন্তানের পেলব গালের সাথে ঘষতে থাকে নিজের গাল। মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর মতো ও আতিবিতি হাত বোলাতে থাকে সন্তানের সারা গায়ে। শিশু আদনানের অস্তিত্বের ভেতর ও খুঁজতে থাকে শহীদ আদনানের প্রতিকৃতি। তিন বছর আগে মারিয়ামের

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

সংজ্ঞাহীন শরীর ডিঙিয়ে সেই যে পালিয়ে গেছে আদনান, আর ফেরেনি সে। মারিয়াম খবর পেয়েছে, সেদিন এখান থেকে ও সোজা গিয়েছিল গুরিহাকায়, বাবা-মার সাথে দেখা করতে। কিন্তু দেখা হলেও কথা বলার সুযোগ হয়নি ওর। পাপা-২ থেকে পালিয়ে আসা ভয়ংকর দাগি আসামি সে। ভয়ংকর এই অপরাধীকে ধরতে বাড়ির পাশে পাহারায় ছিল গুপ্তচর। আঙিনায় পা রাখতেই ছদ্মবেশী সৈন্যরা ঘিরে ফেলে ওকে। অপরাধীকে অক্ষত ধরতে পেরে উল্লাসে ফেটে পড়ে তারা। তাদের উল্লাসই বলে দেয়, আদনান বন্দী হিসেবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক অপরাধ আদনানের। রাষ্ট্রের মূল্যবান বহু সৈন্যের হন্তারক সে। প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে পাপা-২ থেকে পালিয়ে আসা তার আরেক অপরাধ। ভারতের অখণ্ডতাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের সাথেও যুক্ত সে। যার আমলের খাতায় এত এত অপরাধ, এই মাটিতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার তার নেই। গুরিহাকা ঈদগাহ মাঠ, যে মাঠের প্রতিটি ঘাসের সাথে লেগে আছে আদনানের শৈশবস্মৃতি, ওর জীবনাবসান ঘটাবার জন্য স্মৃতিময় সেই মাঠটিকেই বেছে নেয় শয়তানগুলো। কী ছিল ওদের মনে? জীবনের যবনিকা টানবার জন্য কেন বেছে নেওয়া হলো ঈদগাহ মাঠ? আজ তুমি দেহত্যাগই করবে না শুধু, স্মৃতির সুরভি থেকেও তুমি বিচ্ছিন্ন হবে—সংবেদনশীল আদনানকে বাড়তি এই বেদনাটুকু দেওয়ার জন্যই কি বেছে নেওয়া ঈদগাহ মাঠ? নাকি এই সিদ্ধান্তের পেছনে ছিল দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রচেষ্টা? হয়তো তাই। নয়তো সেদিন কেন গুরিহাকার সকল মানুষকে, এমনকি আদনানের বাবা-মাকেও হাজির করা হলো ঈদগাহ মাঠে! মারিয়াম শুনেছে, গুলি খেয়ে যখন আদনানের রুগ্‌ণ দেহখানা লুটিয়ে পড়েছিল সবুজ ঘাসের ওপর, ঈদের আগে যে ঘাসের ডগা আদনান কাঁচি দিয়ে ছাঁটাই করত আর মারিয়াম ঝুড়ি ভরে বর্ধিত সেই ঘাস ফেলে আসত মাঠের বাইরে; তখন অদ্ভুত বিস্ময়কর এক ঘটনা ঘটে। যে জোড়া আখরোটগাছ বহুকাল ধরে রুকুর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল মেহরাবের ওপর ছায়া দিয়ে, আদনানের লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছ দুটোর দুটি শাখাও মড়মড় করে ভেঙে পড়ে মেহরাবের ওপর। শুধু কি গাছের শাখা, উপস্থিত জনতার প্রতিটি হৃদয়ও কি মড়মড় করে ভেঙে যায়নি! তারা দাঁতে দাঁত পিষে ক্রোধ সংবরণ করেছিল; কিন্তু চোখের ওপর থেকে তারা হারিয়েছিল নিয়ন্ত্রণ। সেদিন গুরিহাকায় এমন কোনো মানুষ ছিল না, যার চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরেনি। তাদের শোকতপ্ত ভাঙা হৃদয় হয়তো সান্ত্বনা খুঁজে পেত, যদি তারা আদনানের লাশটাকে ফেরত পেত। যদি তারা লাশটাকে দাফন করে আকাশপানে হাত তুলে সুরা ফাতেহা পড়তে পারত। কিন্তু সেই সুযোগ তাদের দেওয়া হয়নি। আদনানের লাশকে ঘিরে কোনো উত্তেজনা যেন তৈরি না হয় উপত্যকায়, এ কারণে লাশটাও ফেরত দেয়নি ওরা। কোথায় নিয়ে গেছে, আদৌ দাফনের ব্যবস্থা করেছে কি না, জানে না কেউ। মারিয়ামের কাছে সংবাদ এসেছিল দুদিন পর। সংবাদটি

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

শোনার সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারিয়েছিল ও। শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিল কয়েক দিন। সে সময় আরো একটি বিস্ময়কর সংবাদ হতবুদ্ধ করে দেয় মারিয়ামকে। আদনান মারা যাওয়ার দিনে নিহত হয়েছে রায়হানও। তার লাশ পাওয়া গেছে শিশনাগ খালের পানিতে। খালা-খালুর জন্য খুব মন খারাপ হয়েছিল সেদিন। একই দিনে দুই বেটার মৃত্যু কীভাবে তারা হজম করেছেন!

মারিয়াম হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছিল একটি প্রতিজ্ঞা নিয়ে। ও যখন শোক সামলে উঠল, বাড়ির সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখল, কোদাল হাতে গোরস্তানের দিকে যাচ্ছে মারিয়াম। দৃঢ় চোয়াল, টানটান কাঁধ, রক্তাভ চোখ, দ্রোহী মুখাবয়ব। ওর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি কারো, না জাভেদের, না লুতফার। সেদিনই, যে মমতা নিয়ে একজন নারী প্রিয়জনের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে, ঘর গোছায়, একই রকম মমতা ও যত্ন নিয়ে মারিয়াম নিজ হাতে কেটেছে এই কবর। ওর জীবনের স্পন্দন আদনানের গুম হওয়া লাশের কবর। বুকখোলা ডায়েরির মতো তিন বছর ধরে যা অপেক্ষমাণ একটি লাশের জন্য।

এটা তো খালি। তোমার বন্ধু কোথায়, আম্মুজি? খলবল করে জিজ্ঞেস করে পুত্র। কবরের শূন্যতা দেখে সে বিস্মিত।

মারিয়াম কিছু একটা উত্তর দিতে যায়, তখন ওর চোখ পড়ে সমাধিলিপির ওপর। এক দিনের ধুলোতেই সমাধিলিপির শ্বেতপাথরটি কেমন ঘোলা। মারিয়াম সমাধিলিপির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে। তারপর প্রিয়জনের কপালের ঘাম মুছবার মতো যত্ন নিয়ে ওড়না দিয়ে ও মুছতে শুরু করে সমাধিলিপিটি। ধুলো সরে যেতেই চকচক করে ওঠে পাথরখোদিত এক বিহ্বল বাক্য : এই কবরটি আদনানের জন্য অপেক্ষা করছে।

রচনাকাল : ২৪ আগস্ট ২০২২ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৩।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar



ছবি : আজিজ আহমেদ

বুঝতে শেখার পর থেকে সাব্বির জাদিদ লেখক হতে চেয়েছেন। লেখালেখির প্রিয় আঙিনা কথাসাহিত্য। চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসেন বলে প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছেন লেখার ধরন ও বিষয়। নবিজির (সা.) দাদা আবদুল মোত্তালিব এবং কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে লিখেছেন বৃহৎ কলেবরের দুটি উপন্যাস। দুই পৃথিবীর দুই ব্যক্তিত্বকে নিয়ে লেখা উপন্যাস দুটি পাঠকের মনে তৈরি করেছে দ্বিধা এবং কৌতূহল। সাব্বির জাদিদ পাঠকের এই কৌতূহলকে উপভোগ করেন।

Robiul - https://t.me/BoierSomahar

ঐতিহ্য

9 789847 762692